গ্রন্থাবলী সিরিজ

# নারায়ণ চন্দ্রের গ্রন্থাবলী

( তৃতীয় খণ্ড )

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী সিরিজ

# নারায়ণ চন্দ্রের গ্রন্থাবলী

( তৃতীয় খণ্ড )

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত


উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতা-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

[ মূল্য ১॥০ টাকা

# সূচীপত্র।

# নব বোধন

( উপন্যাস )

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

# উৎসর্গ

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

স্বর্গীয় পিতৃদেবের

চরণোদ্দেশে

আমার সাহিত্য-সেবার এই

প্রথম ফল

অর্পণ করিলাম

প্রণত—

শ্রীনারায়ণ

# ভূমিকা

একদিন অমর-কবি বঙ্কিমচন্দ্রের বিমল প্রভায় যে সাহিত্যক্ষেত্র আলোকিত হইয়াছিল, আজিও বহু সাহিত্যরথীর স্নিগ্ধ কিরণে যে ক্ষেত্র সমুজ্জ্বল, সেই সুবিশাল সাহিত্যক্ষেত্রের দ্বারপ্রান্তে আমি আজ নূতন অতিথি। কিন্তু কেন আমার এ প্রয়াস?

আমার এই প্রয়াসের—এই ধৃষ্টতার একটু কারণ আছে। যিনি বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রধান রথি-রূপে দণ্ডায়মান, সেই প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম, আর, এ, এস মহোদয়ই আমার হৃদয়ে এই ধৃষ্টতা জাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের উপর আমার এই অভিনব অত্যাচারের জন্য তিনিই কতকটা দায়ী। আমি এক্ষণে তাঁহারই চরণ স্মরণ করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইলাম। পরিণাম? পরিণাম সর্ব্বদর্শী ভগবানের গোচর।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও কেবল কয়েকটি নাম ব্যতীত ইহার আর সমস্তই কাল্পনিক। সুতরাং পাঠকগণ যেন ইহাকে কেবল উপন্যাসরূপেই গ্রহণ করেন।

কলিকাতা।
মাঘ, ১৩১৩।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

# নব বোধন

## প্রথম খণ্ড

### বোধন

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥"

গীতা ২। ৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী।

রূপনাথ চক্রবর্ত্তী শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তখন রূপনাথের পিতামাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর এক বৎসরমধ্যেই পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন, মাতাও তাঁহার সহিত অনুমৃতা হইলেন। রূপনাথ গুরুগৃহে বাস করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কাজেই আর তাঁহার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘটিল না, পত্নী কমলারও কোন সংবাদ লওয়ার সুবিধা হইল না, গীতার কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বেদান্তের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ প্রভৃতির মধ্যে কমলা চাপা পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে শাশুড়ী অনেকবার জামাতাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু জামাতা তখন ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যের সহিত দ্বৈতবাদীর মতদ্বৈধের মীমাংসায় ব্যস্ত। সুতরাং তিনি শাশুড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পাঁচ বৎসর পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল। তখন গুরুদেব তাঁহাকে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার জন্য অনুমতি দিলেন অনুমতি পাইয়া রূপনাথ কমলাকে আনিবার জন্য শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলেন।

রূপনাথের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বর্ষ হইবে। দেখিতে সুপুরুষ না হইলেও তাঁহার দেহ বেশ সুগঠিত, বলিষ্ঠ; বাহুদ্বয় মাংসল, বক্ষঃ বিস্তৃত, লোচনদ্বয় উজ্জ্বল, তেজোব্যঞ্জক; প্রশস্ত ললাট জ্ঞান ও মহত্ত্বের ক্রীড়াভূমি; হৃদয় ধর্ম্মভাব-পরিপূর্ণ, সরল ও উদার। ফল কথা, রূপনাথ একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শক্তিশালী, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।

বাসগ্রাম দেবীগড়; শ্বশুরবাড়ী রাজনগরে। মধ্যে পাঁচক্রোশ ব্যবধান। মাঠের উপর দিয়া রাস্তা। নৈদাঘ সূর্য্যকিরণে বিস্তৃত মাঠ যেন জ্বলিতেছিল। রূপনাথ সেই রৌদ্রতপ্ত মেঠোপথ ভাঙ্গিয়া ঘর্ম্মাক্তদেহে রাজনগর অভিমুখে যাইতেছিলেন।

তা' ইহা একালের রূপনাথের শ্বশুরালয়-যাত্রা হইলে আমরা অনায়াসেই তাঁহার মনোভাবটা বর্ণনা করিতে পারিতাম। কিন্তু সেই দুই শত বৎসর পূর্ব্বে গুরুগৃহ হইতে অচির-প্রত্যাগত রূপনাথের হৃদয়-ভাবটা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কারণ, তিনি যে তখন আচার্য্যধীত "ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ পরমপুরুষার্থঃ" এই সাংখ্যোক্তির পরিবর্ত্তে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র তিনটি দিনের পরিচিতা একটি লজ্জাবতী বালিকার লজ্জানত মুখখানি ভাবিতেছিলেন, ইহা আমরা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না। সুতরাং আমাদের বর্ণনাও এ স্থলে অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

রূপনাথ আহারান্তে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, সুতরাং অপরাহ্নের সমস্ত রৌদ্রটা ভোগ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে রাজনগরে উপস্থিত হইতে হইল। তখন কৃষক-বধূগণ সন্ধ্যা-প্রদীপ হস্তে গো-শালায় প্রবেশ করিতেছে।

রূপনাথের শ্বশুরবাড়ী গ্রামের মাঝখানে। বাড়ীখানি ছোট—ব্রাহ্মণপল্লার মধ্যে অবস্থিত। বাড়ীর মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক—কমলা এবং তাহার মাতা। তা' ছাড়া আর কেহ নাই। কমলা সন্ধ্যার প্রদীপটি হস্তে লইয়া তুলসীতলায় প্রণাম করিতেছিল, তাহার মাতা গৃহের দাবায় বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতেছিলেন, এমন সময়ে বাহিরে কে দরজা ঠেলিল। কমলা প্রণাম করিতে করিতে না উঠিয়াই কেবল মাথাটি তুলিয়া একবার দ্বারের দিকে চাহিল : তাহার মাতা জিজ্ঞাসিলেন,—"কে গা ?"

উত্তর আসিল,—"আমি রূপনাথ।"

আর কোন কথা মনে থাক বা না থাক, রূপনাথ নামটি কমলা ভুলে নাই। সে তাড়াতাড়ি প্রণামটা সারিয়া লইয়া প্রদীপ-হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার বুকটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। ভাবিল, "ঠাকুর! এতদিনে কি আমার প্রণাম করা সার্থক হইল ?" কমলার মাতা মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন; রূপনাথ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কমলার মাতা তাড়াতাড়ি একখান কম্বল আনিয়া দাবার উপর পাতিয়া দিলে ক্লান্ত পথশ্রান্ত রূপনাথ তাহাতে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ-পরেই একহাত ঘোমটা টানিয়া কমলা এক গাড়ু জল তাঁহার নিকট রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রূপনাথ একবার ঈষৎ কটাক্ষে সে দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই দশমবর্ষীয়া বালিকা এক্ষণে পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী; সেই প্রভাতের উন্মেষোন্মুখী পদ্মটি এক্ষণে মধ্যাহ্ন-রবিকরোদ্ভাসিতা বিস্তৃত দলশালিনী নলিনী; বহুদূর-দৃষ্টা সেই ক্ষীণ নির্ঝরিণী এখন বীচিমালিনী পূর্ণতোয়া জাহ্নবী। রূপনাথের শাস্ত্র-চর্চ্চানিরত হৃদয়টা বুঝি একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তার পর শাশুড়ী আসিয়া কুশল-প্রশ্নাদির পর এই পাঁচ বৎসরের অনেক কথাই কহিলেন। কমলার পিতার লোকান্তর-প্রাপ্তি, বৈষয়িক গোলযোগ, কমলার কঠিন পীড়া প্রভৃতি ঘটনানিচয় একে একে বিবৃত করিতে করিতে কখনও কাঁদিলেন, কখনও আক্ষেপ করিলেন; শেষে দুই চারিটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাহিনী সমাপ্ত করিলেন। তার পর তিনি উঠিয়া জামাতার আহারের উদ্যোগ করিতে গেলেন। রূপনাথ হস্তপদাদি ধৌত করিয়া সন্ধ্যাহ্নিকে বসিলেন।

আহারান্তে রূপনাথ শাশুড়ীর নিকট কমলাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কমলার মাতা কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়াই জামাতার কথায় সম্মতি দিলেন। রূপনাথ একটু বিস্মিত হইলেন। মাতা যে এত শীঘ্র এক কথায় কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে সম্মত হয়, ইহা তিনি এই প্রথমে দেখিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে যখন তিনি কমলার নিকট ভিতরের সমস্ত কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার এই বিস্ময় ক্রোধে ও ঘৃণায় পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমাদিগকে আর একটু আগেকার কথা বলিতে হইবে।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### ফৌজদার সাহেব।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই; তখনও ইংরাজ বণিক্-গণের হৃদয়ে ভারতে রাজ্যস্থাপনের কল্পনা উদিত হয় নাই তখনও তাঁহারা সোনার ভারতের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সকাতর-নয়নে মোগল-সম্রাটের কৃপাভিক্ষা করিতেছিলেন। তবে ঔরঙ্গজেবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত মুসলমান সাম্রাজ্য তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, বিশাল সমুদ্রহৃদয়ে অল্পে অল্পে প্রলয়-তরঙ্গ উঠিতেছিল। সুশাসনের অভাবে তখন বঙ্গদেশ এক প্রকার অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানে স্থানে বিদ্রোহ ও দস্যুর উৎপীড়নে বঙ্গদেশে তখন কিরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা হইয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাজকর হস্তগত করিয়াই বঙ্গের তৎকালীন সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ আপনার কর্ত্তব্যশেষ বোধে নিশ্চিন্ত হইতেন; এ দিকে প্রজাগণ প্রতিনিয়ত বিবিধ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইত। কিন্তু তাঁহার বিলাস-বিঘূর্ণিত দৃষ্টি সে দিকে পড়িত না। স্থানে স্থানে এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও ন্যায়ের সঙ্কীর্ণপন্থা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে প্রজাশাসন বা উৎপীড়ন করিতেন। ইঁহাদের শাসন-প্রভাবে নিরীহ প্রজাবর্গ আরও অধিকতর পর্য্যুদস্ত হইত। কিন্তু সেই অমোঘ শাসনের প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

আমাদিগের বর্ণনীয় সময়ে রাজনগরে রস্তম আলি নামক জনৈক ফৌজদার বাস করিতেন। তাঁহার

অধীনে প্রায় তিন শত সিপাহী ছিল। সিপাহীরা বেতনভোগী ছিল না, তাহারা জমী ভোগ করিত। তাহাদিগকে সর্ব্বদা ফৌজদারের নিকট উপস্থিত থাকিতে হইত না। তাহারা সাধারণ প্রজার ন্যায় গৃহে বসিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, আবশ্যক হইলে সমবেত হইয়া ফৌজদারের কার্য্যসাধন করিয়া দিত। কেবল কয়েকজন মাত্র বেতনভোগী সিপাহী সর্ব্বদা ফৌজদারের নিকট থাকিত। এই ফৌজদারগণের হস্তেই দেশের শাসন ও বিচারভার অর্পিত ছিল। কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহারা এই গুরুতর কর্ত্তব্যের অপব্যবহার করিয়া দেশে অশান্তির সূত্রপাত করিতেন। রস্তম আলিও এই সাধারণ পদ্ধতির বহির্ভূত ছিলেন না। সে সময়ে তিনিই একপ্রকার দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার প্রবল শাসনে দেশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতেও কেহ সাহসী হইত না। সাধারণে তাঁহাকেই প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট বলিয়া জানিত; অন্য সম্রাটের কল্পনা করিতেও তাহারা ভীত হইত।

রস্তম আলি কেবল যে দুর্ব্বল প্রজাগণের অর্থ শোষণ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহার ভয়ে গৃহস্থের কুলবালাগণ অন্তঃপুরে বসিয়া সর্ব্বদা কাঁপিত। তাঁহার দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য কত সতীকে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, কত হতভাগিনী যে আত্মহত্যা করিয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যে একবার ফৌজদার সাহেবের শুভ-দৃষ্টিতে পড়িত, তাহার আর রক্ষা ছিল না। ছলে, বলে, কৌশলে, যেরূপেই হউক, তাহাকে হস্তগত করিয়া এবং তাহার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া ফৌজদার সাহেব নিশ্চিন্ত হইতেন। অনেক কুলাঙ্গার হিন্দুও এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্যকারী ছিল। তাহারা গোপনে সুন্দরী কুলস্ত্রীগণের সংবাদ আনিয়া এবং তাহার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ফৌজদারের লালসানল উদ্দীপিত করিত; অমনই ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের ন্যায় রস্তম আলির লোলুপ দৃষ্টি সেই দিকে পড়িত। ইহাতে যে সময়ে সময়ে দুই একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিত না, এরূপ নহে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত ফৌজদারের নিকট প্রজাবর্গের ক্ষীণশক্তি অচিরেই পরাভূত হইত। এইরূপে গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে হাহাকারের উচ্চ রোল উঠিত। কিন্তু হতভাগ্য প্রজাপুঞ্জের সে আর্ত্তনাদ সুদূর দিল্লীর সিংহাসন-প্রান্তে পৌঁছিতে পারিত না।

এই সময়ে একদিন রূপলাবণ্যময়ী কমলার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি রস্তম আলির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সে রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া গেল, এই দেবভোগ্য সৌন্দর্য্যসুধা পান করিবার জন্য তাঁহার লালসানল-প্রদীপ্ত হৃদয় লালায়িত হইয়া উঠিল। তিনি কমলার নিকট দূতী প্রেরণ করিলেন।

দূতী আসিয়া কমলাকে ফৌজদারের অভিপ্রায় জানাইল। শুনিয়া কমলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখে ঘৃণায় তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। কমলার মাতাও সমস্ত শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হায়, এ দুঃসময়ে কে তাঁহার কমলাকে রক্ষা করিবে? কে তাঁহার জন্য দুর্দ্দান্ত ফৌজদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইবে। অসহায়া বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। এ দিকে মধ্যে মধ্যে দূতী আসিয়া ভয় ও প্রলোভন দ্বারা কমলাকে বাধ্য করিতে চেষ্টিতা হইল।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই রস্তম আলি অধৈর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দূতী তাঁহাকে সবুরে এই মেওয়া-ফল-লাভের লোভ দেখাইয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু সেই শুষ্ক আশ্বাসবাণী শুনিয়া আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলপ্রকাশের বাসনা ব্যক্ত করিলেন। দূতী তাঁহার নিকট তিন দিন সময় লইল। এ দিকে কমলাও কোন উপায় না দেখিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইল; মাতাও দেবতার নিকট অবশেষে প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়েই রূপনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কমলার হৃদয় অনেকটা স্থির হইল; তাহার মাতাও বুঝিলেন, ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। রূপনাথ কমলার নিকট সমস্ত শুনিলেন; শুনিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু উপায় কি? এই ভীষণ ব্যাঘ্রকবল হইতে কমলাকে কিরূপে মুক্ত করিবেন? রূপনাথ অনেক ভাবিলেন, কমলাও তাহার বুকে মাথা রাখিয়া অনেক কাঁদিল। শেষে স্থির হইল, কল্যই এখান হইতে কমলাকে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাতঃকালে উঠিয়া রূপনাথ পাল্কী বেহারা ডাকিতে গেলেন। কিন্তু ফৌজদারের অভিপ্রায় গ্রামের সকলেই অবগত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বিরাগাশঙ্কায়, তাঁহার আদেশ ব্যতীত কেহই যাইতে স্বীকৃত হইল না। অনেক চেষ্টার পর রূপনাথ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কমলাকে বলিলেন,—"এখন উপায়?"

কমলা বলিল,—"আমি হাঁটিয়াই যাইব।"

রূপনাথ বলিলেন,—"পারিবে ?"

কমলা বলিল,—"পারিব।"

একটু ভাবিয়া রূপনাথ বলিলেন,—"কিন্তু পথে যদি বিপদ ঘটে ?"

কমলা স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল—"তুমি সঙ্গে থাকিবে, তবে আবার বিপদ কোথায় ?"

রূপ। ফৌজদার নিশ্চিন্ত থাকিবে না—সম্ভবতঃ সে বাধা দিবে।

কম। তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আমি তাহাকে আর ডরাই না।

রূপ। আমি একা, ফৌজদারের বিরুদ্ধে কি করিতে পারি ?

কম। কি না পার ? আমার শ্বশুরের নাম, আমার পিতার নাম দেশ-বিখ্যাত। একদিন তাঁহারা ফৌজদারকে কাঁপাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা আজ কি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা আত্মরক্ষাও করিতে পারে না ?

রূপ। কমলা, একটা কথা বিস্মৃত হইতেছ। তাঁহারা ডাকিলে সে সময় সহস্র লোক প্রাণ দিতে ছুটিয়া আসিত। এখন তুমি আমি বিপদে পড়িয়া সকাতরে সাহায্য প্রার্থনা করিলে একজনও আসিবে না।

কম। না আসে, ক্ষতি নাই—মরিতে তো জানি। কিন্তু—

রূপ। তবে আর কিন্তু কি ?

কম। কিন্তু একটা ভয় হয়।

রূপ। কিসের জন্য ?

কম। তোমার জন্য।

রূপ। আমার জন্য ?

কম। হাঁ, ভয় হয়, পাছে ফৌজদার তোমায় যাতনা দেয়।

রূপ। আমার জন্য ভেবো না কমলা। যদি মরিতে হয়, তাহা হইলে ফৌজদারকে এমন শিক্ষা দিয়া মরিব যে, স্ত্রীলোকের উপর সে আর কখন অত্যাচার করিবে না। সে কথা এখন যাক্,—ঘরে ভাল লাঠী আছে ?

"আছে" বলিয়া কমলা তাহার পিতার আমলের চাকর মধু সর্দ্দারের একটা পাকা বাঁশের মোটা লাঠি বাহির করিয়া আনিল। রূপনাথ তৈলে জলে সুপক্ব সেই লাঠীটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন,—"তবে প্রস্তুত হও।"

কমলা প্রস্তুত হইয়া আসিল। রূপনাথ দেখিলেন, তাহার হাতে একখান মরিচাধরা তরোয়াল। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"ওটা কি হইবে ? যুদ্ধ করিবে নাকি ?"

কমলা বলিল,—"না, আত্মরক্ষা করিব।"

তখন পতি-পত্নী দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কমলার মাতা অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে উভয়ে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে বৃদ্ধা তুলসীতলায় মাথা কুটিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর ! আজ আমার স্বামীর কুলমান রক্ষা কর, সতীর সতীত্ব বজায় রাখ।"

বৃদ্ধা একে একে স্বামী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য সকল হারাইয়া কেবল কমলাকে লইয়াই বুক বাঁধিয়াছিলেন। আজি সেই কমলাও তাঁহার শূন্য হৃদয়টাকে আরও শূন্য করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধার হৃদয়রুদ্ধ শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা একটা গোলমাল—একটা অস্ফুট চীৎকার-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ছুটিয়া দ্বারের নিকট গেলেন; কিন্তু কিসের গোলমাল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কেবল দূরোত্থিত একটা গোলযোগের অস্ফুট ধ্বনি তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল। তিনি দুই হাতে বুক চাপিয়া বলিলেন,—"রক্ষা কর ঠাকুর, রক্ষা কর; কমলা বাঁচিয়া থাকিতে যেন আমার স্বামীর কুলমান কন্যার সতীত্ব নষ্ট না হয়।"

সতীত্ব বজায় করিতে কমলা যদি মরে, তাহাতেও বৃদ্ধার বুঝি তত কষ্ট নাই। হায়, এমনই সতীত্ব !

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### লাঠীবাজী।

রূপনাথের অনুমান যথার্থ হইল। তাঁহারা গ্রাম পার হইতে না হইতেই তাঁহাদের পলায়ন-সংবাদ ফৌজদারের কর্ণগোচর হইল। অবিলম্বে উভয়কে ধরিবার জন্য দশবারোজন সিপাহী ছুটিল।

রূপনাথ ও কমলা যখন গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন সিপাহীগণ আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিল। রূপনাথ ভ্রূকুটী করিয়া তাহাদের দিকে ফিরিলেন; কমলার বুকের ভিতর একটু কাঁপিয়া উঠিল সে স্বামীর কাছে আরও একটু সরিয়া, অঙ্গে অঙ্গ সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইল। দুইজন সিপাহী অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহারা অসম্ভাবিতরূপে বাধা পাইল; রূপনাথ একজনকে পদাঘাতে এবং অপর ব্যক্তিকে মুষ্ট্যাঘাতে ভূপাতিত

করিলেন। তদ্দৃষ্টে অন্যান্য সিপাহীরা একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন রূপনাথের সবল হস্তে সেই পাকা বাঁশের লাঠী সশব্দে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিতে লাগিল। সিপাহীদের হাতেও এক একখান লাঠী ছিল; কিন্তু রূপনাথের সেই অদ্ভুত লাঠীচালনা দেখিয়া সকলেই মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল। পরক্ষণেই একজন সিপাহী লাঠী ঘুরাইয়া অগ্রসর হইল। অমনই রূপনাথের ঘূর্ণিত লাঠী সবেগে তাহার উপর পড়িল; সিপাহী ধরাশায়ী হইল। আবার একজন গেল, সেও পড়িল। তখন ক্রুদ্ধ সিপাহিগণ হুঙ্কার দিয়া সকলে একযোগে রূপনাথকে আক্রমণ করিল। অদূরে গ্রামবাসিগণ নীরবে দাঁড়াইয়া এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। রূপনাথ একবার চীৎকার করিয়া বলিলেন—"যদি তোরা লাঠী ধর্‌তে শিখে থাকিস্, তবে একে একে আয়।"

কিন্তু উন্মত্ত সিপাহিগণের কর্ণে তাঁহার কথা প্রবেশ করিল না। তাহারা সকলেই এককালে লাঠী চালাইতে থাকিল। চারিদিক্ হইতে রূপনাথের উপর লাঠীবৃষ্টি হইতে লাগিল। অদূরে দাঁড়াইয়া কমলা কাতরকণ্ঠে ডাকিল,—"কোথায় হে অনাথনাথ! আজ রমণীর সর্ব্বস্ব রক্ষা কর ঠাকুর।"

রূপনাথের শিক্ষা অসাধারণ। তিনি এই দশ জন সিপাহীর সমকালীন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কৌশলে তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে লাঠী চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল। সে বেগের নিকট যে পড়িল, সেই ধরাশায়ী হইল। দেখিতে দেখিতে আরও দুই জন সিপাহী পড়িল। তখন অবশিষ্ট সিপাহিগণ ক্রুদ্ধশার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন করিয়া তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রূপনাথ আপনার অবস্থা বুঝিলেন, চকিতের মত নিরাশদৃষ্টিতে একবার কমলার মুখের দিকে চাহিলেন; পরক্ষণেই সম্মুখস্থ সিপাহীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠী তুলিলেন। এই অবসরে পশ্চাৎ হইতে দুইখান লাঠী তাঁহার মাথার উপর উঠিল। কমলা তাহা দেখিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হৃদয়ে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইল, মুহূর্ত্তে তাহার হস্তস্থিত তরবারি আততায়িদ্বয়ের মধ্যে একের বক্ষ ভেদ করিল। সিপাহী চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। অপর লাঠীখানা রূপনাথের স্কন্ধে পড়িল, কিন্তু পতনোন্মুখ সিপাহীর দেহে বাধা পাইয়া তাহার বেগ প্রতিহত হইয়াছিল।

তখন রূপনাথের উত্থিত লাঠী সম্মুখস্থ সিপাহীর মাথায় পড়িয়াছে। সহসা পশ্চাৎ হইতে আহত হইয়া রূপনাথ ফিরিয়া চাহিলেন। অমনই কমলার সেই রৌদ্রমধুর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল; সে মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ছয়খানা লাঠী উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কমলার শোণিতরঞ্জিত তরবারি প্রভাত-সৌর-কিরণে আবার ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে তাহা এক সিপাহীর পঞ্জর ভেদ করিল। রূপনাথও আপনার লাঠী ঘুরাইয়া আঘাতের প্রতিরোধ করিলেন। সিপাহীগণের লাঠী তাঁহার লাঠিতে প্রতিহত হইল; কেবল একখান লাঠি প্রতিহত হইয়াও তাঁহার বাহুমূলে পড়িল। মুহূর্ত্তে কমলার শোণিতসিক্ত-ভুজধৃত তরবারি আবার উত্থিত হইল। অবশিষ্ট সিপাহীগণ সবিস্ময়ে একবার সেই শোণিতরঞ্জিতবসনা, ক্রোধজ্বলিতনয়না, দংশিতাধরা, দানবদলনী মূর্ত্তির দিকে চাহিল, পরক্ষণেই তাহারা যে যে দিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। কমলা পড়িয়া যাইতেছিল, রূপনাথ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তার পর তিনি কমলার সেই অবসন্ন দেহ বক্ষে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল।

পরাজিত সিপাহীগণ সাহস করিয়া কেহ ফৌজদার সাহেবের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারা জানিত যে, এ সংবাদ শুনিলে ফৌজদার সাহেব তাহাদিগকে আস্ত রাখিবে না। কিন্তু অধিকক্ষণ ইহা অপ্রকাশ রহিল না। ফৌজদার সাহেব সমস্ত সংবাদ শুনিলেন; শুনিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ একশত সিপাহীকে সশস্ত্র উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল। অমনই চারিদিকে একটা সাজ সাজ রব উঠিল, গ্রামের মধ্যে একটা সোরগোল্ পড়িয়া গেল।

তার পর যখন সিপাহীরা সাজিয়া গুজিয়া, হাতিয়ার বাঁধিয়া ফৌজদার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। রস্তম আলি অপরাধিদ্বয়কে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন সিপাহীরা সগর্ব্ব-পদক্ষেপে গ্রামবাসিগণকে ভীত ও চমকিত করিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে আহত কয়েকজন সিপাহী ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অগত্যা সকলে সেই পতিত সিপাহীগণকে লইয়াই ফৌজদারের নিকট উপস্থিত হইল এবং যথাযথ নিবেদন করিল। ক্রুদ্ধ রস্তম আলি বক্তাকে সবলে পদাঘাত করিয়া আদেশ দিলেন,—"যেখানে পাও, সেই দুরন্ত কাফেরটাকে ধরিয়া লইয়া আইস।"

প্রভুভক্ত সিপাহীদল তখন কাফেরের অন্বেষণে চারিদিকে ছুটিল। তাহাদের মধ্যে কেহই যে

রূপনাথকে চিনিত না, ইহা বলাই বাহুল্য। আর চিনিলেই বা কি হইত? কারণ, তাহারা যখন সেই মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নদীতীরে, ঝোপের মধ্যে, গাছের ডালে অপরাধীর অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল, রূপনাথ তখন দেবীগড়ায় আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়া অচেতন-প্রায় কমলার শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, আমাদের বর্ণনীয় কালে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই লাঠিখেলা একটা সাধারণ ক্রীড়ার মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রায় সকলেই তাহাতে অল্পবিস্তর শিক্ষিত হইত। বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য পাঠকসমাজ এ কথাটায় ততদূর বিশ্বাসস্থাপন করুন বা না করুন, কিন্তু সেই অসভ্য যুগে লাঠির সহায়েই যে বাঙ্গালী আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করিয়াছিল, এবং এই বাঁশের লাঠির বলেই যে একজন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নীকে দুর্দ্দান্ত ফৌজদারের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়। হায়, সেই বাঙ্গালী আমরা লাঠি ছাড়িয়া আজি অস্ত্র-আইনের প্রতিবাদের জন্য উচ্চ চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করি।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### ব্রতগ্রহণ।

দেবীগড়ার বৃদ্ধ জমীদার রণজিৎ রায় প্রাতঃকালে কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গে বেষ্টিত হইয়া জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছিলেন। এমন সময় রূপনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া রায় মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রায় মহাশয় উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, রূপনাথ ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সে আসন স্বতন্ত্র এবং জমীদার মহাশয়ের আসন হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ।

অনেকক্ষণ পরে জমীদারী কার্য্যাদি পরিদর্শন শেষ হইলে, কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারী ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। তখন রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া রূপনাথ বলিলেন,—"আপনার নিকট আমার এক আবেদন আছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"কি আবেদন?"

রূপনাথ বলিলেন,—"অধ্যয়নশেষে গুরুদেব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সম্প্রতি আমি সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি, এবং তজ্জন্য আমার পরিণীতা পত্নীকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছি।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"উত্তম করিয়াছ? সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম; আর সহধর্ম্মিণীই তাহাতে প্রধান সহায়। তা এ জন্য কি সংসারের বিশেষ কোন অভাব হইয়াছে?"

রূপনাথ বলিলেন,—"অভাব যথেষ্ট। কিন্তু অদ্য আমি তজ্জন্য আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থী নহি। এক্ষণে আমি এবং আমার পত্নী ঘোর বিপদগ্রস্ত।"

রায় মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বিপদ্!"

তখন রূপনাথ একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, কেবল কমলার অস্ত্রধারণের কথাটা গোপন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া রায় মহাশয় একটু চিন্তা করিলেন; বলিলেন—"এক্ষণে আমাকে কি করিতে বল?"

রূপ। যদিও আমি কোনরূপে সেখান হইতে স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছি, তথাপি এখনও আমরা সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত হইতে পারি নাই। ফৌজদার সহজে ছাড়িবে না। বিশেষতঃ আমার হস্তে তাহার কয়েকজন সিপাহী হত হইয়াছে। অতএব ফৌজদার যে ইহার একটা প্রতীকার না করিয়া নিরস্ত হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

রায়। কাজটা ভাল কর নাই।

রূপ। ইহা ভিন্ন তখন আর অন্য উপায় ছিল না।

রায়। তার পর এখন কি উপায় করিবে?

রূপ। সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। এখন উপায় আপনি।

রায়। আমাকে কি ফৌজদারের সহিত লড়াই করিতে বল?

রূপ। কেন বলিব না? আপনি আমাদের জমীদার, রাজা, রক্ষাকর্ত্তা। অন্য রাজা কে, কোথায় থাকে, তাহা জানি না। আমরা আপনাকেই রাজা ও রক্ষক বলিয়া জানি। আপনি না রক্ষা করিলে আমরা কোথায় দাঁড়াইব?

রায় মহাশয় নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ! তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

রূপ। বিপদে পড়িলেই লোকে পাগল হয়।

রায়। কিন্তু আমি তো তোমার মত পাগল হই নাই? রাজার সঙ্গে লড়াই? কি সর্ব্বনাশ! রামচন্দ্র!

রূপ। আপনাকে আমি রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলিতেছি না। কেবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে—অধর্ম্মের বিরুদ্ধে আপনাকে দাঁড়াইতে বলিতেছি।

রায়। সে একই কথা। রাজা আর রাজার লোক দুই-ই এক।

রূপ। একই কথা নয়। যে রাজা প্রজাপালক,

সে পূজ্য; কিন্তু যে অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক, সে ঘৃণার্হ।

রায়। রাজামাত্রেই পূজ্য। বুড়া বয়সে কেন আমাকে আর জ্বালাতন কর?

রূপনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তবে কি অত্যাচার-দমনের কোনই উপায় নাই?"

রায় মহাশয় উৰ্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"উপায় ভগবান্।"

রূপ। বুঝিয়াছি, এ বিপদ্ হইতে আমাদের আর উদ্ধার নাই। জানি না, আমাদের মারিয়া ভগবানের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

রায়। তুমি কি বলিতে চাও যে, তুমি খুন করিয়া আসিয়াছ, আর সে জন্য আমি শূলে যাইব, ইহাই ভগবানের ন্যায়-বিচার?

রূপনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"আমি আমার জন্য বলিতেছি না। আমি খুন করিয়াছি, শূলে যাইতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু সেই অভাগিনীর —যাহার জন্য এই বিপদ্ উপস্থিত, সেই হতভাগিনীর কি রক্ষার কোন উপায় নাই?"

রায় মহাশয় বদন বিনত করিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"আপনি তাহার ভার গ্রহণ করুন, আমি ফৌজদারের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে চলিলাম।"

রায় মহাশয় মুখ তুলিলেন; দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কি করিব ঠাকুর! আর সে দিন নাই! বাঙ্গালীর বাহু এমন দুর্ব্বল।"

রূপনাথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"মিথ্যা কথা; বাঙ্গালীর বাহু দুর্ব্বল নহে, বাঙ্গালীর হৃদয় দুর্ব্বল; বাঙ্গালী শক্তিহীন নহে, বাঙ্গালী সাহসহীন; বাঙ্গালী ক্ষমতাশূন্য নহে, বাঙ্গালী একতাশূন্য।"

রায় মহাশয় নীরব হইলেন। রূপনাথ বলিতে লাগিলেন,—"আপনি আর্য্যসন্তান, আপনি সতীত্বের মর্য্যাদা জানেন। সেই জন্যই আবার বলিতেছি, সেই বিপন্না অবলার কি হইবে? যাহাদিগের মাতা, কন্যা, স্ত্রী হাসিতে হাসিতে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া সতীত্বের গৌরব প্রদর্শন করে, সেই আর্য্যসন্তানদিগের সম্মুখে একজন বিধর্ম্মী আসিয়া অবলার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে—পিশাচের পদতলে সতীর সতীত্ব বিদলিত হইবে, কিন্তু একজন আর্য্যসন্তানও কি সাহস করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে না? সতীত্ব-গৌরব-প্রদীপ্ত এত বড় বাঙ্গালার মধ্যে কেহই কি তাহাকে আশ্রয় দিবে না?"

"আমি দিব" এক সৌম্যদর্শন যুবক সেখানে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমি দিব!"



সকলেই সবিস্ময়ে যুবকের দিকে চাহিলেন। রূপনাথ গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন,—"শঙ্কর! তুমি রাজ্যেশ্বর হও।"

রায় মহাশয় একবার শঙ্করের তেজোগর্ব্বসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন। তার পর রূপনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। যাও ঠাকুর, তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিলাম।"

রূপনাথ শঙ্কর ও রায় মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিশ্চিন্তমনে প্রস্থান করিলেন। সভাভঙ্গ হইল।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### শঙ্কর।

রণজিৎ রায় তৎপ্রদেশের মধ্যে একজন বিপুল-বিত্তশালী প্রবল-প্রতাপান্বিত জমীদার। তাঁহার সুবিস্তৃত জমীদারী, অমোঘ প্রতাপ, বিশাল বৈভব; সুবৃহৎ প্রাসাদ; প্রাসাদে পরিজন, দাসদাসী, কর্ম্মচারী প্রভৃতির সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। প্রাসাদদ্বারে ভীমকায় সশস্ত্র প্রহরিদল দিবারাত্র পাহারা দিতেছে। সর্ব্বত্রই যেন ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার চিহ্ন সকল ফুটিয়া উঠিতেছে। ফল কথা, আজিকালিকার মহারাজ উপাধিধারী ধনীদিগের গৃহে যেরূপ ঐশ্বর্য্য-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাৎকালীন রাজা উপাধিবিহীন জমীদার রণজিৎ রায়ের গৃহে তদপেক্ষা অনেক অধিক বৈভব-লক্ষণসমূহ বিরাজিত ছিল। বিশেষতঃ আধুনিক জমীদারগণের সহিত তৎসাময়িক জমীদারদিগের তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, সে সময়ে জমীদারগণ নামমাত্র অধীন হইলেও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতেন। রাজা কেবল তাঁহাদিগের নিকট হইতে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর গ্রহণ করিতেন মাত্র, তদ্ব্যতীত তাঁহারা আর কোনরূপে রাজার অধীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন না। রাজ্যের আয়-ব্যয়-বৃদ্ধি, প্রজাশাসন, বিচারকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে জমীদারগণই প্রায় সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। স্থানে-স্থানে শাসনাদি কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা বা ফৌজদার থাকিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই নানাবিধ কারণে তাঁহারাও প্রায় জমীদারদিগের করায়ত্ত হইয়া পড়িতেন। এই সকল জমীদারের অধীনে ন্যূনাধিক পরিমাণে সৈন্য থাকিত, সৈন্যানুরূপ কামান, বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রও থাকিত। তাঁহাদিগের অধিকৃত বা সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে বিদ্রোহাদি উপস্থিত হইলে তাঁহারা সেই সকল সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ লইয়া রাজসৈন্যের সাহায্য

করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের পাইক-নামধারী আর এক প্রকার সৈন্য থাকিত। এই পাইক-সৈন্য কি, তাহা পরে বলিব। ফল কথা, তাৎকালীন জমীদারগণ স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে সম্রাট্ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন সম্মান লাভ করিতেন না। লোকে তাঁহাদিগকে রাজা বলিয়া জানিত এবং রাজা বলিয়াই ডাকিত। প্রথাটা আজিও চলিয়া আসিতেছে—এখনও অনেক স্থানে জমীদারগণ সাধারণের নিকট রাজা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তবে সে সময়ে যে জমীদারগণ কোন অসুবিধাই ভোগ করিতেন না, এরূপ নহে। তখন এরূপ চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায় সুবাদারের ইচ্ছানুসারে জমী-দারী বিলি হইত। যথাসময়ে খাজনার টাকা না পৌঁছিলে অথবা অন্য কোন কারণে সুবাদার বিশেষ রুষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই জমীদারীস্বত্ব প্রদান করিতেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমীদার, তাঁহারা দৈবক্রমে খাজনার টাকা যথা-সময়ে দিতে না পারিলে সুবাদার বা ফৌজদারের হস্তে অশেষরূপে নির্য্যাতিত হইতেন। তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ-নামক এক ভীষণ যন্ত্রণাময় স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া টাকা আদায় করা হইত। * তবে যাঁহারা উপহারাদি-দানে সুবাদার বা ফৌজদারগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের কোন ভয়ই ছিল না।

এরূপ ক্ষমতাশালী হইলেও রণজিৎ রায় যে প্রথমে রূপনাথ বা কমলাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হইয়া-ছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। তিনি জানিতেন যে, এরূপ অবস্থায় রূপনাথকে আশ্রয় দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কর্ত্তব্যপালন করিতে হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ফৌজদারের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইবে। ফৌজদার সহজে ছাড়িবে না। সে নিশ্চয়ই সৈন্যসজ্জা করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। তখন একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধিবে। সে যুদ্ধে আপাততঃ তাঁহার জয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও পরিণামে ফল অতি ভয়ঙ্কর হইবে। পরাজিত অবমানিত ফৌজদার কখনই অমে ছাড়িয়া দিবে না। সে পুনঃ পুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। শেষে ফৌজদারের কৌশলে এই ঘটনার সংবাদ অতিরঞ্জিতভাবে সুবা-দারের কর্ণগোচর হইবে। এমন কি, এ সংবাদ দিল্লী পর্য্যন্তও যাইতে পারে। তখন অসংখ্য মোগল-সৈন্য আসিয়া জমীদারী ছাইয়া ফেলিবে, দেশ ছারখারে যাইবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন ফৌজদারের রোষদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহাকে জমীদারীর সহিত ভস্মীভূত হইতে হইবে।

এইরূপ পরিণাম চিন্তা করিয়াই প্রবীণ রণজিৎ রায় রূপনাথকে অভয় দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তবে তিনি যে এই ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে ফৌজদারের ক্রুদ্ধকবলে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাহা নহে। তৎকালে হিন্দুসমাজের মধ্যে এরূপ পাষণ্ডের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, বিশেষতঃ ধর্ম্মভীত প্রবীণ জমীদারদিগের মধ্যে। তিনি অর্থাদি-প্রদানে বা অন্য কোন কৌশলে এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের রক্ষার উপায় করিবেন, স্থির করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা হইল না! তখন নিয়তির উদ্দাম স্রোত আর এক বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছিল; সে স্রোতের প্রবল বেগ তাঁহাকে প্রবাহমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে ভাসাইয়া লইয়া ছুটিল; ঘটনার কর্ম্মময় চক্র বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়া পড়িল। সে চক্রের নিয়ন্তা শঙ্কর—ইচ্ছা নিয়তির।

শঙ্কর রণজিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। রণজিৎ রায় অতুল বৈভবশালী হইলেও সংসারের চরম সৌভাগ্য পুত্র-মুখদর্শনে বঞ্চিত! এ জন্য অনেক যাগযজ্ঞ, দান-ধ্যানাদির অনুষ্ঠান হইল; কিন্তু কোনরূপেই অদৃষ্টের দৃঢ়রুদ্ধ অর্গল মুক্ত হইল না। রণজিৎ পুত্রলাভে বঞ্চিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ পরলোকগত হইলেন; তাঁহার সাধ্বী পত্নী তিন মাসের শিশুপুত্র শঙ্করকে রণজিতের স্ত্রীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিলেন। শোকাতুর রণজিৎ ভ্রাতৃশোক বিস্মৃত হইবার জন্য সেই ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে তুলিয়া লইলেন। পুত্রহীন দম্পতীর সন্তপ্ত হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে স্নিগ্ধ হইল। তাঁহারা মাতৃপিতৃহীন এই শিশুটির উপর সমস্ত হৃদয়ের ভালবাসা ও স্নেহ ঢালিয়া তাহাকে সযত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। শঙ্করের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের অপত্যশূন্য হৃদয়ের ক্ষোভ ক্রমে অন্তর্হিত হইল। ক্রমে শঙ্কর সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের পুত্রের স্থান অধিকার করিল! শেষে তাঁহারা যে অপুত্রক,'এ কথা সকলেই ভুলিয়া গেল, তাঁহারাও ভুলিলেন।

এইরূপে দুইটি স্নেহ ও ভালবাসার শান্ত তরঙ্গ-গুলির উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে শঙ্কর অষ্টাদশবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। তাহার রূপ, তাহার গুণ, তাহার কার্য্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। সকলেই রণজিতের অবর্ত্তমানে তাহাকে এই সুবিশাল জমী-দারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া বুঝিল; বুঝিয়া সকলে আনন্দিত হইল! শঙ্কর বৃদ্ধগণের নিকট

* Riyazu-s-salatin.

বিনয়নম্র বালক, দরিদ্রের সম্মুখে করুণাময় দেবতা, প্রজাগণের নিকট সর্ব্বগুণান্বিত সৌম্যদর্শন অধিপতি। এ হেন শঙ্করকে দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইবে? রণজিতের আর আনন্দের সীমা রহিল না। শঙ্করের হস্তে জমীদারীর ভার অর্পণ করিয়া তিনি সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, স্থির করিলেন, কিন্তু শঙ্করকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার স্নেহমুগ্ধ হৃদয় কাতর হইল। তিনি আজিকালি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

অনেক গুণ থাকিলেও দোষের মধ্যে শঙ্কর একটু বেশী আবদারে। বাল্যকাল হইতেই তিনি যাহা ধরিয়াছেন, তাহা না করিয়া ছাড়েন নাই। যখন যে সাধ করিয়াছেন, স্নেহবিহ্বল জ্যেষ্ঠতাত হাসিতে হাসিতে তাহাই পূরণ করিয়াছেন। এখন বয়স হইলেও তাহার সে দোষটুকু যায় নাই। আর রণজিৎ সেটাকে দোষ বলিয়াই মনে করিতেন না। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার শঙ্কর—এমন সোনার ছেলে শঙ্কর যদি আবদারে না হইবে, তবে আর কে হইবে? কিন্তু তখন বৃদ্ধ জানিতেন না যে, একদিন এই আবদারের জন্যই তাঁহাকে এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; জানিয়া শুনিয়া ক্রুদ্ধ বিষধরের সম্মুখে হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে।

শঙ্কর সভামধ্যে আসিয়া যখন রূপনাথকে বলিলেন, —"আমি আশ্রয় দিব," তখন রণজিৎ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি শঙ্করের প্রতিজ্ঞা জানিতেন। তথাপি একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে দৃঢ়তার—বীরত্বের অপূর্ব্ব বিভা দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন, সেই সাহসিকতা—সেই শক্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, সেই আশ্রিত-বাৎসল্য—সেই করুণা দেখিয়া বৃদ্ধ মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোন কথা বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না। একেই রূপনাথের জ্বালাময় উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, তাহার উপর শঙ্করের—তাঁহার স্নেহ-পালিত শঙ্করের সেই গর্ব্ব-স্ফীত বদনমণ্ডল, সেই প্রতিজ্ঞা, সেই নির্ভীকতা দেখিয়া বৃদ্ধের শান্ত অবসন্ন হৃদয়ও গর্ব্বে নাচিয়া উঠিল; খর সৌর-করসম্পাতে ক্ষীণা চন্দ্রকলা প্রোজ্জ্বল হইল, মারুত-সংযোগে প্রধূমিত বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখন ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া, মনে মনে একবার ভগবান্‌কে ডাকিয়া ব্রাহ্মণকে অভয় দিলেন। পরিণাম-চিন্তার আর অবসর রহিল না। এইরূপেই ভবিষ্যৎ-অন্ধ মানব নিয়তি-চালিত হইয়া বিশাল কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তখন কে বলিতে পারে, সে ভবিষ্যতে উন্নতি বা অবনতিকে আলিঙ্গন করিবে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### আয়োজন।

রস্তম আলি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার অকর্ম্মণ্য সিপাহীগুলা সেই কাফের বা হোরী দুইয়ের একটাকেও ধরিতে না পারিয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি সবলে আপনার বিরল শ্মশ্রুরাজি আকর্ষণ করিতে করিতে, তাহারা যে এখনও কেন জাহান্নামে যায় নাই, তজ্জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর আক্ষেপের সীমা রহিল না। তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া দূতীকে ডাকাইলেন। দূতী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। রস্তম আলি চক্ষু পাকাইয়া তাহাকে কমলার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অনবধানতাই যে এই অনর্থের হেতু, তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহাকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখাইলেন। দূতী ভয়ে ভয়ে স্বামীর সহিত কমলার পলায়ন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রস্তম আলি ধমক দিয়া কোন্ গ্রামে কমলার শ্বশুরবাড়ী, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতী দেবীগড়ার কথা বলিল। দূতীকে বিদায় দিয়া রস্তম আলি তৎক্ষণাৎ দেবীগড়ায় বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করিলেন। পরদিন চর ফিরিয়া আসিয়া যথাযথ সংবাদ জানাইল, এবং সেই দুরন্ত কাফেরটাকে জমীদার রণজিৎ রায় যে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাও বলিল। ক্রোধে, ক্ষোভে গুম্ফ দংশন করিতে করিতে রস্তম আলি জমীদারীর সহিত বুড়া জমীদারটাকে সদ্য জাহান্নামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা সহ এক দূত রণজিৎ রায়ের নিকট প্রেরিত হইল;—"রণজিৎ রায় অবিলম্বে অপরাধী কাফেরটাকে তাহার স্ত্রীর সহিত বন্দী করিয়া ফৌজদার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।"

পরওয়ানা পাঠ করিয়া রণজিৎ রায় কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; তিনি এইরূপ পরওয়ানার প্রত্যাশা করিতেছিলেন। নিকটে শঙ্কর বসিয়াছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠতাতের হস্ত হইতে পরওয়ানাখানা লইয়া পাঠ করিলেন। রণজিৎ দূতকে বলিলেন,—সে ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলেও আমার আশ্রিত। আমি তাহার পরিবর্ত্তে ফৌজদার সাহেবকে দুই সহস্র মুদ্রা

নজর দিতেছি, তাহা লইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করুন।”

দূত গিয়া সমস্ত কথা রস্তম আলির গোচর করিল। শুনিয়া রস্তম আলি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সাধ্য হইলে তিনি সে ক্রোধাগ্নিতে দেবীগড়া গ্রামটাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিতেন। কিন্তু অধুনা তাহার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়াই অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন এবং অচিরেই রণজিৎ রায়ের জমীদারীটাকে শঙ্খেশ্বরীর গর্ভে ডুবাইবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিন শত সৈন্যকে সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা পরওয়ানা রণজিৎ রায়ের নিকট প্রেরিত হইল। পরওয়ানায় লিখিলেন,—“রণজিৎ রায় অপরাধীকে আশ্রয় দিয়া রাজবিধির অমর্য্যাদা করিয়াছেন, অতএব তিনি দণ্ডার্হ। কিন্তু এখনও যদি তিনি ফৌজদার সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে। নতুবা তাঁহার ন্যায় অবাধ্য জমীদারকে শাসন করিবার জন্য শীঘ্রই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইবে। ফৌজদার সাহেব সত্বর সসৈন্যে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।”

রস্তম আলি ভাবিলেন, এই পরওয়ানা পাইয়া বৃদ্ধ জমীদার নিশ্চয়ই ভীত হইবে এবং তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিবে। কিন্তু এখন দেখিলেন যে, তাঁহার এ পরওয়ানার মর্য্যাদাও রক্ষিত হইল না, অধিকন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার প্রেরিত পরওয়ানা শঙ্করের পদতলে মর্দ্দিত হইয়াছে, তখন শীকারভ্রষ্ট শ্বাপদের ন্যায় ক্রুদ্ধ রস্তম আলি এই বৃদ্ধ জমীদারকে শাসিত করিবার অভিপ্রায়ে তিন শত সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া সদলবলে দেবীগড়া যাত্রা করিলেন।

এ দিকে পরওয়ানার মর্ম্ম বুঝিয়া রণজিৎ রায়ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনিও আত্মরক্ষার্থ সৈন্য-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর মহোৎসাহে সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। সে কালের জমীদার-তনয়েরা বাল্যকাল হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইত। শঙ্করও অস্ত্রচালনায় এবং যুদ্ধ-কৌশলে রীতিমত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় দুইশত সৈন্য ও তদুপযোগী অস্ত্র সংগৃহীত হইল। শঙ্কর তাহাদের নেতা হইলেন এতদ্ব্যতীত জমীদারীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শতাধিক পাইক-সৈন্য সংগৃহীত হইল। লাঠী ও বর্শাচালনায় অভ্যস্ত ডোম, বাগ্দী প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকেরা পাইক নামে অভিহিত হইত। লাঠী-খেলায় ইহারা সিদ্ধহস্ত এবং ইহাই তাহাদের এক প্রকার জীবিকা ছিল। সন্নিকৃষ্ট যুদ্ধে ইহারা বিশেষ ক্ষমতা ও কৌশল প্রদর্শন করিত। ইহাদের লাঠীর সম্মুখে সৈনিকের তরবারি কিছুই করিতে পারিত না। তৎকালে প্রায় সর্ব্বত্রই ধনিগণ ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। পূজা, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে ইহারা আপনাদিগের লাঠী-চালনার কৌশল প্রদর্শন করিয়া ধনীদিগের নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিত। তখন ধনিগণ আদরের সহিত এই সকল নীচজাতীয় ব্যক্তির লাঠীখেলা দর্শন করিতেন এবং সন্তুষ্ট-চিত্তে ইহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন। ইহারাও তাহাতে উৎসাহিত হইয়া সযত্নে লাঠীখেলা শিক্ষা করিত এবং তাহার উন্নতি-বিধানে যত্নশীল হইত। কালে আমরা সভ্য হইয়া এই অসভ্যজনোচিত ক্রীড়াকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। ইহারাও উৎসাহ না পাইয়া লাঠীখেলা ত্যাগ করিল। ক্রমে খেলার সহিত লাঠীও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। এখনও কোন কোন স্থানে এই খেলার অল্প প্রচলন আছে বটে, কিন্তু তাহাও অতি কষ্টে পূর্ব্ব-গৌরবের একটু স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে মাত্র।

রূপনাথ স্বয়ং লাঠী-চালনায় সিদ্ধহস্ত। তিনি এই পাইক-সৈন্যের নেতা হইবেন, স্থির করিয়া রাখিলেন।

এত যে হইয়াছে, তাহা কমলা জানে নাই। রূপনাথ তাহাকে বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু যখন যুদ্ধোদ্যোগ গ্রামে রাষ্ট্র হইল, তখন কমলাও ইহা শুনিল। শুনিয়া তাহার বড় ভয় ও ভাবনা হইল। সে রূপনাথকে বলিল,—“কেন এ সর্ব্বনাশের আয়োজন করিলে?”

রূপনাথ হাসিয়া বলিলেন, “সর্ব্বনাশ কি কমলা?”

কমলা বলিল,—“শুনিতেছি, আমাদের জন্য ফৌজদারের সহিত রণজিৎ রায়ের লড়াই হইবে?”

রূপনাথ বলিলেন,—“হাঁ।”

কমলা বলিল,—“কেন এমন কাজ করিলে? আমাদের জন্য ইঁহারা কেন ধনে-প্রাণে মারা যাইবেন?”

রূপনাথ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“ভগবানের যদি সেইরূপই ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হইবে। তুমি আমি তাহার কি করিতে পারি কমলা?”

কমলা বলিল,—“কিছুই কি পারি না?”

রূপ। ফৌজদারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি।

কমলা। তাহা ছাড়া কি অন্য উপায় নাই?

রূপ। না।

কমলা। উপায় আছে।

রূপনাথ সে উপায় বুঝিলেন; বলিলেন,—“না

কমলা এখন সে উপায়কে মনেও স্থান দিও না। তবে আমাদিগকে একদিন মরিতেই হইবে—একদিন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে; কিন্তু সে এখন নয়।"

কমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কবে?"

রূপনাথ বলিলেন,—"সময় হইলে বলিব।"

কমলা আর কিছু বলিল না। রূপনাথ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তখন কমলা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে গদ্গদকণ্ঠে বলিল,—"ঠাকুর! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। স্বামীর মুখে শুনিয়াছি, আমরা কিছুই নয়, নিমিত্তমাত্র। তথাপি অগ্রেই আমার কর্ত্তব্য আমি করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না। জানি না, এই উভয় কর্ত্তব্যের মধ্যে কোন্‌টা বড়। আমাকে ক্ষমা করিও দয়াময়!"

অশ্রুধারায় কমলার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### দীক্ষা।

একদিন প্রভাতে সুপ্তোত্থিত গ্রামবাসিগণ সভয়ে দেখিল, অদূরে গ্রামের প্রান্তভাগে বিস্তৃত প্রান্তরে ফৌজদারের বাহিনী আসিয়া সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে পত্ পত্ শব্দে মহম্মদীয় কেতন উড়িতেছে, সিপাহীগণের কটিবদ্ধ অসিকোষে প্রভাত-সূর্য্য-কিরণ পড়িয়াছে, নবীনালোকে বন্দুকের অগ্রভাগ ঝলসিতেছে। গ্রামের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠার রোল পড়িয়া গেল; গৃহস্থগণ সভয়ে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল, পথিক পথ ছাড়িয়া পলাইল, বণিক্ বিপণিদ্বারে চাবী লাগাইল। সর্ব্বত্রই একটা আশঙ্কার ছায়া নাচিতে লাগিল।

শঙ্কর বহুপূর্ব্বেই এ সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। তিনিও সজ্জিত সৈন্যগণকে লইয়া সিপাহীদের গ্রাম-প্রবেশের পূর্ব্বেই তাহাদের গতি-প্রতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। যাত্রাকালে জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রণজিৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, স্নেহাশ্রুধারে তাঁহার মস্তক সিক্তিত করিতে করিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। তার পর শঙ্কর রূপনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, "ঠাকুর! যুদ্ধে চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন।"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"যুদ্ধে যাও, কিন্তু আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষা করিও না শঙ্কর!"

শঙ্কর সবিস্ময়ে রূপনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"বিস্মিত হইও না। জান না কি, এ যুদ্ধ কোন দেশজয়ের আশায়, কোন রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় নহে? ইহা কেবল অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য, অত্যাচার-দমনের জন্য। তবে ইহার মধ্যে জয়-পরাজয়ের—লাভালাভের আশা কেন শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিলেন,—"এ কি বলিতেছেন ঠাকুর?"

রূপনাথ বলিলেন,—"যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছি। তবে শুন শঙ্কর! বহুদিন পূর্ব্বে আর একবার এই ভারতে অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য, অত্যাচার-দমনের জন্য ভারতপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র-সমর সংঘটিত হইয়াছিল। সে যুদ্ধেও আশা-বিকলচিত্ত অর্জ্জুনকে অন্যায়ের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করাইবার জন্য এক মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—'নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।' আজি বহুদিন পরে আমিও সেই মহাবাক্যের পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি, শঙ্কর! জয়-পরাজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া কেবল অত্যাচারদমনকেই আপনার কর্ত্তব্যব্রত-রূপে গ্রহণ কর।"

শঙ্কর বলিলেন,—"কঠোর ব্রত।"

রূপনাথ বলিলেন,—"অতি কঠোর। কিন্তু ব্রতানুষ্ঠান ব্যতীত দুষ্কর সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যদি বঙ্গের এই ভীষণ অত্যাচার-স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে চাও,—যদি দেশের এই ঘোর হাহাকার নিবারণ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে অগ্রে স্বার্থ-চিন্তা পরিহার কর। এখন অত্যাচার-দমন তোমার লক্ষ্য, যুদ্ধ তোমার কার্য্য।"

শঙ্কর। আর বিধর্ম্মি-প্রপীড়িত দেশ?

রূপ। কে বিধর্ম্মী শঙ্কর? দেশের উপর অত্যাচার অধর্ম্ম,—তদ্বিপরীতই ধর্ম্ম। অত্যাচারের দমন কর, তখন আর ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদ থাকিবে না। এই মহাকার্য্য সাধন করিবার জন্য অগ্রসর হও,—আপনার কর্ত্তব্য পালন কর। জয়-পরাজয়ে তোমার অধিকার কি শঙ্কর?

শঙ্কর। কিছুই নাই?

রূপ। কিছুই নাই। একবার সেই মহাপুরুষের অমরকণ্ঠধ্বনিত সুপবিত্র গীতি স্মরণ কর,—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" আমাদের কর্ত্তব্য-সাধন করিতে আমরা বাধ্য, জয়-পরাজয়ে আমাদের কি শঙ্কর?

সহসা যেন শঙ্করের নবচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি

ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন,—"এতদিন এ মহা উপদেশ পাই নাই কেন ঠাকুর ?"

রূপনাথ শঙ্করের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। বলিলেন,—"কার্য্যকালই শিক্ষার প্রকৃত অবসর, কার্য্যই প্রধান শিক্ষক। চল শঙ্কর! এখন আমরা সেই মহান্ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই।"

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"আপনি কোথায় যাইবেন ?"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"যুদ্ধে।"

শঙ্কর। যুদ্ধে ?

রূপ। কেন শঙ্কর, ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কি শক্তি নাই ? ব্রাহ্মণের বাহু কি এতই দুর্ব্বল ?

শঙ্কর। কিন্তু শাস্ত্রবলে ব্রাহ্মণ চির-শক্তিমান্।

রূপ। না শঙ্কর, সে শাস্ত্রবলের যুগ গত হইয়াছে। এখন আর তাহার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এখন একবার শাস্ত্রবল ছাড়িয়া শস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এখন একবার দেখাইতে হইবে যে, ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তি কেবল শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যোদ্ঘাটনেই পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা শস্ত্রচালনেও সুনিপণ। হায় শঙ্কর, আর কতদিন বসিয়া বসিয়া দেশের এই দুর্দ্দশা দেখিব ?

শঙ্কর আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার নেত্রপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। তখন রূপনাথ সাদরে শঙ্করের হস্তধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আবার বুঝি বহুদিন পরে বঙ্গের কুরুক্ষেত্রে নর-নারায়ণের আবির্ভাব হইল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### বোধন।

বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরের এক পার্শ্বে তিন শত সিপাহী শ্রেণীবদ্ধভাবে বন্দুক-হস্তে দণ্ডায়মান। রক্তিম সূর্য্যকিরণ তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহণে রস্তম আলি। অপর পার্শ্বে শঙ্কর-চালিত দুই শত সৈন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত; তাহাদের মধ্যস্থলে অশ্বারোহী শঙ্কর। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ গৌরব-স্ফীত বদন-মণ্ডলে বীরত্বের আভা স্ফুরিত হইতেছে। এই সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে শতাধিক পাইক-সৈন্য সুদীর্ঘ লাঠিহস্তে দণ্ডায়মান। তাহাদের অগ্রভাগে রূপনাথ। উভয় পক্ষই নীরব, সকলেই আক্রমণোৎসুক।

সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রূপনাথ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"ভাই সব, আজি আমরা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য, সতীর সতীত্ব-রক্ষার জন্য, হিন্দুর হিন্দুত্বরক্ষার জন্য শত্রু-শোণিতে মা'র প্রথম উদ্বোধন করিতে আসিয়াছি; জীবন দিয়া জীবন অপেক্ষা প্রিয়, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মনোহর জননী জন্মভূমির হাহাকার নিবারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আজি হিন্দুর বড় সৌভাগ্য—আজি আমাদের বড় আনন্দের দিন। একবার সকলে মুক্তকণ্ঠে বল, 'জয় জগদীশ হরে'!"

অমনই আকাশ, প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া তিন শত কণ্ঠ হইতে শব্দ উঠিল, 'জয় জগদীশ হরে!' বিশাল প্রান্তর কম্পিত করিয়া সেই জয়ধ্বনি উন্মুক্ত গগনপথে ছুটিল। তাহার শেষ প্রতিধ্বনি দিগন্তে মিলাইতে না মিলাইতে সিপাহীগণের হস্তস্থিত বন্দুক, 'দুড়ুম দুড়ুম' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের বাহিনীও তাহার উত্তর দিল।

তার পর সেই অবিশ্রান্ত দুড়ুম্ দুড়ুম শব্দে আকাশ, প্রান্তর কম্পিত হইয়া উঠিল; ধূমে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইল, উভয় পক্ষেই অনেক লোক হতাহত হইতে লাগিল; কোলাহল ও আর্ত্তনাদে প্রান্তর পরিপূরিত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষ দূরতা ত্যাগ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পড়িল। তখন সকলে বন্দুক ছাড়িয়া অসি ধারণ করিল।

রূপনাথ এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া সেই অস্ত্রধারী সৈন্যশ্রেণীমধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাইকগণও উচ্চ হুঙ্কার তুলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। সেই উন্মত্ত সৈন্যশ্রেণীমধ্যে দাঁড়াইয়া রূপনাথ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—"জয় জগদীশ হরে!" অমনই গগন বিদীর্ণ করিয়া তিন শত কণ্ঠে নিনাদিত হইল, "জয় জগদীশ হরে!"

রস্তম আলি প্রথমে পাইকগণের এই সাহস দেখিয়া একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, এই অস্ত্রধারী সৈন্যের মধ্যে লাঠি কি করিবে? এখনই উহাদের ছিন্ন শিরঃগুলা সিপাহীদের পদতলে লুটাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখিলেন যে, সেই অস্ত্রহীন কাফেরগুলার লাঠীর এক এক আঘাতে তাঁহার অস্ত্রধারী সিপাহীর মস্তক চূর্ণিত হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িতেছে, অকর্ম্মণ্য সিপাহীগুলা একে একে কাফেরের পাদমূলে লুণ্ঠিত হইতেছে, তখন তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; তাঁহার বিস্ময় ও আক্ষেপের সীমা রহিল না। হায় হায়, তুচ্ছ কাফেরগুলার বাঁশের লাঠীর এত ক্ষমতা? রস্তম আলি সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ক্রোধে ক্ষোভে গুম্ফ দংশন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় এক প্রহরকাল যুদ্ধ চলিল। রক্তে প্রান্তর কর্দ্দমিত হইল, হতাহতের দেহে রণস্থল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। ক্রমে সিপাহীরা হীনবল হইয়া আসিল। তখনও রূপনাথের উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতেছে, 'জয় জগদীশ হরে!' ক্ষীণবল সিপাহীগণ আর সেই অপ্রতিহত তেজ সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা পাছু হটিল। অমনই শঙ্করের বাহিনী দ্বিগুণ-বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন পলায়নোন্মুখ সিপাহীরা যে যে দিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। রস্তম আলিও ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে ভগ্নহৃদয়ে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। শঙ্করের বাহিনী সিপাহীদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছিল, শঙ্কর তাহাদের নিবারণ করিলেন।

প্রবল-প্রতাপশালী ফৌজদার সাহেব হতাবশিষ্ট দ্বিশত মাত্র সৈন্য লইয়া ছিন্নলাঙ্গুল শৃগালের ন্যায় রাজনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রূপনাথ সেই রুধির-কর্দ্দমিত রণস্থলে শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া শোণিতরঞ্জিত শরীরে শঙ্করকে আলিঙ্গন করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে গাহিলেন,—'জয় জগদীশ হরে!' সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে শঙ্করও গাহিলেন, 'জয় জগদীশ হরে!' আকাশ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া শত শত কণ্ঠ হইতে শব্দ উঠিল,—'জয় জগদীশ হরে!"

এ দিকে পাইকগণ সেই সৈন্যশ্রেণীমধ্যে যেন উন্মত্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের কণ্ঠ হইতে নিনাদিত হইতে থাকিল, 'জয় জগদীশ হরে!' সে শব্দে সিপাহীগণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের শিক্ষিতহস্তচালিত তীক্ষ্ণধার তরবারি পাইকগণের লাঠীতে ঠেকিয়া ব্যর্থ হইল, কাহারও অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই চক্রবৎ বিঘূর্ণিত লাঠী আসিয়া কাহারও মস্তকে, কাহারও হস্তে, কাহারও স্কন্ধে পড়িতে লাগিল। সে ভীষণ আঘাতে কোন সিপাহীর মাথা ফাটিল, কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও বা স্কন্ধের অস্থি বিচূর্ণিত হইল। একটি মাত্র আঘাতেই পৃথিবীটা তাহাদের দৃষ্টিতে ঘুরিয়া উঠিল, তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নমূল পাদপবৎ ধরালুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তবে শিক্ষিত সিপাহীর তরবারি যে সর্ব্বত্র ব্যর্থ হইল, তাহা নহে। সে আঘাতেও অনেক পাইক পড়িল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

অদূরে দাঁড়াইয়া রস্তম আলি এই ভীষণ লাঠীবাজী দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই সর্ব্বনেশে লাঠীই আজ তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। হায় নির্ব্বাসিত লাঠী! আবার কি তুমি অস্ত্রশূন্য দুর্ভাগা বঙ্গে ফিরিয়া আসিবে না?

# দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রতিষ্ঠা

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষম্॥"

গীতা। ৩।১৯

### প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রণয়ে প্রত্যাখ্যান।

শরতের প্রভাত,—বড় শান্ত, বড় মধুর, বড় সমুজ্জ্বল। আকাশ নীল, নির্ম্মল, মেঘশূন্য; প্রকৃতি সহাস্যবদনা; দিক্‌চয় পরিষ্কৃত, প্রমুদিত। দেবীগঙ্গার প্রান্তভাগ বিধৌত করিয়া স্বচ্ছসলিলা শঙ্খেশ্বরী প্রবাহিত হইতেছে; তাহার শান্ত সুনির্ম্মল সলিলরাশি প্রভাতালোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, ধীর সমীরাঘাতে তাহাতে বীচিভঙ্গ হইতেছে, ক্ষুদ্র তরঙ্গশিরে রক্ত রবিকর জ্বলিতেছে। আর সেই প্রভাতালোকোদ্ভাসিতা শান্ত-বীচিবিক্ষেপশালিনী শঙ্খেশ্বরীর তীরে সেফালিকা-বৃক্ষতলে আধফুটন্ত পদ্মের ন্যায় একটি বালিকা অঞ্চল ভরিয়া সেফালিকা-পুষ্প

কুড়াইতেছে। তাহার ললাটপতিত অসংযত বঙ্কিম কেশগুচ্ছ প্রভাত-মন্দানিলে উড়িতেছে, পূর্ব্বাকাশ হইতে একটা অরুণিমা আসিয়া তাহার নিটোল কপোল স্পর্শ করিতেছে, দুই একটা বৃন্তচ্যুত সেফালিকা তাহার মাথায় গায়ে পড়িতেছে। একটা ভ্রমর আসিয়া পুষ্পপূর্ণ অঞ্চলের উপর বসিতেছে, একবার কপোলের নিকট উড়িয়া গুন্ গুন করিতেছে, আবার বালিকার হস্তসঞ্চালনে ভীত হইয়া, উড়িয়া গিয়া গাছের উপর একটি সেফালিকার মাঝে বসিতেছে। তাহার ভারে ক্ষীণবৃন্ত সেফালিকা বৃন্তচ্যুত হইয়া বালিকার মাথার উপর পড়িতেছে. অমনই ভ্রমর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বালিকার অঞ্চলের নিকট ঘুরিতেছে। বালিকা আপন মনে অঞ্চল ভরিয়া রাশীকৃত ফুল সংগ্রহ করিতেছে। বালিকার পদতলে কেবল শঙ্খেশ্বরী অস্ফুটভাষায় প্রভাতী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মন্থর-গমনে চলিয়াছে; আর তাহারই সেই মধুরাস্ফুটস্বরে স্বর মিশাইয়া বালিকা আপন মনে গুন্ গুন্ করিতেছে।

এমন সময় সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

বালিকা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পশ্চাতে শঙ্কর প্রেমবিহ্বল-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বালিকা ব্যস্তভাবে অসংযত গাত্রাবরণ সংযত করিয়া লইল। তাড়াতাড়িতে কতকগুলা ফুল অঞ্চলচ্যুত হইল। বালিকা আবার সেগুলাকে একটি একটি করিয়া কুড়াইতে লাগিল। শঙ্কর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"আজি আর অন্য ফুল নাই কেন চন্দ্রা?"

চন্দ্রা মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল,—"আমি আর অন্য ফুল তুলিতে যাইব না।"

শঙ্কর। কেন?

চ। বাবা বারণ করিয়াছেন।

শ। কি জন্য বারণ করিয়াছেন?

চ। জানি না।

শ। তোমার বাবা এখনও কি তোমায় মারেন?

চন্দ্রা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অঞ্চলের ফুলগুলা বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইলে একবার মুখ তুলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে চাহিল। তখনই আবার মুখ নামাইয়া লইয়া, একটু থামিয়া, একটু ভাবিয়া বলিল,—"তুমি আবার কেন আসিলে?"

শঙ্কর বালিকার সেই ভীতিবিহ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেন চন্দ্রা, আমাকে আসিতে কি তুমি নিষেধ কর?"

চন্দ্রা মুখ নামাইয়া বলিল,—"না।"

শ। তবে কেন আসিব না?

চ। তুমি আসিলে—

সব কথাটা চন্দ্রা বলিতে পারিল না, মুখে বাঁধিয়া গেল। শঙ্কর বলিলেন,—"আমি আসিলে কি চন্দ্রা?"

চন্দ্রা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"তুমি আসিলে বাবা—"

এত করিয়াও চন্দ্রা কথাটা সমাপ্ত করিতে পারিল না। কিন্তু শঙ্কর সেই অসমাপ্ত কথাটার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন,—"বুঝিয়াছি চন্দ্রা, আমি আসিলে তোমার বাবা বিরক্ত হন।"

চন্দ্রা সজল দৃষ্টিখানি তুলিয়া শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিল। শঙ্কর একটি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তবে আর আমি আসিব না চন্দ্রা।"

চন্দ্রা কিছুই বলিল না, কেবল তাহার নেত্রপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। শঙ্কর একহস্তে চন্দ্রার ক্ষুদ্র চিবুকখানি ধরিয়া অন্য হস্তে আপনার উত্তরীয়ের অঞ্চলে সেই অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—"ছিঃ, কাঁদিও না।"

চন্দ্রা কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"সত্যই কি তুমি আসিবে না?"

সে স্বর শঙ্করের হৃদয়ে বিঁধিল। বলিলেন,—"তুমি যদি আসিতে বল, তবে আসিব।"

চন্দ্রা বলিল,—"যদি না বলি?"

শঙ্কর বলিলেন,—"তাহা হইলে আর আসিব না।"

চন্দ্রা একপদ পিছাইয়া দাঁড়াইল। অকম্পিতস্বরে বলিল,—"তবে তুমি আর আসিও না।"

শঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে চাহিলেন; চন্দ্রাও মুখ ফিরাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে শঙ্খেশ্বরীর স্বচ্ছ তরঙ্গের উপর অরুণ সূর্য্যকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল। মাথার উপর অসীম নীলিমাসাগরে সাঁতার দিতে দিতে একটা পাখী করুণকণ্ঠে বুকভাঙ্গা চীৎকারে কাহাকে ডাকিতেছিল। ঠিক তাহারই নীচে একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা আর একটি অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ যুবক ভালবাসার কঠোরস্মৃতি হৃদয়ে চাপিয়া দুইটি বিভিন্ন পথের কল্পনা করিতেছিল। হাস্যমুখরা প্রকৃতি এই দুইটি ব্যথিত হৃদয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নীরবে নির্ম্মম হাসি হাসিতেছিল। আর সমস্তই নীরব, শান্ত, স্থির।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবেই কাটিল। তার পর শঙ্কর চন্দ্রার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল,—"তবে তাই হোক্ চন্দ্রা! আর আমি আসিব না।"

চন্দ্রা সে দিকে ফিরিয়া চাহিল না। শঙ্কর উভয়-হস্তে বক্ষঃ চাপিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রা দৃষ্টি ফিরাইয়া সে দিকে চাহিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ চন্দ্রা অনিমিষলোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর শঙ্কর দৃষ্টিপথের অতীত হইলে সে ধীরে ধীরে নদীগর্ভে নামিল; অঞ্চল মুক্ত করিয়া সঞ্চিত ফুলগুলা জলের উপর ঢালিয়া দিল। মৃদুতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ফুলগুলি শঙ্খেশ্বরীর বুকে ভাসিয়া চলিল, চন্দ্রা তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় কর্কশকণ্ঠে কে ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

চন্দ্রা ত্রস্তভাবে ফিরিয়া চাহিল! দেখিল, অদূরে পিতার ক্রুদ্ধদৃষ্টি তাহার উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। সে তখন ধীরে ধীরে জল হইতে উপরে উঠিল, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে পিতার নিকট আসিল। পিতা ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন,—"আবার আসিয়াছিলি?"

চন্দ্রা নতমুখে বলিল,—"আর আসিব না।"

পিতা দৃঢ়মুষ্টিতে কন্যার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"হতভাগি! আবার তাহার সহিত কথা কহিতেছিলি? আমি না বারণ করিয়াছি?"

চন্দ্রা কোন উত্তর করিল না। তখন পিতা সবলে কন্যার হস্ত আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সম্মুখেই এক অট্টালিকা। তৎকালের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের অট্টালিকা যেরূপ হইত, ইহা তদনুরূপই ছিল। সুতরাং ইহার আর সবিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। এই অট্টালিকার অধিকারী কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী। কৃষ্ণকান্তের পিতা নবাব-সরকারে চাকরী করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র পুত্র এই বৈভবের অধিকারী। কৃষ্ণকান্ত লোকটি ভাল, সাধারণের দৃষ্টিতে নিরহঙ্কারী, বিনয়ী, পরোপকারী, উদারহৃদয়। কিন্তু লোকদৃষ্টির অন্তরালে,—তাঁহার সেই সর্ব্বজন-প্রশংসিত গুণাবলীর অভ্যন্তরে আর একটি গুপ্তভাব লুক্কায়িত ছিল। তাহা প্রথমে কেহ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু শেষে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃষ্ণকান্ত স্বভাবতই কিছু মিতব্যয়ী। এ জন্য তাঁহার বাটীতে লোকজনের সংখ্যা কিছু কম। পরিজনের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় দাসদাসী ব্যতীত তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী এবং কন্যা চন্দ্রা। চন্দ্রার বয়স যখন আট বৎসর, তখন সে মাতৃহীনা হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত এই প্রথমা স্ত্রীর অকালবিয়োগে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন যে, এক বৎসর পর্য্যন্ত অনেকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন না। শেষে যখন তাঁহার শূন্য গৃহখানা অধিকারিণীর অভাবে খাঁ খাঁ করিয়া তাঁহার চিত্তে বিষম বৈরাগ্য উৎপাদন করিল, এবং ভবিষ্যতে পিতৃ-পুরুষগণের পিণ্ডলোপ আশঙ্কায় তাঁহার পুন্নামনরকভীত হৃদয়টা হায় হায় করিয়া উঠিল, তখন তিনি দেখিয়া শুনিয়া একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন পূর্ব্বক তাহাকে সেই শূন্যভবনে গৃহিণীর সম্মানিত পদে স্থাপন করিলেন। তা' তাঁহার সে কার্য্যটা যে নিতান্ত গর্হিত হইয়াছিল, তাহা নহে। কারণ, তখনও তাঁহার বয়স চল্লিশের সীমা অতিক্রম করে নাই।

কৃষ্ণকান্তের এই নবগৃহিণী-পদাভিষিক্তা পত্নীর নাম পার্ব্বতী। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া শুনিয়াই পার্ব্বতীকে অর্দ্ধাংশভাগিনী করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, পার্ব্বতী সুন্দরী। বাস্তবিকই পার্ব্বতী সুন্দরী। যে সৌন্দর্য্যে জগতে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হয়, যে সৌন্দর্য্যে সুন্দ-উপসুন্দ নিহত হয়, যে সৌন্দর্য্য-শিখায় রোমবিজয়ী শত শত সিজার, শত শত আণ্টনি ভস্মীভূত হয়, পার্ব্বতীর দেহে সেই সৌন্দর্য্যের শিখা। তবে অনলটা কোথায়, তা' ঠিক বলা যায় না; বুঝি বা নয়নে। তাহার দেহের বর্ণ বড় সুন্দর, বড় সমুজ্জ্বল; সেই দেহ-সরোবরে সতত সহস্র সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ উঠিতেছে, নামিতেছে। অঙ্গের গঠন বড় সুললিত, বড় সুকুমার; প্রতি পদক্ষেপে তাহার সেই সুগঠিত কমনীয় দেহখানা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, আন্দোলিত রূপের গাছ হইতে যেন লাবণ্যের কমনীয় ফুল ঝরিতে থাকে। তাহার দৃষ্টি আবেশময়, বিলোলকটাক্ষ-পূর্ণ; সে কটাক্ষে একেবারে সহস্র বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে। কণ্ঠস্বর মার্জ্জিত, মধুবর্ষী; সে স্বরে এককালে শত বীণার ঝঙ্কার উঠিয়া শ্রোতার হৃদয়কে মুগ্ধ ও বশীভূত করিয়া ফেলে। ফল কথা, পার্ব্বতী অসাধারণ রূপ-লাবণ্যময়ী। তাহার প্রতি অঙ্গে যেন সৌন্দর্য্যের তীব্র মাদকতা মিশ্রিত রহিয়াছে; প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেক ভাবভঙ্গীতে সেই মাদকতার একটা বৈদ্যুতিক শক্তি দর্শককে আকৃষ্ট ও অভিভূত করে। আর পার্ব্বতীর গুণ—সে গুণের বিস্তৃত পরিচয় দিতে আমরা অক্ষম। আমাদিগের অনেক দুর্ভাগ্য যে, তাহার পাপ-চরিত্র চিত্রিত করিয়া লেখনীর সহিত আপনাকে কলুষিত করিতে হইতেছে। কিন্তু আলোক অন্ধকার লইয়াই সংসার; তাই আমাদের পার্ব্বতী-চরিত্রের অবতারণা।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### পার্ব্বতীর রাগ।

কৃষ্ণকান্ত একটা বিষয়ে রণজিৎ রায়ের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার এই বিপুল বৈভবের মূল কারণ রণজিৎ রায়। তাঁহারই চেষ্টায় ও সহায়তায় কৃষ্ণকান্তের পিতা নবাব-সরকারে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অনুরোধের বলে ক্রমে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া এই সম্পত্তিরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকান্তও রায় খুড়ার সহিত ঘনিষ্ঠতা ও বাধ্যবাধকতা রাখিয়া আসিতেছিলেন। শেষে কৃষ্ণকান্তও এই ঘনিষ্ঠতাকে আরও একটু আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধিয়া দৃঢ় করিবার জন্য রায় খুড়ার নিকট একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সে প্রস্তাব—চন্দ্রার সহিত শঙ্করের শুভপরিণয়। রায় মহাশয় এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইবার কোনই হেতু দেখিতে পাইলেন না। তিনি সানন্দে এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। কিন্তু তখনও কথাটা বাহিরে অপ্রকাশ রহিল।

এ প্রস্তাবের অনেক পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রা ও শঙ্করের মধ্যে একটা প্রীতি বা ভালবাসার ভাব জন্মিয়াছিল। শঙ্কর ইচ্ছামত প্রায় সর্ব্বদাই কৃষ্ণকান্তের বাটীতে যাইতেন। তখন চন্দ্রার মাতা জীবিত ছিলেন। তিনি শঙ্করকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। শঙ্করও তাঁহার সেই ভালবাসার মধ্যে কোমল মাতৃস্নেহের সুমিষ্ট আস্বাদ পাইতেন এবং সেই আস্বাদের লোভে তথায় ছুটিয়া যাইতেন।

তার পর চন্দ্রার জননীর মৃত্যু, কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ, পার্ব্বতীর শুভাগমন। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও শঙ্করের যাতায়াত বন্ধ হয় নাই। বরং মাতৃহীনা চন্দ্রার জন্য তাঁহার যাতায়াতের মাত্রাটা আরও একটু বাড়িয়াছিল। চন্দ্রাকে দেখিবার বা আদর-যত্ন করিবার কেহ নাই, তাহার কষ্টে আহা করিবার লোক নাই। কাজেই শঙ্কর, চন্দ্রার ভারটা আপনার স্কন্ধেই লইয়াছিলেন। আর চন্দ্রা? সে যে তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না, তাঁহাকে না পাইলে হাসিত না, দিনান্তে একবারও দেখা না পাইলে সে কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইত। সেই দ্বিতীয় অবলম্বনশূন্যা জ্ঞানহীনা বালিকাও অজ্ঞানাবস্থাতেই আপনার সমস্ত ভারটা শঙ্করের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর ত্রয়োদশবর্ষীয়া পার্ব্বতী আসিয়া যখন এই শূন্যভবনে প্রবেশ করিল, তখন প্রথমে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। কথা কহিবার একটা লোক নাই, দেখিবার শুনিবার কেহ নাই। চন্দ্রা বালিকা, কৃষ্ণকান্ত বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। পার্ব্বতীর বড় কষ্ট হইল, স্বামিগৃহটা তাহার পক্ষে নির্জ্জন কারাগৃহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তার পর সমবয়স্ক শঙ্করকে পাইয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ আসিল। কথা কহিবার, হাসিবার, গল্প করিবার একটা লোক পাইয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার দিন কাটাইবার একটা উপায় হইল। সেই নির্জ্জন স্তব্ধ পুরীমধ্যে পার্ব্বতী যদি শঙ্করকে না পাইত, তবে বুঝি তাহার একটা দিনও কাটিত না।

শঙ্করকে পাইয়া পার্ব্বতী প্রথমে বড়ই আনন্দিত হইল। একত্র ক্রীড়া, গল্প, হাস্য-পরিহাসে নীরস দিনগুলা সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। তার পর শঙ্কর ধীরে ধীরে সপ্তদশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কিশোর-সুলভ লাবণ্যের উপর একটু একটু করিয়া তরুণ যৌবনের ছায়াপাত হইতে লাগিল। এ দিকে পার্ব্বতীও তখন যৌবনের প্রথম সোপান অতিক্রম করিয়া ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিল। তাহার হৃদয়ে উন্মদ, উদ্দাম যৌবনের একটা বান ডাকিয়া গেল। যে বান নদীর উভয় কূল ভগ্ন করিয়া গ্রামনগর প্লাবিত করিতে করিতে প্রধাবিত হয়, পার্ব্বতীর হৃদয়-নদীতে সেইরূপই একটা জোর বান ডাকিল। সেই প্রবল বন্যার প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া পার্ব্বতী আর স্থির থাকিতে পারিল না।

এই সময় হইতেই পার্ব্বতীর হৃদয়ে যৌবন-সুলভ ভালবাসা বা প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। সে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার জন্য তাহার উদাস প্রাণটা একবার চারিদিকে ছুটিল। কিন্তু কোনদিকেই কাম্যবস্তু না পাইয়া হতাশভাবে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাহাতে আকাঙ্ক্ষার আগুন আরও ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রূপলাবণ্যময়ী পার্ব্বতী স্বামীর নিকট কোনদিনই প্রণয় বা ভালবাসার এতটুকুও কোমল আহ্বান শুনিতে পাইল না। তিনি আপনার বিষয়সম্পত্তি লইয়াই ব্যস্ত, প্রেমের ধার ধারিতেন না। কৃষ্ণকান্ত কেবল উপভোগের জন্যই রূপবতী পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইলেন। পার্ব্বতীর সেই অনন্যসাধারণ রূপের নিকট তিনি আপনাকে বিক্রীত করিলেন, সেই কমনীয় সৌন্দর্য্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল উপভোগ-প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি-সাধন করিতে লাগিলেন। একবারও পার্ব্বতীর হৃদয়ের দিকে চাহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি বা অবসর হইল না। তবে এ হেন উপভোগপরায়ণ স্বামীর স্ত্রী

উপভোগের জন্য লালায়িত না হইবে কেন? পার্ব্বতীও আপনার উপভোগ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য চারিদিকে লালসাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তার পর সে ধীরে ধীরে পাপের পিচ্ছিল পথে গড়াইয়া পড়িল। পার্ব্বতী মরিবার জন্যই জন্মিয়াছিল, তাই সে মরিল। কিন্তু একটু দুঃখ, সে রোগে একটু ঔষধ পাইয়া মরিল না কেন?

পার্ব্বতী যখন হৃদয়ের আগুন জ্বালাইয়া ইন্ধন খুঁজিতেছিল, তখন অন্য ইন্ধন না পাইয়া সম্মুখস্থ শঙ্করকেই জড়াইয়া ধরিল, সরলপ্রাণ শঙ্করকেই দগ্ধ করিবার জন্য তাহার হৃদয়-বহ্নি জ্বালাময় সহস্র শিখা বিস্তার করিল। কিন্তু শঙ্কর তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার সরল হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের বা পাপের ছায়ামাত্র পড়িল না।

লালসাময়ী পার্ব্বতী বহুদিন আপন হৃদয়ের আগুন চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে একদিন শঙ্করের পাদমূলে বসিয়া প্রেমভিখারিণীরূপে আপনার হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিল, প্রেম-গদগদ-স্বরে আপনার প্রাণের আবেগ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট প্রেম-ভিক্ষা করিল। সে কথা শঙ্করের কর্ণে শতবজ্রের ন্যায় বাজিল; তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে, ঘৃণায় কাঁপিয়া উঠিলেন। তার পর পরুষ-কণ্ঠে পার্ব্বতীর সেই ভয়ঙ্কর প্রার্থনার প্রত্যাখ্যান করিলেন। পার্ব্বতী তখন শঙ্করের পাদমূলে লুটাইয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল। শঙ্কর ক্রোধে পা টানিয়া লইয়া সেই বিষধরীর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিলেন। পার্ব্বতীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখে, ক্রোধে, অনুতাপে, লজ্জায় তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। ছিঃ ছিঃ, একটা ক্ষুদ্র বালক তাহার এই লোকদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যে পদাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল? শঙ্করের উপর তাহার বড় রাগ হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### মেঘোদয়।

অধিক দিন পার্ব্বতীর রাগ থাকিল না, সে সহজে শঙ্করের আশা ছাড়িতে পারিল না। আবার একবার শেষ চেষ্টা দেখিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু শঙ্কর আর এখন তথায় আসে না। তখন পার্ব্বতী লোক দ্বারা তাঁহাকে বারংবার সাদরে আহ্বান করিল। এমন কি, কৃষ্ণকান্তও একদিন এ জন্য শঙ্করের নিকট অনুযোগ করিলেন। চন্দ্রা যে তাঁহাকে না দেখিয়া কেবল কাঁদিতেছে, ইহাও বলিলেন। শুনিয়া শঙ্করের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু পার্ব্বতীর সম্মুখে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। তবে কৃষ্ণকান্তের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একবার যাইতেন; বাহিরে বাহিরে চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাহিরে বাহিরেই চলিয়া আসিতেন, পার্ব্বতীকে দেখা দিতেন না।

দেখিয়া শুনিয়া পার্ব্বতী হতাশ হইয়া পড়িল। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, হতভাগিনী চন্দ্রাই তাহার সুখের পথে প্রধান কণ্টক। চন্দ্রার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই শঙ্কর তাহাকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছে। তখন পার্ব্বতীর সমস্ত ক্রোধটা চন্দ্রার উপর পড়িল। সে ঠিক করিল, চন্দ্রাকে যন্ত্রণা দিয়া শঙ্করের হৃদয়ে শেল ফুটাইবে। অনেকের স্বভাব, শত্রুর কোন অনিষ্ট করিতে না পারিলে অন্ততঃ তাহার পোষা বিড়াল-কুকুরটাকেও দুই চারি ঘা মারিয়া শোধ লইয়া থাকে। পার্ব্বতীও তাহার প্রবল শত্রু শঙ্করকে হাতে না পাইয়া চন্দ্রাকে মারিয়াই গায়ের রাগ মিটাইতে লাগিল। হতভাগিনী চন্দ্রার ক্লেশের সীমা রহিল না।

চন্দ্রা—মাতৃহীনা চন্দ্রা নীরবে বিমাতার কঠোর অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। সে আপনার কষ্টের কথা কাহাকেও বলিত না। আর বলিবেই বা কাহাকে? সংসারের একমাত্র আশ্রয় পিতা—তিনি তো বিমাতার রূপমুগ্ধ, ক্রীতদাস। কেবল বলিবার একজন আছে—শঙ্কর। কিন্তু তিনি এখন আর সর্ব্বদা আসেন না, কখন আসিলেও তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা বলিয়া ব্যথিত করিতে চন্দ্রার ইচ্ছা হয় না। আর তাঁহাকে বলিলেই বা কি হইবে? অগত্যা মাতৃহীনা বালিকা নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহিতে লাগিল। কেবল যখন বড় কষ্ট হইত, তখন একবার শঙ্খেশ্বরীর তীরে সেই সেফালিকাতলায় গিয়া বসিত। একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু বিমাতার ভয়ে পারিত না। কেবল তাহার নীরব হৃদয় ফাটিয়া অজস্র অশ্রুধারা বক্ষঃ প্লাবিত করিত। তার পর শঙ্কর আসিয়া যখন তাহার সেই অশ্রুধারা সযত্নে মুছাইয়া দিতেন, তখন চন্দ্রা সকল অত্যাচার, সকল ক্লেশ ভুলিয়া যাইত। শঙ্করের স্নেহপূর্ণ বুকে মাথা রাখিয়া বালিকা সান্ত্বনার যে মধুর স্বর শুনিত, তাহারই লোভে সে শঙ্খেশ্বরীর কোমল আহ্বান উপেক্ষা করিত। কিন্তু তাহার এই সুখটুকু—এই শেষ সান্ত্বনাটুকুও স্থায়ী হইল না।

পার্ব্বতী কেবল সহিষ্ণু চন্দ্রার উপর অত্যাচার

করিয়াই তৃপ্তি পাইল না। সে শঙ্করের এই দুর্ব্যবহারের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিল। প্রেমভিখারিণী পার্ব্বতী উপেক্ষিতা হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সে যখন কিছুতেই শঙ্করকে আপনার বশে আনিতে পারিল না, তখন তাহার পদাহত হৃদয়ে প্রতিহিংসার করাল বহ্নিশিখা ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে শঙ্করকে দগ্ধ করিতে না পারিলে তাহার আর শান্তি নাই। সে কিরূপে শঙ্করের সর্ব্বনাশ করিবে, কি উপায়ে এই নির্ব্বোধ গর্ব্বিত বালককে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে, এখন কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তাহা তাহার সাধ্যাতীত। সম্পদে, বিক্রমে, গৌরবে, সর্ব্ববিষয়েই শঙ্কর তাহার হাতের বাহিরে। সে শঙ্করের অপেক্ষা আপনাকে অনেক নিম্নে দেখিল। রোষে, দুঃখে, অপমানে তাহার হৃদয় দ্বলিতে লাগিল। তখন পার্ব্বতী আর এক সর্ব্বনাশকর উপায়ের উদ্ভাবনে প্রবৃত্তা হইল।

চতুর পার্ব্বতীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্বামীর হৃদয়মধ্যে একটু রন্ধ্র দেখিতে পাইল। সে সেই রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিয়া আপনার প্রণয়যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানের সঙ্কল্প করিল। কৃষ্ণকান্ত ধনে মানে গৌরবান্বিত হইলেও তাঁহার হৃদয়ের এক নিভৃত প্রদেশে একটি ঈর্ষ্যাজড়িত আকাঙ্ক্ষার বীজ অতি গোপনে একপাশে পড়িয়া ছিল। তাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু তাহা রণজিৎ রায়ের সমতুল্য নহে; সম্মান আছে, কিন্তু তাহা রণজিতের সম্মানের নিকট অতি তুচ্ছ; খ্যাতি আছে, কিন্তু তাহা এই প্রতাপশালী জমীদার হইতে অতি নগণ্য। রণজিৎ রায় দেশের রাজা, তিনি একজন প্রজামাত্র। তবে আর কৃষ্ণকান্তের ঐশ্বর্য্য, সম্মান, খ্যাতির গৌরব রহিল কোথায়? প্রখর সূর্য্যকিরণের মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণজ্যোতি কে গণনা করে? হায়, এ গৌরবসূর্য্য কি কোন দিনই উঠিবে না? কৃষ্ণকান্ত ভাবিতেন, উঠিবে না, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অসম্ভব বোধেই কৃষ্ণকান্ত মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। কিন্তু বীজটুকু নষ্ট হয় নাই, কেবল জলসেচনের অভাবে এত দিন তাহা বাড়িতে পারে নাই। এখন পার্ব্বতী সেই ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় বীজটুকুর মূলে নিত্য নিয়মিতরূপে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিল। অভিমান ও অনুযোগের সুরে সর্ব্বদাই স্বামীর কর্ণে বিষমন্ত্র ঢালিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে কথাটায় তত আস্থাস্থাপন করেন নাই। কিন্তু নিয়ত শুনিতে শুনিতে কথাটা তাঁহার হৃদয়ের সেই ছিদ্রে গিয়া বাজিতে লাগিল। তখন আর তিনি রূপলাবণ্যময়ী পার্ব্বতীর সোহাগের অনুরোধটাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলেন না। পার্ব্বতীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কৃষ্ণকান্তের হৃদয়নিহিত বীজটি তখন অঙ্কুরিত হইয়াছে।

ঠিক এই সময় ফৌজদারের সহিত রণজিৎ রায়ের বিরোধ বাধিল। পার্ব্বতী স্বামীকে বুঝাইল, এই উপযুক্ত অবসর। কৃষ্ণকান্তও তাহা বুঝিলেন। তিনি সর্ব্বগ্রাসী লোভের তাড়নায় এই বিস্তৃত জমীদারীটিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। রণজিৎ রায়ের পদে আপনাকে বসাইয়া পার্ব্বতীকে কৃতার্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। পার্ব্বতীর মন্ত্রণায় তিনি ফৌজদারের সহিত আনুগত্য করিয়া রণজিৎ রায়ের সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কয়েকবার গোপনে গিয়া ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। বাঙ্গালার ভাগ্যগগনে ধীরে ধীরে একখণ্ড কালমেঘ সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

তখন পার্ব্বতী তাঁহাকে বুঝাইল যে, এখন রণজিতের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা ফৌজদারের কৃপালাভ অসম্ভব। কৃষ্ণকান্তও তাহা বুঝিলেন। তিনি অল্পে অল্পে বাপ খুড়ার সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই শঙ্করের সহিত চন্দ্রার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইল। এতদিন পরে শঙ্কর হৃদয়ে একটা আঘাত পাইলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### কর্ম্ম কাহার?

সন্ধ্যার অনতিকাল পরে রণজিৎ রায়ের প্রাসাদ-সমীপস্থ বিশাই দীঘির ঘাটের চাতালের উপর বসিয়া রূপনাথ একটা সেতারের কান মোচড়াইতেছিলেন। পার্শ্বে শঙ্কর নীরবে বসিয়াছিলেন। ঘাটের উপর বিশালাক্ষী দেবীর সু-উচ্চ মন্দির। নির্ম্মল, মেঘশূন্য আকাশে দশমীর চন্দ্র হাসিতেছিল। তাহার রজতকিরণরেখা তুষারধবল দেবমন্দিরের উপর পড়িয়াছিল। সম্মুখে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার জল গভীর, শান্ত, সুনির্ম্মল, স্বচ্ছস্ফটিকবৎ। নৈশমন্দানিলে তাহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছিল; শুভ্র কৌমুদীরশ্মি তাহার উপর হীরকচূর্ণ বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা সোপান-প্রান্তে প্রহত হইয়া এক অস্ফুট আরাব তুলিতেছিল। সেই অস্ফুটারাব-শব্দিত জ্যোৎস্না-প্লাবিত চাতালের উপর বসিয়া রূপনাথ সেতার বাঁধিতেছিলেন।

সেতার বাঁধা শেষ হইলে রূপনাথ তাহাতে অঙ্গুলি চালনা করিলেন। অধীর অঙ্গুলিতাড়নে সেতার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সেই মধুর ঝঙ্কারের সহিত আপনার মধুরকণ্ঠ মিশাইয়া রূপনাথ গান ধরিলেন। প্রথমে —অতি ধীরে, তার পর কণ্ঠ ক্রমে উচ্চে উঠিল। মধ্যম পঞ্চম ছাড়াইয়া সুর নিখাদে চলিল। তখন রূপনাথ গলা ছাড়িয়া গাহিলেন, —

বাজীকরের মেয়ের মত কত খেলা খেল্‌স তারা।
খেলার ঘোরে বারে বারে হয়ে যাই যে পথহারা॥
পেতে দেছ খেলা-ঘর, বুঝিয়ে দেছ আপন-পর,
আমার বাড়ী আমার ঘর, আমার সুত আমার দারা॥
আমি কাঁদি আমি হাসি, আমি দুঃখনীরে ভাসি,
বুঝতে দিস্ না সর্ব্বনাশি, তুই সকল খেলার মূলাধারা।
তোরি খেলায় তোরে ভুলি, আমি বলি আমি খেলি,
নে মা এবার কোলে তুলি, ধূলাখেলায় হলাম সারা॥

গাহিতে গাহিতে প্রেমাশ্রুপ্রবাহে রূপনাথের বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল; পার্শ্বে বসিয়া শঙ্কর আত্মহারা হইয়া ভক্তিপ্লাবিত কণ্ঠের এই মধুময় উচ্ছ্বাস শুনিতে লাগিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার গাহিয়া রূপনাথ গীত ছাড়িয়া দিলেন। তখনও গানের শেষ ঝঙ্কার দিগন্তে মূর্চ্ছিত হইতেছিল। তখনও চারিদিক্ হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল;—'ধূলাখেলায় হলাম সারা।'

যখন গানের শেষ প্রতিধ্বনি বায়ুস্তরে ভাসিয়া ভাসিয়া নীরব হইল, তখন শঙ্কর গদগদ-কণ্ঠে বলিলেন, —"সত্যই কি সব ধূলাখেলা?"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"ধূলাখেলা ছাড়া আর কি হইতে পারে? বালক ধূলার ঘর গড়িয়া, ধূলার সংসার পাতিয়া সারাদিন খেলা করে। সন্ধ্যাকালে খেলা ফেলিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন আর সেই ধূলার ঘরের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। আমরাও মায়ার সংসারে অভিমানের খেলা-ঘর পাতিয়া ধূলাখেলা করিতেছি। কিন্তু যখন কালসন্ধ্যা আসিবে, তখন এ সকলই পড়িয়া থাকিবে। আমরা যেখানকার লোক, সেইখানেই চলিয়া যাইব।"

শঙ্কর একটু ভাবিলেন; ভাবিয়া বলিলেন,—"তবে কি আমার কিছুই নাই?"

রূপ। কিছুই নাই শঙ্কর! কিছুই নাই।

শ। এই যে সংসার—এই যে এত সুখ-দুঃখ—এই যে এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত প্রণয়, এ সকল কিছুই কি আমার নহে?

রূ। কিছুই নহে। সকলই ধূলাখেলা—সকলই ভোজের বাজী।

শ। তবে কেন এ সকলই আমার বলিয়া মনে হয়?

রূ। ইহাই সেই বাজীকরের মেয়ের খেলা—ইহাই ভ্রান্তি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

আমরা যে অহঙ্কার-বিমুগ্ধ জীব, শঙ্কর!

শ। কিন্তু এই অহঙ্কারকে কি ত্যাগ করা যায় না? এ সমস্ত কি ভুলা যায় না?

ঠিক এই কথাটাই কয়দিন হইতে তাঁহার মনে জাগিতেছিল। যে দিন হইতে চন্দ্রা তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আর আসিও না,' সেই দিন হইতেই শঙ্কর ভাবিতেছিলেন, ভুলা কি যায় না? তাই আজি তিনি সুযোগ বুঝিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ভুলা কি যায় না?"

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া রূপনাথ ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন,—"ভুলা যায়।"

শ। কিরূপে?

রূ। যাঁর কর্ম্ম, তাঁর হস্তেই কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও।

শ। তাহা হইলে কর্ম্ম করিবারই বা আবশ্যক কি?

রূ। আবশ্যক সম্পূর্ণ। তুমি সংসারী জীব, প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমাকে কর্ম্মের সুদৃঢ় গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, প্রতি নিশ্বাসে তুমি কর্ম্মের আবশ্যকতা অনুভব করিবে; কিন্তু যদি সেই সুদৃঢ় গণ্ডী ভেদ করিতে চাও, তবে ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতে থাক, লাভালাভের সহিত আপনাকে জড়িত করিও না।

শ। তাহা আরও কঠিন। আমি কোন কর্ম্মই করিব না।

রূ। উত্তম, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে দূর করিতে পারিবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

কর্ম্ম না করিলেও এই বাসনা কোথায় যাইবে? তখন বাহিরে কর্ম্মহীন, কিন্তু ভিতরে কর্ম্মের অদম্য বাসনা। সে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! ভগবান্ বলিয়াছেন, —

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

তাই বলিতেছি শঙ্কর, কর্ম্ম কর, কিন্তু বাসনা পরিহার কর। একেবারে হইবে না, অভ্যাস কর।

শ। অভ্যাসে ভুলা যায় কি?

রূ। ক্রমে যায়।

শ। কিন্তু ঠাকুর, ভুলিতে যে ইচ্ছা হয় না; প্রাণ যে কাঁদিয়া উঠে?

রূ। ইহাই সেই বাজীকরের মেয়ের খেলা।

শ। তবে কি হইবে, ঠাকুর?

রূ। চেষ্টা কর। চেষ্টায় অসাধ্যও সুসাধ্য হয়।

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। শঙ্কর নীরবে দীর্ঘিকার মৃদু তরঙ্গমালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন,—"ভুলিতে কি পারিব না?" তরঙ্গবালা সোপানপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া যেন উত্তর দিল, "না না।" আকাশ-পানে চাহিলেন। উদার অনন্ত আকাশ, অনন্তের বক্ষে অনন্ত নক্ষত্রমালা। শঙ্কর সেই নক্ষত্রমালার দিকে চাহিয়া ভাবিলেন,—"ভুলা কি যায় না?" সেই অনন্ত গগনপ্রান্ত হইতে অনন্ত নক্ষত্রকণ্ঠে যেন সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হইল,—"না না।" দূরে জ্যোৎস্নাপুলকিত বিশাল প্রান্তর। সেই বিস্তৃত মুক্তপ্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন,—"তবে কি ভুলিব না?" সেই বিশাল প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা ক্ষুদ্র পক্ষী যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণচীৎকারে বলিল,—"না গো না, না গো না।" তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে যেন সহস্র কণ্ঠের প্রতিধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণে বাজিতে লাগিল, "না না না।" শঙ্কর স্তম্ভিতভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রূপনাথ বলিলেন,—"শুনিতেছি, ফৌজদার সাহেব আবার সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। দুইবারের পরাজয়েও তাহার শিক্ষা হয় নাই। এবার আয়োজনটা কিছু বেশী রকম।"

শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সে জন্য আমরাও প্রস্তুত আছি। কিন্তু—"

রূ। কিন্তু কি শঙ্কর?

শ। কিন্তু আর কেন ঠাকুর?

দুই বিন্দু অশ্রু শঙ্করের গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল। রূপনাথ গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—"ছিঃ শঙ্কর, আমি কি অপাত্রে শিক্ষার বীজ বপন করিলাম?"

তখন শঙ্কর রূপনাথের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ঠাকুর, আমাকে রক্ষা করুন।"

রূপনাথ শঙ্করের হাত ধরিয়া তুলিলেন। স্নেহ-কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—ভয় কি শঙ্কর, মাকে ডাক। মা আমার বড় দয়াময়ী।"

শঙ্কর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা। মা!"

রূপনাথ আবার সেতারটা তুলিয়া লইয়া ভক্তি-কণ্ঠে গাহিলেন,—

একবার ডাক্ দেখি মন মা মা ব'লে,
দেখি কেমনে মা থাকে ভুলে।
যখন ছেলের ডাকে বাজ্‌বে বুকে
পাষাণীর প্রাণ যাবে গ'লে।
ভক্তির সুরে প্রাণটি বেঁধে, ডাক্ দেখি মন, কেঁদে কেঁদে,
খ্যাপা মেয়ে সেধে, সেধে, অভয় কোলে লবে তুলে।

গানের শেষ তরঙ্গ নৈশসমীরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া যখন স্থির হইল, তখন এক দীর্ঘকায় মুসলমান আসিয়া তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### দেশত্যাগ।

একবার পরাজিত হইয়াই যে রস্তম আলি নিরস্ত হইলেন, তাহা নহে। বরং এই পরাজয়ে প্রতিশোধ-কামনার সহিত জেদের মাত্রাটা আরও বাড়িয়া উঠিল। কিছুদিন পরে তিনি আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রণজিৎ রায়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু আবার পূর্ব্ববৎ বাধা পাইয়া স্বস্থানে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি বুঝিলেন, ব্যাপারটা বড় সামান্য নহে। কিন্তু অসামান্য হইলেও ইহার একটা প্রতিবিধান করিতেই হইবে। নতুবা জগদ্বিখ্যাত মোগল নামে কলঙ্কস্পর্শ করিবে। ভারত-বিজয়ী মোগলের রাজত্বে এত বড় একটা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, শক্তিশালী মুসলমানরক্ত দেহে ধারণ করিয়া একটা হীনবীর্য্য কাফেরের নিকট আপনার উন্নত মস্তক নত করা অপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? রস্তম আলি তেমন লজ্জিত ধিক্কৃত জীবনভার অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। এখন কমলার সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে তথায় এখন প্রতিহিংসার জ্বালাময়ী পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি কিরূপে রণজিৎ রায়-কৃত এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়া আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অনেক ভাবিয়াও রস্তম আলি কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মনে করিলেন, সুবাদারের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন, বাঙ্গালার একটা সামান্য কাফের জমীদারের হস্তে তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন,

এ সংবাদ শুনিয়া সুবাদার সাহেব কি মনে করিবেন? তিনি কি তাঁহাকে কার্য্যের অযোগ্য মুসলমান-কুল-কলঙ্ক স্থির করিয়া রুষ্ট হইবেন না? তাঁহার পার্ষদ-গণ কি কঠোর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিবেন না? বিশেষতঃ যদি কোনরূপে এ বিবাদের মূলকারণটা বাহির হইয়া পড়ে? রুস্তম আলি কোন মতেই সুবাদারকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সাহস করিলেন না। তিনি স্বকীয় ক্ষমতা দ্বারাই ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। হঠাৎ একটা উপায় তাঁহার মাথায় আসিল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার এই কাফের সিপাহীগুলা একবারেই অকর্ম্মণ্য; তাহাদের বুকে সাহস নাই, কব্জীতে জোর নাই, হৃদয়ে দৃঢ়তা নাই। তাহাদের সঙ্গে পড়িয়া তাঁহার মুসলমান সিপাহীগুলাও ক্রমে অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অতঃপর এই কাফেরগুলার পরিবর্ত্তে মুসলমান সিপাহী নিযুক্ত করাই উচিত। সমবেত মোগলশক্তির নিকট তুচ্ছ বাঙ্গালীর শক্তি নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে।

যেমন সংকল্প, তেমনই কার্য্য। অচিরেই হিন্দু-সিপাহীগণ সৈনিক-পদ হইতে বিতাড়িত হইল এবং নানাস্থান হইতে মুসলমান সিপাহী আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে একটা বড় গোল বাধিল। সিপাহীগণ বেতনের পরিবর্ত্তে জমী ভোগ করিত। এই জমীর আয়ই তাহাদের জীবিকা ছিল। এক্ষণে কার্য্যচ্যুত হইয়া তাহাদিগকে সেই সকল জমী ছাড়িতে হইল। কিন্তু এই বহুকাল-ভোগ্য সম্পত্তির মায়া সহসা স্নেহ ত্যাগ করিতে পারিল না। অনেকের বাসভবনও এই জমীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহারা সহজে বাসচ্যুত হইতে সম্মত হইল না। তাহারা সকলে ফৌজদার সাহেবের নিকট কাঁদিয়া পড়িল। কিন্তু ফৌজদার সাহেব তাহাদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলপূর্ব্বক সেই সকল ভূমি কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। যাহারা সহজে ছাড়িল না, তাহারা অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হইল। ইহাতে সকলের মধ্যে একটা অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়িল। তাহার ফলে বাসচ্যুত হিন্দুসিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু ফৌজদারের প্রভূত শক্তির নিকট সকলেই পরাজিত হইল। একেই রুস্তম আলির মাথা ঠিক ছিল না, তাহার উপর এই ঘটনায় তাঁহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তাঁহার সেই ক্রোধাগ্নিতে দেশটা ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল। তিনি দোষী নির্দ্দোষ বিচার না করিয়াই হিন্দু অধিবাসিগণের উপর ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। সেই অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী এ স্থলে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ সে অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দুগণ হাহাকার করিতে করিতে দেশ ছাড়িয়া পলাইল। দেখিতে দেখিতে গ্রামখানা শ্মশানের আকার ধারণ করিল। রুস্তম আলি চতুর্দ্দিক্ হইতে মুসলমান প্রজা আনাইয়া গ্রামে স্থাপন করিতে লাগিলেন।

একে একে যখন সকলেই চলিয়া গেল, তখন বাধ্য হইয়া কমলার মাতাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাই যাই করিয়াও তাঁহার দুই দিন কাটিয়া গেল। আবাল্য-পরিচিত শ্বশুরের ভিটা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কিছুতেই তাঁহার মন সরিতেছিল না, কিন্তু একে একে যখন সকল হিন্দুই দেশত্যাগ করিল, তখন তিনি একা আর সেখানে কিরূপে থাকেন? অগত্যা তাঁহাকে বাস্তুভিটার মায়া কাটাইতে হইল। সমস্ত জীবনের সুখদুঃখ-বিজড়িত গৃহ, আসবাব, জিনিসপত্র সকলই পড়িয়া রহিল। কেবল তিনি একা এক দিন মধ্যাহ্নকালে বসুমাতাকে প্রণাম করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বহুকালের স্মৃতি-জড়িত বাড়ীখানা পড়িয়া রহিল।

বৃদ্ধা প্রথমে একজন লোক সঙ্গে লইবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তখন গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমান ব্যতীত আর কেহ ছিল না। যে দুই এক ঘর হিন্দু ছিল, তাহারাও তখন পলায়নের জন্য ব্যস্ত। সে অবস্থায় কে তাঁহার সঙ্গে যাইবে? অগত্যা একাই তিনি দেবীগড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জামাই-বাটীতে বাস লজ্জাকর মনে হইলেও এক্ষণে তাঁহার আর দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল না। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দেবীগড়াতেই যাইতে হইল। ভাবিলেন, কয়েকদিন জামাইবাটীতে থাকিয়া তার পর কাশীবাসের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার সঞ্চিত কিছু টাকা ছিল, তাহা পেটের কাপড়ে উত্তমরূপে বাঁধিয়া লইলেন।

বৃদ্ধা একাদশবর্ষ-বয়সে শ্বশুরবাটীতে প্রবেশ করা অবধি কখনও গ্রামের বাহিরে পা দেন নাই। কাজেই দেবীগড়ার পথ তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া কত দেশ যায়, আমি এই মাঠটুকু পার হইয়া দেবীগড়া যাইতে পারিব না? তাঁহার বিশ্বাস, এই বড় মাঠটার পরপারেই দেবীগড়া গ্রাম।

মধ্যাহ্নকালে বাটীর বাহির হইয়া বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সশঙ্ক পাদক্ষেপে গ্রামটুকু পার হইলেন। গ্রামের

পরই বিস্তৃত মাঠ। মাঠের বিস্তৃত বক্ষ ভেদ করিয়া চারিদিকে পথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার কোন্ পথটা দেবীগড়ায় গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা তো বৃদ্ধা জানেন না। তিনি সেইখানে একটু দাঁড়াইলেন। তার পর মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া একটা পথ অবলম্বন করিলেন।

পথে জনপ্রাণী নাই। বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সেই নির্জ্জন পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পথপার্শ্বে একটা বড় বটগাছের তলায় কয়েকজন মুসলমানকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তৎকালে পথে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। বৃদ্ধা তাহাদিগকে দেখিয়াই প্রথমে দস্যু বলিয়া মনে করিলেন। অমনই তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, গ্রামের এত নিকটে ফৌজদারের এত হাঙ্গামায় দিনের বেলা কি এখানে দস্যু থাকিতে পারে? বিশেষতঃ ইহাদের কাছে তেমন বড় বড় লাঠীও নাই। তখন বৃদ্ধা সাহসে নির্ভর করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইলেন। তার পর সেই সমবেত ব্যক্তিগণের সম্মুখস্থ হইয়াও যখন দেখিলেন, কেহই তাঁহাকে কিছু বলিল না বা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, যখন তাঁহার ভয়টা অনেক দূর হইল। তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তাহাদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হা বাবা, এই কি দেবীগড়ার রাস্তা?"

একজন মুসলমান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কোথায় যাবি বুড়ি?"

বৃদ্ধা সবিনয়ে বলিলেন,—"দেবীগড়া যাব। এই-টাই কি দেবীগড়ার রাস্তা বাবা?"

মুসলমান বলিল,—"কোন্ দেবীগড়া?"

সর্ব্বনাশ! কোন্ দেবীগড়া, তাহা তো তিনি জানেন না। আরও যে দুই একটা দেবীগড়া আছে, তাহা কখন শুনেন নাই। অগত্যা একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"যে দেবীগড়ায় আমার জামাই-বাড়ী।"

সকলে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। প্রথম বক্তা বলিল,—"কে তোর জামাই?"

দলের মধ্য হইতে আর একজন বলিল,—"তোর জামাইয়ের নাম কি?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"রূপনাথ চক্রবর্ত্তী।"

প্র-ব। তোর মেয়ের নাম কি?

বৃ। মেয়ের নামের সঙ্গে রাস্তার কি বাবা?"

প্র-ব। তা না শুন্‌লে ঠিক বল্‌বো কেমন ক'রে? রূপনাথ চক্রবর্ত্তী কি আর কেউ নাই?

বৃদ্ধা বুঝিলেন, কথাটা ঠিক। বলিলেন,—"আমার মেয়ের নাম কমলা।"

প্র-ব। কোন্ কমলা?

দ্বি-ব। ফৌজদার সাহেবের কম্‌লি বিবি?

বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"বাবা, বুড়ো মানুষকে কি রাস্তার মাঝে এমনই তামাসা কর্‌তে হয়। তা' তোমরা রাস্তা না ব'লে দাও, ভগবান্ ব'লে দেবেন।"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া প্রথম বক্তা বলিল,—"বুড়ি, সোজা রাস্তা কি অমনি পাওয়া যায়? ফৌজদার সাহেবের কাছে চল, সোজা পথ পাবি।"

বৃদ্ধা সভয়ে বলিলেন,—"কেন বাবা, ফৌজদারের কাছে কেন যাব বাবা? আমি কি করেছি?"

প্রথম বক্তা উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"তোরই জামাই না পাঁচটা সেপাই মেরেছিল?"

বৃদ্ধা সভয়দৃষ্টিতে নীরবে তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রুশোভিত ভীষণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বক্তা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"তোর মেয়ে তো পালিয়েছে, এখন চল্, তুই-ই ফৌজদারকে নিকে কর্‌বি।"

বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"দোহাই বাবা, বুড়ো মানুষকে মেরো না বাবা, তোমাদের বুড়োপীরের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা!"

কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বৃদ্ধাকে কাঁদিতে দেখিয়া বক্তা আরও দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে নিকটে আসিয়া বলিল,—"হারামজাদি, এখন তোর সে লেঠেল জামাই কোথা? সে কাফের আমার চাচাকে খুন করেছে। আজ তার শোধ নেব।"

বৃদ্ধাকে ধরিবার জন্য বক্তা হাত বাড়াইল; বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন; সহসা সেই দলের মধ্য হইতে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মুসলমান যুবক লাফাইয়া বক্তার সম্মুখে পড়িল এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"সেখের পো, এ কি কর? বুড়ীর উপর শোধ?"

প্রথম বক্তা হস্ত আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"শুধু বুড়ী কেন, সে কাফেরের আণ্ডাবাচ্চা যাহা পাব, তারই উপর শোধ নেব।"

যুবক বলিল,—"মরদ্ বাচ্ছার কথা বটে! কিন্তু এই বুড়ীর গায়ে হাত দিতে পাবে না।"

বক্তা সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কেন?"

যুবক বলিল,—"আমার বাপ-দাদা এই বুড়ীর

খেয়ে মানুষ, আমার সাম্‌নে তার গায়ে হাত দেয়, এমন মরদ নাই।"

বক্তা গর্জ্জন করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—"ভাল, দেখা যাবে।"

তখন যুবক তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। তার পর বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"ভয় নাই চাচি, চল্, আমি তোর জামাইবাড়ী চিনি।"

বৃদ্ধা একবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। পরে হর্ষ-গদগদ-কণ্ঠে বলিলেন,—"আবদুল, তুই এখানে?"

আবদুল বলিল—"হাঁ, এখন বেলা যায় চল্।"

আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে কৃতজ্ঞতার দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বাবা হরির নিকট, মা কালীর নিকট আবদুলের মঙ্গল-কামনা করিতে করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন আবদুল তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

প্রথমোক্ত মুসলমান ডাকিয়া বলিল,—"ফৌজদারের কাছে কিসে বাঁচিবে, তার ঠিক করেছ? সেখানে কি জবাবদিহি কর্‌বে?"

আবদুল একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"সেখানে না কর্‌তে পারি, আল্লার কাছে এর জবাবদিহি কর্‌বো।"

বৃদ্ধার সহিত আবদুল চলিয়া গেল। সকলে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিতে সাহস করিল না। যে ব্যক্তি বৃদ্ধাকে ধরিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সে ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"আচ্ছা, রহিম বক্স এর শোধ না নিয়ে ছাড়বে না।"

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### ইন্ধন-সংযোগ।

কমলার মাতাকে দেবীগড়ায় পৌঁছাইয়া দিয়া পরদিন প্রত্যূষে আবদুল যখন গৃহে ফিরিল, তখন সে সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার বাড়ীটা প্রকাণ্ড ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। স্তম্ভিত-হৃদয়ে আবদুল কিয়ৎকাল সেই ভস্মস্তূপের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর বৃদ্ধ পিতা, যুবতী পত্নী ও শিশুপুত্রের অন্বেষণ করিল। কিন্তু প্রতিবাসিগণের মুখে শুনিল যে, গতকল্য রাত্রিকালে ফৌজদার সাহেবের আদেশে তাহার পিতা, পত্নী এবং পুত্রকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া বাটীতে অগ্নি প্রদান করা হইয়াছে। তাহারা জীবন্তে দগ্ধ হইয়াছে। ফৌজদারের সিপাহীগণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ফৌজদারের ভয়ে কেহই বাধা দিতে বা বিপন্নগণকে উদ্ধার করিতে সাহসী হয় নাই।

আবদুল ফিরিয়া আসিয়া সেই ভস্মস্তূপের উপর একবার বসিল। তার পর ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভস্মরাশির মধ্যে কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। তখনও ভস্মরাশি হইতে স্থানে স্থানে অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপ নির্গত হইতেছে। কিন্তু আবদুল তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উন্মত্তবৎ তাহার মধ্যে কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। বহুক্ষণ অন্বেষণের পর এক স্থানে কয়েকখান দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি মিলিল। আবদুলের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। সে একখণ্ড উত্তপ্ত কঙ্কাল হস্তে লইয়া ফৌজদারের গৃহাভিমুখে ছুটিল।

রস্তম আলি তখন দরবারে বসিয়া আবদুলের গৃহদাহকারীকে উপযুক্ত পুরস্কারে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। এমন সময় আবদুল অর্দ্ধদগ্ধ কঙ্কাল-হস্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রস্তম আলি তাহার সেই উন্মাদমূর্ত্তি ও ঘূর্ণিত লোচনদ্বয় দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি ব্যস্ততাসহ তাহাকে ধরিবার জন্য উপস্থিত প্রহরিদ্বয়কে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশের শেষবাক্য উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই আবদুল হস্তস্থিত অস্থিখণ্ড দ্বারা সবলে তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। সে প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার শিরস্ত্রাণ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং মস্তকের চর্ম্ম কাটিয়া দরদর রক্তধারা বহিল। রস্তম আলি চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। প্রহরিদ্বয় আবদুলকে ধরিতে গেল, কিন্তু তাহারাও প্রহৃত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। তখন আবদুল হস্তস্থিত সেই অস্থিখণ্ড ফৌজদার সাহেবের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার সেই রৌদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

তখন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অনেক লোকজন ছুটিয়া আসিল। সকলেই ফৌজদার সাহেবকে তুলিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হাকিম আসিয়া মস্তকে ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ করিলেন। মস্তকাবরণে বাধা পাওয়ায় আঘাতটা তত গুরুতর হয় নাই। কিছুক্ষণ পরেই রস্তম আলি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন প্রহরিদ্বয়ের

উপরেই তাঁহার ক্রোধের প্রথম বেগটা পড়িল। তাহাদিগকে বিবিধ সুমধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া পরে আবদুলকে ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তাহাকে কুত্তা দিয়া খাওয়াইবার হুকুম হইল। সিপাহীগণ আবদুলকে ধরিবার জন্য চারিদিকে ছুটিল। কিন্তু তখন আবদুলকে ধরা সহজ ব্যাপার নহে।

রস্তম আলির সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিয়া আবদুল প্রথমে উন্মাদের ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইল। তার পর যখন শোকের প্রথম বেগটা একটু কমিয়া আসিল, মনটা একটু স্থির হইল, তখন সে দেবীগড়া অভিমুখে চলিল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর দেবীগড়ায় উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে প্রথমে রূপনাথকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে মুসলমান দেখিয়া কেহই তাহার কথা শুনিল না। আবদুল অনেক খুঁজিয়াও রূপনাথকে পাইল না। তখন ক্ষুধায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। সমস্ত দিনের মধ্যে সে জলবিন্দু স্পর্শ করে নাই। কিন্তু স্পর্শ করিবার ইচ্ছাও হয় নাই। কিন্তু এতক্ষণে সে তৃষ্ণার প্রবল তাড়নায় জলের অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে বিশাই দীঘির স্বচ্ছ সলিলরাশি তাঁহার পিপাসিত দৃষ্টির সম্মুখে পড়িল। সে সাগ্রহে দীর্ঘিকায় নামিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া শীতল জল পান করিল। পানান্তে আবদুল যখন তীরে উঠিল, তখন দীর্ঘিকার অপর পার হইতে একটা মধুর সুরতরঙ্গ আসিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তেমন সুর আবদুল আর কখনও শুনে নাই। সেই মোহন সুরে আকৃষ্ট হইয়া সে যেখান হইতে সুরটা উঠিতেছিল, দীঘির পাহাড় দিয়া সেই দিকে চলিল। সেখানে গিয়া আবদুল সেই সঙ্গীতকারীকে দেখিল, পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া মুগ্ধহৃদয়ে সেই মধুময় সঙ্গীত শুনিতে লাগিল। গীতবিমুগ্ধ রূপনাথ বা শঙ্কর কেহই সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই।

তার পর যখন সঙ্গীত থামিল, দিগন্ত হইতে সঙ্গীতের শেষ তরঙ্গ মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আবদুল ধীরে ধীরে রূপনাথের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। রূপনাথ ও শঙ্কর তাহাকে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন। পরে রূপনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? কি চাও?"

আবদুল বিনীতস্বরে বলিল, —"আমি একজন বিপন্ন মুসলমান, হুজুরের নিকট আশ্রয় চাই।"

রূপ। তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

আব। আমার নাম আবদুল খাঁ, রাজনগরে আমার বাড়ী ছিল।

রূপ। ছিল; এখন কোথায় বাড়ী?

আব। এখন কোথাও নাই।

রূপ। কেন?

আব। তাহাই জানাইবার জন্য হুজুরের নিকট আসিয়াছি।

রূপ। তোমার কি বিপদ্?

আব। ফৌজদার সাহেব আমাকে কুত্তা দিয়া খাওয়াইবার আদেশ দিয়াছেন।

রূপনাথ ও শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কর বলিলেন—"কেন, তোমার অপরাধ কি?"

আবদুল তখন কমলার মাতার আগমন হইতে পরবর্ত্তী সমস্ত ঘটনা একে একে নিবেদন করিল। শুনিয়া উভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। রূপনাথ বলিলেন, —"সামান্য অপরাধে ফৌজদার এত ভীষণ শাস্তির অনুষ্ঠান করিলেন কেন?"

আবদুল বলিল, —"তাহা ফৌজদারের খেয়াল। তা' ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।"

রূপনাথ জিজ্ঞাসিলেন, "কি কারণ?

আবদুল বলিল, "এখন মোগলের রাজত্ব, ফৌজদার সাহেবও মোগল। কিন্তু আমরা পাঠান। মোগলেরা পাঠানদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। সুযোগ পাইলেই তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িত করে। রাজনগরে মুসলমান-বাসিন্দার মধ্যে সকলেই মোগল, কেবল আমরাই পাঠান ছিলাম। আগে আরও দুই এক ঘর পাঠান ছিল, কিন্তু নানারূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে। আমাদের উপরও মাঝে মাঝে অত্যাচার হইত, কিন্তু আমার পিতা সব সহিয়া থাকিতেন। বাপদাদার ভিটার মায়া তিনি ছাড়িতে পারেন নাই।"

আবদুল একটু থামিল; একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমরা কিন্তু কোন দিনই ফৌজদার সাহেবের মন্দ করি নাই। বরং অনেক লড়ায়ে বুক দিয়া তাঁর ধনমান বাঁচাইয়াছি। তথাপি তিনি যে কেন আমাদের উপর অত্যাচার করিতেন, তাহা তিনিই জানেন। তিনি আমাদিগকে শত্রুর মত দেখিতেন, কেবল আমাদের ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তিনি ছাড়া আরও অনেকেই আমাদের শত্রু ছিল। কিন্তু এতদিন কেহ কিছু করিতে পারে নাই। এবার একটা ছল ধরিয়া, সকলে আমার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। দুষমনেরা

ঘর বন্ধ ক'রে তিনটে মানুষকে জীয়ন্তে আগুনে পুড়িয়েছে।"

আবদুল দুই হাতে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল। শঙ্কর স্থিরভাবে বসিয়া সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"এ ভীষণ অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতেই হইবে ঠাকুর!"

আবদুল বলিল,—"এর শোধ চাই ঠাকুর। আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহাতে আর এক তিলও বাঁচ্‌বার ইচ্ছা নাই। কিন্তু কেবল এর শোধ লইবার জন্য এখনও বাঁচিয়া আছি। শত্রু না মারিয়া পাঠান মরিতে পারে না।"

রূপনাথ বলিলেন,—"কিন্তু এখানে আসিলেই যে শোধ লইতে পারিবে, ইহা তোমায় কে বলিল?"

আবদুল বলিল,—"আল্লা বলেছেন। আমি ফৌজদারকে মারিয়া যখন বাহিরে আসিলাম, তখন পাগলের মত হইয়াছিলাম। আমার বুকটা হুহু করিয়া জ্বলিতেছিল। আমি ছুটিয়া মাঠের দিকে চলিলাম। মাঠের মাঝে একটা বড় পুকুর। সেই পুকুরের ঠাণ্ডা জল দেখিয়া আমার মরিবার লোভ হইল। আমি ছুটিয়া গিয়া জলে নামিলাম। কিন্তু তখনই কে যেন আমার বুকের ভিতর বসিয়া বলিল, "এখন মরিস্ না আবদুল! আগে শত্রু মারিয়া পরে মরিবি। এই অত্যাচার-দমনের জন্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। সেইখানে যা, শান্তি পাইবি। এখন মরিলে তো বুকের আগুন নিভিবে না?"

আবদুলের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। রূপনাথ ও শঙ্কর সবিস্ময়ে তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। আবদুল বলিল,—ঠাকুর! আমি আল্লার আদেশে এখানে আসিয়াছি, আমার বুকের আগুন নিভিবে না?"

শঙ্কর দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—নিশ্চয়ই নিভিবে।"

শঙ্কর রূপনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু রূপনাথের স্থিরদৃষ্টি তখন ঊর্দ্ধে স্থাপিত। তিনি তখন মনে মনে বলিতেছেন,—"এ কি খেলা ঠাকুর! এই বিপন্ন মুসলমানের সহিত কেন এ প্রতারণা? দীনহীন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এ ব্রাহ্মণ কি তোমার এই মহৎ কার্য্যভার গ্রহণের যোগ্য? তবে এস লীলাময়! এই দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র হৃদয়রথে দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দাও দেখি,—আবার একবার তেমনই করিয়া বল দেখি,—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥'

রূপনাথের উভয় গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল; তাঁহার হৃদয়মধ্যে যেন অনন্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকিল,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

শঙ্কর ও আবদুল সবিস্ময়ে কণ্টকিত-শরীরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### বিভীষণ।

দেবীগড়া গ্রামখানি দুর্ভেদ্য দুর্গবৎ না হইলেও বেশ সুরক্ষিত। তখনকার প্রধান প্রধান জমীদারগণের বাসস্থান প্রায়ই গড়বন্দী হইত। দেবীগড়াও সেইরূপ গড়বেষ্টিত ছিল। তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত বেষ্টন করিয়া খরস্রোতা শঙ্খেশ্বরী প্রবাহিতা। উত্তরে ক্ষেত্রে জলসেচনের নিমিত্ত একটি নাতি-বিস্তৃত খাল। খালটি শঙ্খেশ্বরীর সহিত সংযুক্ত। খালের উভয় পার্শ্বে কণ্টকাবিশিষ্ট ঘন বংশশ্রেণী; তাহা এত বিস্তৃত ও ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, বন্দুকের গুলীও তাহা ভেদ করিতে অসমর্থ। এই তিন দিক্ দিয়া শত্রু আক্রমণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কেবল গ্রামের পশ্চিমভাগটাই অরক্ষিত ছিল। এই দিক্ দিয়াই ফৌজদার সাহেব কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর ও রূপনাথ এক্ষণে সেই দিকের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সুবিধাও হইল। যে সকল প্রজাকে ফৌজদারের অত্যাচারে রাজনগর ত্যাগ করিতে হইল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আসিয়া রণজিৎ রায়ের আশ্রয় লইল। গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রান্তরের দক্ষিণাংশে একটা ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল। এক্ষণে সেই জঙ্গল কাটিয়া সমাগত প্রজাদিগকে তথায় বাস করান হইল। তদ্ব্যতীত গ্রামে যত নীচজাতীয় লাঠীয়াল ছিল, তাহারা সকলেই সেই স্থানের মধ্যে মধ্যে বসতি স্থাপন করিল। দেখিতে দেখিতে সেই জঙ্গলময় প্রান্তরভূমি একখানি অধিবাসিপূর্ণ গ্রামে পরিণত হইল। ইহাতে দুই কাজই হইল। একটা নূতন গ্রাম স্থাপন এবং নগর-রক্ষার বন্দোবস্ত উভয়ই সুসম্পন্ন হইল। রূপনাথ সেই নব-প্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম শঙ্করপুর রাখিলেন।

নগররক্ষার বন্দোবস্তের পর উভয়ে সৈন্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। অল্পায়াসেই দুই সহস্রাধিক

সৈন্য সংগৃহীত হইল। অত্যাচার-প্রপীড়িত শত শত প্রজা আসিয়া সৈন্যশ্রেণীতে যোগ দিল। তখন বাঙ্গালীরা প্রায় সকলেই অস্ত্র ধরিতে জানিত, যে অস্ত্র ধরিতে পারিত না, সে অন্ততঃ লাঠী ধরিতেও পারিত। শঙ্কর মহোৎসাহে এই সকল নবাগত সৈন্যের শিক্ষাদান এবং অস্ত্রসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। রণজিৎ বৃদ্ধ, তিনি এ বয়সে আর স্বয়ং যুদ্ধাদি ব্যাপারে যোগ দেওয়া উচিত মনে করিলেন না। তিনি সমস্ত ভার শঙ্করের উপর দিয়া কেবল অর্থসঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলেন।

এতদূর হইলেও বৃদ্ধ রণজিৎ কিন্তু সুবাদারের প্রাপ্য কর নিয়মিত সময়ে পাঠাইতে তিলমাত্র ব্যতিক্রম করিলেন না। বরং তদ্বিষয়ে আরও একটু অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। শঙ্কর প্রথমে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু রণজিৎ সে আপত্তি শুনেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবাজি! সব ভার তো তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি; এ বুড়োকে কেবল একটা ভাব লইয়া থাকিতে দাও। সময় হইলে আমিই সে ভারটা ছাড়িয়া দিব।"

দূরদর্শী বৃদ্ধ বুঝিয়াছিলেন যে, সে সময় আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব, আসিবে কি না, তাহাও সন্দেহ। তবে দিল্লীর সিংহাসনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক একটু আশারও সঞ্চার হইতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তখনও সুপ্ত শার্দ্দূলকে জাগাইতে সাহস করেন নাই। তিনি কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই সম্ভাবিত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুচতুর রণজিৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন, তাঁহার যে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। ফৌজদার যদি অন্য কোন কোন স্থান হইতে সাহায্য পাইয়া প্রবলবেগে আক্রমণ করে, তাহা হইলে এই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্যের দ্বারা প্রতিরোধ করা অসম্ভব। এখনও সমস্ত সৈন্য যুদ্ধস্থলে দাঁড়াইবার উপযুক্ত হয় নাই এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদিও অধিক পরিমাণে নাই। এই সময়ে ফৌজদার নববলে আক্রমণ করিলে সমূহ বিপদ্। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধ একটা চাল চালিলেন। তিনি শান্তি-প্রার্থনায় ফৌজদারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া আপাততঃ তাহাকে কিছুদিন স্তোকবাক্যে মুগ্ধ রাখাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। আজি-কালি করিতে করিতে ছয় মাস কাটিয়া যাইবে। এই সময়ের মধ্যে তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

অনেক চিন্তার পর রণজিৎ সুচতুর ও প্রভুভক্ত দেওয়ান রামরূপকেই দূতরূপে প্রেরণ করিতে স্থির করিলেন। তখন তিনি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া এবং যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া ফৌজদারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সুবিজ্ঞ রণজিৎ এইখানেই একটা মস্ত ভুল করিলেন। তা' তাঁহারই বা দোষ কি, দোষটা বিধাতার।

যেখানে লঙ্কাকাণ্ড, সেইখানেই বিভীষণ; যেখানে হল্‌দীঘাট, সেইখানেই মানসিংহ; যেখানে প্রতাপাদিত্য, সেইখানেই ভবানন্দ; যেখানে পলাশী, সেইখানেই মীরজাফর। বিধাতার যেন ইহা একটা চিরপ্রচলিত অলঙ্ঘ্য নিয়ম। পৃথিবীর—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের যেন ইহা একটা চিরকলঙ্কিত অভিশাপ। তা' তোমরা বিভীষণকে যতই ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ন্যায়বীর বলিয়া কীর্ত্তন কর না কেন, আমি তাহাকে কোন দিনই প্রশংসা করিতে পারিব না। বাক্যে তাহার স্থান যতই উচ্চে হউক না কেন, ইতিহাস তাহাকে চিরদিনই দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার বলিয়া ঘোষণা করিবে। কবির তুলিকা তাহাকে যতই দেবচরিত্রে চিত্রিত করুক না কেন, ঐতিহাসিক কোন দিনই তাহার মস্তকে নিদারুণ ঘৃণা ও অভিসম্পাতের বজ্রধারা বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যাহাই হউক, বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে এখানেও একজন গৃহভেদী বিভীষণের অভাব হইল না। এই বিভীষণ আর কেহই নহে, রণজিৎ রায়ের বিশ্বস্ত দেওয়ান রামরূপ সিংহ।

রামরূপ জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। কিন্তু বহুদিন, এমন কি, পিতামহের আমল হইতে বঙ্গদেশে বাস হেতু সম্পূর্ণ বাঙ্গালীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রামরূপ সুচতুর মেধাবী, কর্ম্মঠ; রামরূপ বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, মিষ্টভাষী। এই সমস্ত গুণ দেখিয়া রণজিৎ তাহাকে সামান্য পদ হইতে উন্নীত করিয়া দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামরূপও প্রাণপণে আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সহসা ঈর্ষ্যা নামক একটি অপদেবতা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সহসা যেন কোথা হইতে একটা অচিরোদিত প্রভুত্বের শক্তি আসিয়া তাহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতার উপর নিদারুণ কশাঘাত করিল। তাহাতে রামরূপের হৃদয়টা কঠোর যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়স্থিত অপদেবতাটি তাহার ব্যথিত হৃদয়ে একটা সর্ব্বনাশকর উত্তেজনার মন্ত্র ঢালিয়া দিতে লাগিল। সে উত্তেজনায় রামরূপের হিতাহিতজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, সে অচিরেই কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল।

রামরূপের দুই বিবাহ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ

দুই বিবাহ সত্ত্বেও তাহাকে এই ত্রিংশদ্বর্ষ বয়সেই গৃহহীন হইতে হইয়াছে। যৌবনোন্মেষের পূর্ব্বেই তাহার পত্নীদ্বয় অকালে পরলোকযাত্রা করিয়াছে। এক্ষণে রামরূপের শূন্যগৃহে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন আর কেহই নাই। অর্থের বা পাত্রীর অসদ্ভাব না থাকিলেও রামরূপ আর দারপরিগ্রহ করে নাই। কেন করে নাই, তাহা কেহ জানে না, সেও কাহাকেও বলে না। তবে রাত্রিকালে সে প্রায়ই গৃহে থাকিত না। কোথায় থাকিত, তাহা কেহ কখনও অনুসন্ধান করে নাই। মাতা জিজ্ঞাসিলে রামরূপ বলিত, মনিব-বাড়ীতেই ছিলাম। মাতা তাহাই বুঝিতেন। তিনি জানিতেন, শূন্যগৃহে ছেলের মন টিকে না। তবে অন্য কেহ না জানিলেও আমরা সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, সে প্রায় প্রত্যহই অতি প্রত্যুষে পতিহীনা অবিগতযৌবনা গয়লাবোয়ের বাটী হইতে বহির্গত হইত। কিন্তু সে কথার সহিত আমাদের এ আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহার সত্যাসত্য-নির্ণয় নিষ্প্রয়োজন।

সম্প্রতি রূপনাথের উপর রামরূপের একটু বিষ-দৃষ্টি পড়িয়াছিল। যে দিন রূপনাথ ফৌজদারের সহিত যুদ্ধে প্রথমে জয়লাভ করিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি সকলের নিকট অধিক সম্মান ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রবল বিক্রম ও অদ্ভুত কৌশলের কথা লইয়া সগৌরব আন্দোলন চলিল। কিন্তু কেন জানি না, এই কথাগুলা রামরূপের কর্ণে যেন কেমন কেমন ঠেকিল; বোধ হয়, এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুচ্ছ লাঠীবাজীর জন্য এতটা উচ্চপদ দেওয়া তাহার মতে ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য। তাহার পর বৃদ্ধ রণজিৎ স্বয়ং যখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, শঙ্কর তাঁহাকে আপনার গুরুপদে বরণ করিলেন, তখন রামরূপের নিকট সেগুলা অসহ্য ও বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইল। ইহার পর আবার ফৌজদারের সহিত যুদ্ধ বাধিল, আবার রূপনাথ তাহাতে জয়লাভ করিলেন। সকলে সমস্বরে তাঁহার জয়-ঘোষণা করিল, চারিদিকে তাঁহার বিজয়গীতি কীর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। রামরূপের আর সহ্য হইল না। সৈন্যেরা যুদ্ধজয় করিল, আর নাম কিনিল এই ভণ্ড ভিক্ষুক ব্রাহ্মণটা? রামরূপ স্থির বুঝিল, লোকগুলা পাগল হইয়াছে। নিতান্ত অসহ্য হইলে রামরূপ একদিন প্রভুর নিকট আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কিন্তু তাঁহার নিকট যাহা শুনিল, তাহাতে সে বুঝিল, বাবুর ভীমরথী হইয়াছে, নতুবা কি তিনি এই হতভাগা ব্রাহ্মণটাকে একেবারে অবতারের পদে বসাইতে চাহেন? এবার রামরূপের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। হায় ঈর্ষা! কোন্ নিষ্ঠুর বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিল?

কিন্তু ইহা ছাড়া তাহার রূপনাথের উপর বিদ্বেষের আরও একটা কারণ ছিল। রূপনাথের বাটীর পার্শ্বেই রামরূপের বাটী, একদিন রামরূপ বাটীর ছাদে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কমলার অসাধারণ রূপ—অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিল। কমলার সেই শান্ত সৌন্দর্য্যালোকে আলোকিত রূপনাথের ক্ষুদ্র গৃহখানি দেখিয়া সে আপনার উচ্চ অট্টালিকার দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে একটা হতাশ ও বিষাদের গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। একটা অব্যক্ত বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া সে ভাবিয়াছিল, 'হায়, বিধাতার কোন্ নিষ্ঠুর অভিশাপে আলোকের পার্শ্বে এই ঘনান্ধকার?' ইহার পর রামরূপ আরও দুই একবার কমলাকে দেখিল, দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়ে একটা আগুন জ্বালাইল। কিন্তু রূপনাথের বিক্রমের কথা স্মরণ করিয়া সে কেবল একটা ভগ্ন হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ভাবিল, রূপনাথ থাকিতে তাহার বাসনা-সিদ্ধির আশা সুদূরপরাহত। তাহাই বলিয়া সে আশা ছাড়িল না।

দিন দিন রূপনাথের নাম-ডাক যতই বাড়িতে লাগিল, ততই রামরূপের হৃদয়ে দাবদাহ আরম্ভ হইল। তখন কৌশলী রামরূপ এই ব্রাহ্মণের উচ্চ গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য তাহাকে নির্ম্মূল করিয়া আপনার বাসনাসিদ্ধির জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিল। সে ষড়যন্ত্রের ফলে রামরূপের সর্ব্বনাশ হইল, রণজিতের সর্ব্বনাশ হইল!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামরূপ সুচতুর। তাহার চতুরতাপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকট কাহারও হৃদয়ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার উপায় ছিল না। এই তীক্ষ্ণদৃষ্টির বলে সে কিছুদিন হইতে কৃষ্ণকান্তের হৃদয়টা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিল। এক্ষণে আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল বিবেচনা করিয়া সে অতি গোপনে কৃষ্ণকান্তের সহিত মিলিত হইল। অতি সঙ্গোপনে যাতায়াত ও পরামর্শ চলিতে লাগিল; যাতায়াতে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে পার্ব্বতীও আসিয়া এই পরামর্শে যোগ দিল। ধূমায়মান বহ্নির সহিত প্রবল বায়ু সম্মিলিত হইল। তখন একটা প্রলয়ানল জ্বালিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকান্ত, পার্ব্বতী ও রামরূপ তিন জনে এক ভীষণ চক্রান্তের পরামর্শ করিল।

বৃদ্ধ রণজিৎ এতটা জানিতেন না। তিনি সরলভাবে রামরূপকে সমস্ত কথা বলিয়া তাহাকে ফৌজদারের নিকট প্রেরণ করিলেন। রামরূপও সানন্দে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### মরিব না, ভালবাসিব

চন্দ্রা পিতার সহিত বাটীতে প্রবেশ করিয়া আপনার কক্ষে আসিল। আসিয়াই শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল,—দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া খানিকটা কাঁদিল। তার পর ভাবিল, 'হায়, কেন আসিতে বারণ করিলাম? তাঁহাকে না দেখিয়া আমি কি থাকিতে পারিব?' চন্দ্রার মনে হইল, সে তখনই ছুটিয়া গিয়া শঙ্করের পায়ে ধরিয়া বলে, "না না, তুমি আসিও।" কিন্তু অমনই পিতার নিষেধ বিমাতার তিরস্কার মনে পড়িল। তখন চন্দ্রা আবার উপাধান সিক্ত করিয়া অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, কেন পিতার এই কঠোর নিষেধাজ্ঞা, কেন বিমাতার সরোষ তিরস্কার। সে কেবল কাঁদিতে জানিত, কাঁদিতেই লাগিল। প্রভাত-সূর্য্যালোক মুক্ত বাতায়ন-পথে আসিয়া তাহার মুখের উপর নাচিতে লাগিল।

দ্বারদেশ হইতে পার্ব্বতী ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

চন্দ্রা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। পার্ব্বতী গৃহে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আবার কাঁদিতেছিস্?"

চন্দ্রা কোন উত্তর দিল না, কেবল অঞ্চলে বার বার চক্ষু মুছিতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিল,—"আজ আবার সে আসিয়াছিল?"

চন্দ্রা নতমুখে বলিল,—"হাঁ।"

পা। আবার তাহার সহিত কথা কহিতেছিলি?

চন্দ্রা কোন উত্তর করিল না।

পা। আজ তোকে অনাহারে থাকিতে হইবে।

চন্দ্রা নীরব।

পা। তুই তাহাকে ভালবাসিস্?

চন্দ্রা পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল। পার্ব্বতী আবার পরুষ-কণ্ঠে বলিল,—"সত্য কথা বল্, তুই তাহাকে ভালবাসিস্ কি না?"

চন্দ্রা দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"বাসি।"

পার্ব্বতী ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় চন্দ্রার উপর পড়িল। তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিল,—"হতভাগি! কুলে কালি দিতে বসিয়াছিস্? আজ তোর ভালবাসার সখ মিটাইব।"

পার্ব্বতী চন্দ্রার কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে শয্যা হইতে টানিয়া আনিল। সে আকর্ষণে চন্দ্রা কাতর হইয়া পড়িল, তাহার মাথার ভিতরটা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কোন কথাই বলিল না, একটুও কাতরতা প্রকাশ করিল না; কেবল অশ্রুধারে তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে অশ্রুতে পার্ব্বতীর প্রাণ গলিল না। সে সমানভাবে কেশগুচ্ছ টানিয়া বলিল,—"প্রতিজ্ঞা কর্, তাহাকে ভুলিবি?"

চন্দ্রা নীরবে তাহার সজল দৃষ্টিখানি তুলিয়া বিমাতার মুখের উপর স্থাপন করিল। পার্ব্বতী বলিল,—"ও ডাইনীর মায়ায় আমি ভুলি না। তাহাকে ভুলিবি কি না বল্?"

চন্দ্রা কোন উত্তর দিল না। ক্রুদ্ধা পার্ব্বতী তাহার মাথাটা আর একবার নাড়িয়া দিয়া বলিল, "এখনও বল্, ভুলিবি কি না?"

যন্ত্রণায় চন্দ্রা অস্থির হইয়া পড়িল। পার্ব্বতী তাহার মুখের উপর ক্রোধজ্বলিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল,—"ভুলিবি?"

চন্দ্রা স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিল,—"না।"

"রাক্ষসি!" বলিয়া পার্ব্বতী সবলে তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল। চন্দ্রা "মা গো" বলিয়া হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া পড়িল। তখন পার্ব্বতী সশব্দ-পদক্ষেপে কক্ষ হইতে বহির্গত হইল। বাহিরে আসিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে বলিল, "আমি থাকিতে শঙ্কর কিছুতেই তোর হইবে না।"

দ্বার রুদ্ধ হইল। ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে পার্ব্বতী তথা হইতে প্রস্থান করিল। আর চন্দ্রা সেই হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল, "যদি শঙ্করকে পাইবার জন্য ভালবাসিতাম, তবে আজিই মরিতাম। কিন্তু আমি তো সে আশায় ভালবাসি না, তবে কেন মরিব? আমি মরিব না, ভুলিব না, কেবল ভালবাসিব।"

পার্ব্বতী বাহিরে আসিয়াই কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইল। তীব্রস্বরে বলিল—"তোমার মেয়ের গুণ শুনিয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কি?"

পা। সে শঙ্করকে ভালবাসিয়াছে।

কৃ। কে বলিল?

পা। সে নিজ মুখে বলিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত একটু চিন্তিত হইলেন। পার্ব্বতী বলিল —"কি ভাবিতেছ?"

কৃ। তবে উপায়?

পা। উপায় এখনও আছে।

কৃ। কি?

পা। তাহার এ ভালবাসা নষ্ট করিতে হইবে।

কৃ। কি উপায়?

পা। এস বলিব।

পার্ব্বতীর সহিত কৃষ্ণকান্ত অন্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঠিক তখনই কক্ষান্তরে পড়িয়া চন্দ্রা ভাবিতেছিল, "মরিব না, ভুলিব না, কেবল ভালবাসিব।"

## নবম পরিচ্ছেদ

### মেঘ ডাকিল।

ফৌজদারের সহিত সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া একদিন পরে রামরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহার সহিত ফৌজদারের জনৈক কর্ম্মচারী আসিল। রামরূপ ফিরিয়া আসিয়া রণজিৎকে বলিল,—ফৌজদার সাহেব সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন; সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিবার জন্য জনৈক বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিয়াছেন।"

কৌশল সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া রণজিৎ আনন্দিত হইলেন, এবং সমাগত দূতের বাসস্থানাদি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আবদুল গোপনে থাকিয়া এই দূতকে দেখিল, দেখিয়া গোপনে তাহার উপর একটু লক্ষ্য রাখিল। কিন্তু মনের কথা কাহাকেও বলিল না।

দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, সন্ধির বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। রণজিৎ তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করিলেন না। এ দিকে রামরূপ সর্ব্বদাই প্রায় আগত দূতের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিত, মধ্যে মধ্যে তাহাকে আপনার বাটীতেও লইয়া যাইত; অতি গোপনে উভয়ের মধ্যে গুপ্ত পরামর্শও চলিত। আর কেহ সে দিকে লক্ষ্য না করিলেও তাহা আবদুলের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

একদিন রাত্রিকালে রূপনাথ আপনার গৃহমধ্যে বসিয়া সেতারে ঝঙ্কার দিতেছিলেন। অনেকক্ষণের পর সেতারটা ঠিক বাঁধা হইল, সুরে সুর মিলিল; তখন রূপনাথ তাহার মধুর ঝঙ্কারের সহিত আপনার মধুময় কণ্ঠ মিলাইয়া ভৈরবীতে গান ধরিলেন,—

"একবার তেম্‌নি ক'রে নাচ দেখি মা
এলোকেশে মোহনবেশে।"

কমলা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। ঈষৎ হাসিয়া একটু গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল,—"একটা কথা শুন্‌বে কি?"

কথাটা বুঝি রূপনাথের কানে গেল না। তিনি আপন মনে গাহিলেন,—

"তেম্‌নি গলে মুণ্ডমালা তেম্‌নি অট্টহাসি হেসে।"

কমলা আরও একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"একবার গানটা রেখে কথাটাই শোন না।"

রূপনাথ গাহিতে লাগিলেন,—

"তেম্‌নি কালো রূপের রাশি,
তেম্‌নি ক'রে নাচ্‌বে অসি,
কোটি রবি কোটি শশী,
তেম্‌নি পদনখে পড়্‌বে খ'সে।"

কমলার আর সহ্য হইল না। সে এবার রূপনাথের নিকটে গিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে সেতারটা কাড়িয়া লইল। তার পর সেটাকে ঘরের এককোণে রাখিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল। রূপনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"দরিদ্রের ভগ্নকুটীরে এ ভৈরবী-মূর্ত্তি কেন?"

কমলা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—"তোমার গানের জ্বালায়। ও ছাই ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ রাতদিন ভাল লাগে না।"

রূপ। কেন, হিংসা হয় না কি?

কমলা গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল,—"কেন হবে না?"

রূপ। তা' না শুন্‌লেই হ'লো?

কম। আমি তো শুন্‌বার জন্য হাঁ ক'রে ব'সে আছি।

রূপ। তবে ও গরীবের উপর এত অত্যাচার কেন?

কম। ও আমার কথায় বাধা দেয় কেন?

রূপ। সেটা ওর ঝকমারি হয়েছে বটে। তা' তোমার আবার কথা কি?

কম। কেন, আমার কি কোন কথা নাই?

রূপ। তা তো এই নূতন শুন্‌ছি। তা' সেটা সময়মত বল্‌লে কি চল্‌তো না?

কম। তোমার কোন্‌টা সময়, কোন্‌টা অসময়, তা তো বুঝতে পারি না। সময়ে লড়াই, অসময়ে গান, তার ভিতর অন্য সময় কোন্‌খানটায়?

রূপ। আর অন্য সময়ের বিশেষ প্রয়োজনই বা কি?

কম। এ দিকে সংসারটা কে দেখবে?

রূপ। স্বয়ং কমলা যার সংসারের ভাবনা ভাবে, সে ও দিক্‌টা নাই দেখলে?

কমলা হাসিয়া ফেলিল। রূপনাথ বলিলেন,—"ব্যাপার কি কমলা?"

কম। মা যে কাশী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

রূপ। কেন, তাঁর কি এখানে কোনরূপ অসুবিধা হচ্চে?

কম। অসুবিধা না হলেও তিনি বলেন, বয়স তো হয়েছে। আর শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে এখানে মরার চেয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে দেহটা রাখাই ভাল।

রূপনাথ একটু ভাবিলেন। বলিলেন,—"উত্তম কথা। কিন্তু অনেক টাকার দরকার।"

কম। তার কিছু টাকা আছে, বাকী তুমিও কিছু দাও।

রূপ। আমি টাকা কোথায় পাব কমলা?

কম। কেন, এত বড় সেনাপতি তুমি, দেশ জুড়ে নাম, আর টাকা কোথায় পাবে?

রূপনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"কমলা!"

কম। কি?

রূপ। কেন আমার এত নাম-ডাক, কিসের জন্য আমার এত আয়োজন—এত পরিশ্রম, তা কি তুমি জান না কমলা?

কম। জানি।

রূপ। তবে আবার ও কথা কেন বলিতেছ? আমি কি টাকার জন্য মাতৃপদে দেহ উৎসর্গ করিয়াছি?

কম। আমি রহস্য করিতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু মার এখন কি উপায় করা যায়?

রূপ। তুমিই বল দেখি?

কম। আমাদের যে কিছু জমী-জমা আছে, তাই এখন বন্ধক দিয়া মাকে কাশী পাঠালে হয় না?

রূপনাথ একটু হাসিলেন। বলিলেন,—"রাজাকে বলিলেই তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

কম। রাজার নিকট হইতে অর্থ লইবে?

রূপ। কেন, দোষ কি?

কম। তুমি কি রাজদাস?

রূপনাথ কমলাকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—"না কমলা! মাতৃপদ ভিন্ন আর কোথাও এ দেহ বিক্রীত নহে। টাকার উপায় করিব।"

সহসা বাহির হইতে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠিল। রূপনাথ দ্রুতপদে বাটীর বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু একটু দূর হইতে আবার সেই আর্ত্তনাদ উঠিয়া নৈশ-গগনে বিলীন হইল। রূপনাথ সেই স্বরের অনুসরণ করিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একবার দাঁড়াইলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন পথে। সে পথে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই স্বর শুনিবার জন্য একবার উৎকর্ণ হইলেন। আবার—আবার দূরোত্থিত করুণ স্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি সেই দিকে ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সেই হৃদয়-দ্রবকারী করুণ স্বরও তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ততই দূর হইতে দূরে ছুটিল।

ক্রমে রূপনাথ লোকালয় ছাড়িয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে একবার দাঁড়াইলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে একটা বর্শা আসিয়া তাঁহার বাম বাহুতে বিদ্ধ হইল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, শত্রু সম্মুখে। দুই জন মুসলমান তাঁহাকে আক্রমণোদ্যত হইয়াছে। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে আপনার বাহুবিদ্ধ বর্শা টানিয়া লইয়া তাহা ধারণ করিলেন। বর্শার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাহু হইতে রক্তধারা ছুটিল। রূপনাথ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শত্রুদ্বয়ের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন। অমনই একজন আক্রমণকারী তাঁহার স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া অসি তুলিল। রূপনাথ ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আক্রমণ ব্যর্থ হইল। তখন রূপনাথ ছুটিয়া আসিয়া সবলে আক্রমণকারীকে পদাঘাত করিলেন। সে আঘাতে আক্রমণকারী দশহস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার হাতের অসি মাটীতে পড়িয়া ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে অপর আক্রমণকারী রূপনাথকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা তুলিল। রূপনাথ আপনার হস্তস্থিত বর্শা ঘুরাইয়া তাহার সে আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন এবং তাহাকে মারিবার জন্য আপনার বর্শা তুলিলেন; আক্রমণকারী আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

তখন পদাহত আক্রমণকারী উঠিয়া বসিয়াছে। রূপনাথ তাহার নিকটে আসিলেন। বলিলেন,—"কে তোরা?"

সে বলিল,—"বলিব না।"

রূপনাথ বর্শা উদ্যত করিয়া বলিলেন,—"না বলিলে এখনই বর্শাবিদ্ধ করিব।"

আক্রমণকারী বলিল,—"তথাপি বলিব না।"

এমন সময় অদূরে অনেকগুলা দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। রূপনাথ বুঝিলেন, শত্রুর সংখ্যা অল্প নহে। এদিকে তখনও তাঁহার বর্শাবিদ্ধ বাহু হইতে শোণিত-স্রাব হইতেছে, তাহাতে দেহ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। তখন তিনি আর সে স্থানে অপেক্ষা করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তৎক্ষণাৎ দ্রুত-পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

যে মুহূর্ত্তে রূপনাথ বাটীর বাহির হইয়া স্বরের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার পর-মুহূর্ত্তেই দুই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। তার পর যখন রূপনাথের পদশব্দ দূরে মিলাইয়া গেল, তখন আগন্তুকদ্বয়ের একজন অপরের কানে কানে কি কথা বলিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, অপর ব্যক্তি অসি-হস্তে প্রহরিস্বরূপে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ অতিবাহিত হইলেই প্রহরী সাগ্রহে বার বার বাটীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে বা কোনও শব্দ শুনিতে না পাইয়া সে অধীরভাবে পাদচারণা করিতে থাকিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই অচিন্তিত আক্রমণের ভাবে প্রহরী ধরাশায়ী হইল। আগন্তুক ত্বরিতগতিতে কৌশলে তাহার বুকের উপর বসিয়া একহাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল; এবং মৃদুস্বরে বলিল,—"গোল করিলেই কাটিয়া ফেলিব।"

প্রহরী এইরূপ অসম্ভাবিত আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। তখন আগন্তুক তাহারই মাথার বৃহৎ পাগড়ী টানিয়া লইয়া তদ্দারা তাহার মুখ, হাত, পা উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলিল। তার পর তাহার তরবারি তুলিয়া লইয়া সতর্ক পাদবিক্ষেপে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

রূপনাথ চলিয়া গেলে কমলা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর আলোকটাকে আরও একটু উজ্জল করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই এক অপরিচিত পুরুষ ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিয়াই কমলা কাঁপিয়া উঠিল। চীৎকার করিতে গেল. কিন্তু ভয়ে কণ্ঠস্বর বাহির হইল না। আগন্তুক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল; বলিল,—"আইস।"

কমলা নিতান্ত ভীরুস্বভাবা ছিল না, সে রূপনাথের উপযুক্ত পত্নী। কমলা বুঝিল, বিপদ বড় গুরুতর, এ সময়ে সাহসে বুক না বাঁধিলে বিপদের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। তাই আগন্তুকের কথার উত্তরে সে বলিল,—"কোথায় যাইব?"

আগন্তুক সহাস্যে বলিল,—"যেখানে গেলে সুখে থাকিবে।"

কম। সে কোথায়?

আগ। আমার গৃহে।

কম। তুমি কে?

আগ। আমি—আমি একজন—

কম। তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক।

আগ। আমি তোমার জন্যই বিশ্বাসঘাতক—তোমাকে পাইবার আশায় আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, সংসার, স্বদেশ সকলই ছাড়িয়াছি।

কম। একটা রমণীর জন্য ধর্ম্ম ছাড়িয়াছ—স্বদেশ ভুলিয়াছ?

আগ। স্বদেশ কোন্ ছার—তোমার জন্য প্রাণের মায়াও ছাড়িতে পারি।

কম। দেশের চেয়ে প্রাণটা কি বড়?

আগ। সে পরে হবে, এখন আমার সঙ্গে এস।

কম। যদি না যাই?

আগ। বলপূর্ব্বক নিয়ে যাব।

কম। বিশ্বাসঘাতক নরাধমের আবার বল!

কমলা ভাবিতেছিল, কোনরূপে বিলম্ব করিলেই স্বামী আসিয়া পড়িতে পারেন। আগন্তুকও তাহা বুঝিতে পারিল। বলিল,—"সুন্দরি! যদি গোলামের শক্তি-পরীক্ষাই তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তাহাই হউক।"

আগন্তুক কমলাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। কমলা দুই পদ পিছাইয়া গেল। মনে মনে বলিল,—"কোথায় হে অনাথনাথ! দুর্ব্বলের সহায়! আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা কর প্রভু!"

সহসা আর এক ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ করিয়াই আগন্তুককে সবলে পদাঘাত করিল। সে ভীম পদাঘাতে আগন্তুক ধরাশায়ী হইল। তখন প্রবেশকারী মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল; তরবারি উত্তোলন করিয়া বলিল,—"নিমকহারাম!"

দ্বারপ্রান্ত হইতে কে ডাকিল,—"আবদুল!"

আবদুল চাহিয়া দেখিল, কক্ষমধ্যে রূপনাথ! রূপনাথ স্থিরস্বরে বলিলেন,—"ছাড়িয়া দাও আবদুল।"

আবদুল বলিল,—"আগে নিমকহারামকে শাস্তি দিয়া তার পর আপনার আদেশ শুনিব।"

রূপনাথ গিয়া আবদুলের হাত ধরিলেন; বলিলেন,—"না আবদুল! শত অপরাধ করিলেও যুদ্ধস্থল ব্যতীত হিন্দুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না। ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা!"

আগন্তুক আর কেহ নহে, স্বয়ং রামরূপ।

আবদুল উঠিয়া দাঁড়াইল! রামরূপ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল। রূপনাথ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমি না হিন্দু? হিন্দু যদি হিন্দুর সর্বনাশ করে, তবে স্বর্গের দেবতা আসিলেও যে কোন উপায়ই হইবে না।"

রূপনাথ অধোবদনে নিরুত্তর রহিল। আবদুল তাহার ঘাড় ধরিয়া একটা ধাক্কা দিল। রামরূপ দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল। তার পর সে উঠিয়া ছুটিয়া পলাইল। আবদুলও রূপনাথকে সেলাম করিয়া নীরবে বাহিরে আসিল। আসিবার কালে রূপনাথ তাহাকে বলিলেন,—"লোকটা যে কে, তাহা প্রকাশ করিও না।"

বাটীর বাহিরে প্রহরী তখনও বন্ধনাবস্থায় পড়িয়াছিল। আবদুল গিয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। প্রহরী সে স্থান ত্যাগ করিল। আবদুল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

পরদিন সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু লোকটা যে কে, তাহা অপ্রকাশ রহিল। রূপনাথ কেবল রণজিৎকে বলিয়া রামরূপকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন।

রামরূপ কর্ম্মচ্যুত হইল; কিন্তু তাহাতে সে দুঃখিত হইল না। সে এবার ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শত্রুতাসাধনের জন্য অগ্রসর হইল।

শঙ্কর আবদুলকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা এ জীবনে ভুলিব না। তোমার ইচ্ছামত পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

আবদুল বলিল, "আমি সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশের অনুমতি চাই।"

মুসলমান বলিয়া সে পূর্ব্বে এ অনুমতি পায় নাই।

শঙ্কর বলিলেন, "তাহা তো এখন হইতে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য। উহা পুরস্কার নহে, অন্য পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

আবদুল বলিল, "সময় হইলে তাহা চাহিয়া লইব।"

সেই দিন হইতে আবদুল শঙ্করের শরীররক্ষকরূপে নিযুক্ত হইল।

রূপনাথ ভাবিলেন, "জানি না, এই প্রথম মেঘাড়ম্বর হইতে পরে কি ভীষণ বজ্রাঘাত হইবে।"

## দশম পরিচ্ছেদ

### সংযম ও লালসা।

শঙ্কর অনেক চেষ্টা করিয়াও চন্দ্রাকে ভুলিতে পারিলেন না। যতই তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, ততই তাহার স্মৃতি আরও উজ্জ্বল, আরও গভীররূপে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে লাগিল; ততই তাহার বিষাদপূর্ণ কোমল মুখখানি মধুর হইতে মধুরতররূপে তাঁহার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টাতেও শঙ্কর সে মুখখানি ভুলিতে পারিলেন না। ভুলিবার চেষ্টা করিলেই হৃদয়টা যেন ফাটিয়া যাইত, সংসারটা শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত, কর্ম্মময় কর্ত্তব্যপূর্ণ জীবন-গ্রন্থিটা শিথিল হইয়া পড়িত। শঙ্কর বুঝিলেন, ভুলিবার চেষ্টা বৃথা।

যত দিন যাইতে লাগিল, শঙ্করের হৃদয়টা ততই অস্থির হইয়া উঠিল। একদিকে কর্ত্তব্যের উচ্চ আহ্বান, অন্য দিকে ভালবাসার কোমল আকর্ষণ; একদিকে শত্রুর উত্থিত তরবারির ভীষণ দৃশ্য, অন্যদিকে প্রণয়ের স্নিগ্ধ অশ্রুধারা; একদিকে ভীম ঝটিকাময়ী রজনীর করাল গর্জ্জন, অন্যদিকে উষার শান্তোজ্জ্বল আলোক-রশ্মি। এই মহা সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শঙ্কর হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে যুদ্ধে কাহারও জয়-পরাজয় হইল না। উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া একটা সন্ধি সংস্থাপন করিল। তাহাতে কর্ত্তব্যও আপনার স্বত্ব বুঝিয়া পাইল, ভালবাসাও অধিকারচ্যুত হইল না। এ সন্ধির ঘটক রূপনাথ।

এক দিন অপরাহ্নকালে শঙ্কর নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ আসিয়া শঙ্খেশ্বরীর বুকে পড়িয়াছিল; মৃদু বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার ছোট বড় হার গাঁথিতেছিল, আর শঙ্খেশ্বরী সেই সোনালী হার গলায় দোলাইয়া আনন্দে গর্ব্বে নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছিল। নদীর পরপারে বিশাল প্রান্তর, ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশ। বহুদূরে যেখানে আকাশে প্রান্তরে জড়াজড়ি করিয়া দর্শকের দৃষ্টিরোধ করিতেছিল, যেখানে অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজির অস্পষ্ট রেখা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেখান হইতে অন্ধকারের অস্পষ্ট ছায়া ধীরে ধীরে প্রান্তরবক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। যেন কোন হতাশ প্রণয়ীর ব্যথিত হৃদয়ে বিস্মৃতির মসীময়ী যবনিকা অল্পে অল্পে আবৃত হইয়া তাহাকে আপনার অন্ধকার গর্ভে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

শঙ্কর স্থির-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন,—"বিস্মৃতিই মৃত্যু!" তাঁহার হৃদয়ের গভীর

প্রদেশ হইতে একটা তপ্ত শ্বাস বাহির হইয়া সান্ধ্য বায়ু-প্রবাহে মিশাইয়া গেল। তখন তিনি উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে নদীতীরের পথে ধীরে ধীরে চলিলেন। নিকটেই আবদুল ছিল, সেও তাঁহার অনুসরণ করিল। শঙ্কর ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহাকে অনুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। আবদুল আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শঙ্কর সহসা দাঁড়াইলেন। সম্মুখে কৃষ্ণকান্তের বাটী, পার্শ্বে চির-পরিচিত সেফালিকা-বৃক্ষ। শঙ্কর ব্যগ্রদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন, সে দৃষ্টি যেন বহুদিনের পরিচিত; কিন্তু বহুদিনের অদৃষ্ট কাহাকে অন্বেষণ করিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে কেহ পড়িল না। কেবল সেই উচ্চ অট্টালিকা নীরবে দাঁড়াইয়া উপহাসের কঠোর হাসি হাসিল। শঙ্করের নেত্রপ্রান্ত হইতে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি নদীতীর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের পথে অগ্রসর হইলেন।

পথটা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ। তাহা কৃষ্ণকান্তের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেহ সে পথে যায় না। শঙ্কর অন্যমনস্কতা বশতঃ সেই পথে চলিলেন। পথের বাম পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত সুবৃহৎ উদ্যান, দক্ষিণ পার্শ্বে কৃষ্ণকান্তের বাটী। উদ্যানে যাইবার জন্য বাটীর সেই দিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে। কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে।

শঙ্কর যখন চিন্তিত-হৃদয়ে ধীরপদে সেই দ্বারের সমীপস্থ হইলেন, তখন উপর হইতে মৃদুস্বরে কে ডাকিল,—"শঙ্কর!"

শঙ্কর সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে পাইলেন, উপরে গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পার্ব্বতী। পার্ব্বতী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিল না, সেই হৃদয়ভেদী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না; কেবল মৃদুস্বরে বলিল,— "শঙ্কর! চন্দ্রাকে একবার দেখিবে না?"

শঙ্করের হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিত-ভাবে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পার্ব্বতী বলিল,—"আমরা বুঝিতে পারি নাই, তাই এমন কাজ করিয়াছিলাম। এখন চন্দ্রা যে মরিতে বসিয়াছে।"

চন্দ্রা মরিতে বসিয়াছে? শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"কেন, তাহার কি হইয়াছে?"

পার্ব্বতী বলিল,—"কি হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। এখন একবার তাহার সহিত দেখা করিবে কি?"

শঙ্কর ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন,—"করিব।"

"তবে দাঁড়াও" বলিয়া পার্ব্বতী গবাক্ষ বন্ধ করিল। অল্পক্ষণ পরেই বাটীর ক্ষুদ্রদ্বার উন্মুক্ত হইল। শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, দ্বার আবার রুদ্ধ হইল।

শঙ্করকে লইয়া পার্ব্বতী দ্বিতলের এক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কক্ষ শঙ্করের পরিচিত। কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু যাহাকে খুঁজিলেন, তাহাকে পাইলেন না। পার্ব্বতী তাঁহার মনের ভাব বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল,— "শঙ্কর!"

শঙ্কর বলিলেন,—"কি?"

পা। চন্দ্রা কি আমার অপেক্ষা সুন্দরী?

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইল। চমকিত হইয়া শঙ্কর বলিলেন,—"সে কথা কেন?"

পা। কেন? চিরদিনই কি তুমি এইরূপ নিষ্ঠুর থাকিবে?

শ। তাহা তো অনেক দিনই বুঝিয়াছ?

পা। বুঝিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই কি তুমি ফিরিয়া চাহিবে না?

শ। কিছুতেই না। তোমার এ পাপ বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে আমি অক্ষম।

পা। কিন্তু তোমাকে না পাইলে আমি যে এরূপ সহস্র পাপে মজিব?

শ। ঈশ্বর জানেন, তাহাতে আমার কোনই অপরাধ নাই।

তখন পার্ব্বতী শঙ্করের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কাতর-কণ্ঠে বলিল—"দোহাই তোমার, এখনও আমাকে বাঁচাও। তুমি জান না, তোমাকে না পাইয়া আমি কি অসাধ্য-সাধন করিতে বসিয়াছি। কিন্তু তুমি মনে করিলে এখনও আমাকে ফিরাইতে পার। শঙ্কর! দয়া কর—রক্ষা কর। আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, হৃদয়ভরা ভালবাসা আছে, সে সমস্তই তোমার পায়ে ঢালিয়া দিতেছি, তুমি একবার ফিরিয়া চাহিবে না কি?"

নির্জ্জন গৃহ, পদতলে যৌবনভরা অলোক-সামান্যা সুন্দরী, সম্মুখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়োপহার। কিন্তু এততেও শঙ্করের হৃদয় টলিল না। তিনি দৃঢ়স্বরে কর্কশকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি যদি জগতের সাম্রাজ্য লইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে, তবে তাহাও আমি পদাঘাতে বিচূর্ণিত করিতাম। এ পাপের ভরা রূপযৌবন লইয়া আর তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিও না।"

পার্ব্বতী স্থির-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি পাষাণ।"

শ। তাহা কি এতদিনেও বুঝিতে পার নাই?

পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"বুঝিয়াছি। কিন্তু আর একটা কথা—তুমি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর না?"

শ। জীবন দিয়াও রক্ষা করিব।

পা। কিন্তু শঙ্কর! পার্ব্বতীও জীবন দিয়া তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে। প্রত্যাখ্যাতা পদদলিতা পার্ব্বতী প্রাণপণে দেশের সর্ব্বনাশ করিবে। তখন দেখিবে, উপেক্ষিতা পার্ব্বতীর হৃদয়ে কি শক্তি; তখন বুঝিবে, তুমি কি নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছ।"

পার্ব্বতীর নয়নে প্রতিহিংসার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"তুমি এইরূপ ভয় দেখাইয়া কার্য্যসাধন করিবার উদ্দেশ্যেই কি আমাকে এখানে আনিলে?"

পার্ব্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আইস।"

পার্ব্বতীর পশ্চাৎ শঙ্কর কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### লালসার জয়।

কবি বলিয়াছেন, "আশাবধিং কো গতঃ।" বাস্তবিকই আশার বুঝি অবধি নাই। হৃদয়ে একবার আশার একটু ক্ষুদ্র অঙ্কুর উথিত হইলে শীঘ্রই তাহা অনন্ত শাখা-পল্লবাবৃতরূপে অসীম হইয়া পড়ে। তখন তাহার প্রতি শাখায় নবীন পল্লব, প্রতি পল্লবান্তরালে নবোদ্গত বিচিত্র কুসুম-গুচ্ছ, প্রতিগুচ্ছে ভ্রমর-গুঞ্জন, প্রতি শাখায় কোকিল-কূজন, আশামুগ্ধ মানবের প্রাণমন অভিভূত ও উন্মাদ করিয়া ফেলে। মানব সেই বিচিত্র নবীন শোভায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া যতই তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে, ততই তাহা মরুভূমির কুহকময়ী মরীচিকার ন্যায় আরও উজ্জ্বল, আরও মনোহর বেশ ধারণ করিয়া তাহাকে দূর হইতে দূরান্তরে আকর্ষণ করে। কুহকমুগ্ধ মানব একটা নিদারুণ পিপাসা হৃদয়ে লইয়া অতৃপ্তির পথে উন্মাদ-হৃদয়ে কেবল তাহার পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। পূর্ব্বে যাহা তাহার নিকট তৃপ্তির দুর্লভ সুধাসমুদ্র বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তাহা পদতলে লুণ্ঠিত হইলেও তাহাকে অতৃপ্তির গরলসিন্ধুজ্ঞানে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দর্শন করে এবং হৃদয়ে নব লালসার তীব্র বহ্নি জ্বালাইয়া ঘোর অশান্তিকে আলিঙ্গনের জন্য ধাবিত হয়। শেষে আজীবন সেই অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতে হইতে অনুতাপের প্রবল তাড়না সহ্য করিতে থাকে। এই আশাত্যাগেই শান্তি, আশাত্যাগীই দেবতা।

রামরূপ মানুষ, মানুষের হৃদয় লইয়া সে আশার অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে। কাজেই তাহাকে নিত্য নব রত্নের অন্বেষণে সেই অতলস্পর্শী সমুদ্রের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হইতেছে। যেমন এক একটি রত্ন তাহার হস্তগত হইতেছে, অমনই আর একটি রত্নের উজ্জ্বল দীপ্তি তাহার লালসাময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দুরাশার পথে টানিয়া আনিতেছে। রামরূপ যখন পার্ব্বতীকে পায় নাই, কেবল তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়াছিল, কেবল তাহার মন্মথশরসন্ধানতুল্য কটাক্ষ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিল, তখন তাহার হৃদয় পার্ব্বতীকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল, সেই দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যসুধা উপভোগ করিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর যখন সে সেই রূপলাবণ্যময়ী পার্ব্বতীকে হাতে পাইল, যখন দেখিল, সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি তাহার চরণে বিলুণ্ঠিত, যখন বুঝিল, পার্ব্বতী এখন তাহার খেলার পুতুল মাত্র, তখন তাহার পূর্ণ হৃদয়ে আর একটা আশার বিরাট্ তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল; তখন তাহার চঞ্চল মনোভৃঙ্গ পূর্ণাবয়ব মধ্যাহ্নের পদ্ম ত্যাগ করিয়া বিকাশোন্মুখী ক্ষুদ্র যূথিকাটির দিকে ধাবিত হইল; তাহার ক্রীড়াশীল হৃদয়হংস বর্ষার কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনীর উন্মাদ তরঙ্গ ছাড়িয়া শরতের স্বচ্ছসলিলা সরসীতে বিচরণ করিবার জন্য ছুটিল। সে পার্ব্বতীর ধরোজ্জ্বলরূপে তৃপ্তি না পাইয়া চন্দ্রার যৌবনোন্মুখ শান্ত সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয়-লাভের জন্য উৎসুক হইল; বসন্তের উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন অপেক্ষা শারদ উষার স্নিগ্ধ কান্তি অধিক মনোরম বলিয়া মনে করিল।

রামরূপ এখন কৃষ্ণকান্তের সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা। রণজিৎ রায়ের নিকট কর্ম্মচ্যুত হইয়া সে কৃষ্ণকান্তের বিষয়-সম্পত্তি পরিদর্শনে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার চতুরতা, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণাবলী দর্শনে পার্ব্বতী তাহাকে আপনার সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রধান সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে মুগ্ধ ও বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল কারণে রামরূপ এখন বাটীর একজন পরিজনমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। কাজেই সে চন্দ্রাকে লাভ করিবার পক্ষে বিশেষ কিছু বাধা দেখিল না।

এই সময় হইতে রামরূপ কৌশলে চন্দ্রার হৃদয়

অধিকার করিতে চেষ্টিত হইল। ইহাতে মাতৃহীনা চন্দ্রা বিমাতার কঠোর শাসন হইতে অনেকটা রক্ষা পাইল। রামরূপ বাস্তু-স্নেহ ও করুণার প্রস্রবণ ছুটাইয়া ক্রমে তাহাকে বশ করিতে লাগিল। চেষ্টা সফল হইল। তাহার এই অযাচিত স্নেহ ও মমতার নিকট চন্দ্রা আপনাকে কৃতজ্ঞতার দৃঢ়পাশে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিল। কিন্তু হায়, অভাগিনী তখন বুঝিতে পারে নাই যে, এই স্নেহধারার অন্তরালে কি ভীষণ কালফণী অবস্থান করিতেছে। চতুরা পার্ব্বতী ইহা দেখিল, বুঝিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

শঙ্কর যখন নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রা আপনার কক্ষে গবাক্ষ-সমীপে বসিয়া তাহা দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে কত কথা—কত অতীতের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল। আজি কতদিন পরে সে শঙ্করকে দেখিল,—সেগুলা দিন নহে, যেন এক একটা যুগ। বাল্যের সহচর, জীবনের বন্ধু, সুখদুঃখের সাথী, প্রাণের আরাধ্য দেবতা শঙ্কর কত যুগ পরে আবার তাহার সম্মুখে আসিলেন। সেই শরতের শান্তপ্রভাত—সেই বিদায়ের দিন,—সেই প্রত্যাখ্যানের কঠোর স্মৃতি, সকলই চন্দ্রার মনে পড়িল। সে একবার মনে করিল,—"হায়, কেন সে দিন নিষ্ঠুর হৃদয়ে সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম?" কথাটা ভাবিয়া চন্দ্রার হৃদয়ে অনুতাপ আসিল। ভাবিল, এখন একবার ছুটিয়া গিয়া পায়ে পড়িয়া বলি, 'না না, তুমি আসিও।' কিন্তু চন্দ্রা তাহা করিতে পারিল না, সে শক্তি বা সাহস হইল না। তখন সে কেবল শঙ্করের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তার পর শঙ্কর নদীতীর ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ পথে অগ্রসর হইলেন। চন্দ্রা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তখন তাহার ব্যথিত হৃদয় ভেদ করিয়া একটা কাতরতার গভীর দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল। এবার চন্দ্রা আপনার কথা ছাড়িয়া শঙ্করের সুখদুঃখের ভাবনা ভাবিতে লাগিল। শঙ্করের দুঃখ-সুখ, শক্তি-গৌরব, কীর্ত্তি, যুদ্ধ, একে একে সকল কথাই ভাবিল। যুদ্ধের কথা ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠিল। হায়, কেন এ কালযুদ্ধ বাধিল? কেন শঙ্কর এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্বরূপ ভীষণ মৃত্যু-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন? তখন চন্দ্রার কল্পনানেত্রের সম্মুখে সেই ভীষণ যুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিকৃতি জাগিয়া উঠিল। সে সভয়ে দেখিল, যেন দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত রক্তপরিচ্ছদধারী অগণিত মুসলমান সেনা উলঙ্গ কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান, তাহাদিগের ভীমগর্জ্জনে রণস্থল প্রকম্পিত, শোণিত-স্রোতে সমরভূমি পরিপ্লাবিত। সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যপরিবেষ্টিত শঙ্কর একা দণ্ডায়মান; তাঁহার সর্ব্বশরীর রুধিরাক্ত, পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, আরক্তিম-লোচনদ্বয় সজল, মুখমণ্ডল ভীতি ও নিরাশার অন্ধকারে ব্যাপ্ত। মুহূর্ত্তে শঙ্কর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর।" সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীনার ন্যায় চন্দ্রাও কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কে আছ রক্ষা কর, শঙ্করকে রক্ষা কর।"

"আমি রক্ষা করিব।"

চমকিত হইয়া চন্দ্রা ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রামরূপ বলিতেছেন,—"আমি রক্ষা করিব।"

চন্দ্রা উৎফুল্ল-স্বরে বলিল,—"পারিবে?"

রামরূপ বলিল,—"পারিব। কিন্তু বল, তুমি আর কাঁদিবে না?"

চন্দ্রা নতমুখে উত্তর করিল,—"না।"

রাম। কিন্তু চন্দ্রা! এ কাজ বড় সহজ নয়, তবে যতই কঠিন হউক, তোমার জন্য আমি ইহা করিব। কিন্তু চন্দ্রা! তুমি কি মনে কর, কখনও শঙ্করকে পাইবে?"

চ। না!

রাম। তবে কেন কাঁদ চন্দ্রা?

চ। জানি না।

রাম। শঙ্কর বাঁচিলে তোমার লাভ কি?

চ। কিছুই না।

রাম। তবে কেন আমি এই দুষ্কর কার্য্যে অগ্রসর হইব?

চন্দ্রা কাতরদৃষ্টিতে রামরূপের মুখের দিকে চাহিল। রামরূপ বলিল,—"আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে পারিব না। আমি কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার চাই।"

চ। আমি দুঃখিনী, আমার কি আছে?

রামরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আমি কি সত্যই তোমার নিকট রাজৈশ্বর্য্য চাহিতেছি?"

চন্দ্রা একটু লজ্জিত হইল। সে রামরূপের মহত্ত্ব, উদারতা বুঝিতে পারিল, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া রামরূপের পদতলে বসিল। তার পর কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল,—"তুমি মহৎ, উদারহৃদয়, আমার আর কি আছে? আছে কেবল এই দুঃখময় জীবন; সেই জীবন আমি চিরদিনের জন্য তোমার—"

কথা সমাপ্ত না হইতেই বাহিরে একটা বিকট শব্দ উঠিল। চন্দ্রা ও রামরূপ ব্যস্তভাবে সেই দিকে চাহিল।

রামরূপ যখন চন্দ্রার কক্ষে প্রবেশ করে, তখন পার্ব্বতীর চতুর দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল। তাই সে আপনার হৃদয়ের সমস্ত বিষটা উদ্গীরণ করিয়া শঙ্করের হৃদয়ে ঢালিবার অভিপ্রায়ে শঙ্করকে বলিল,—"আইস।"

শঙ্করকে লইয়া পার্ব্বতী প্রফুল্ল-অন্তরে চন্দ্রার কক্ষের নিকটে গেল। অতি নিকটে গেল না, যেখানে দাঁড়াইলেই কক্ষের সমস্ত দেখা যায়, সকল কথা একটু একটু শুনা যায়, সেইখানেই গিয়া দাঁড়াইল। তার পর অবসর বুঝিয়া কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল,—"ঐ দেখ।"

শঙ্কর ব্যগ্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, চন্দ্রা রামরূপের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়াছে; শুনিতে পাইলেন, চন্দ্রা বলিতেছে,—"সেই জীবন আমি চিরদিনের জন্য তোমার——"

শঙ্কর আর কিছু শুনিতে পারিলেন না, শুনিবার শক্তিও তাঁহার রহিল না। তিনি উন্মাদের ন্যায় বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"যাদুকরি!"

শঙ্কর পার্ব্বতীকে ঠেলিয়া দিয়া কম্পিতপদে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন। পার্ব্বতী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### সহধর্ম্মিণী।

পরদিন সংবাদ আসিল, ফৌজদার সাহেব চারি হাজার সৈন্য ও দুইটা কামান লইয়া সজ্জিত হইতেছে, শীঘ্রই আক্রমণ করিবে। তখন শঙ্কর সৈন্যসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন, রূপনাথ সে কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া কেবল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আক্রমণের কথাটা শীঘ্রই গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে তাহা অতিরঞ্জিতভাবে চারিদিকে আলোচিত হইতে লাগিল। চারি হাজার সৈন্য ক্রমে মুখে মুখে সাত হাজার হইল, সাত হাজার হইতে দশ হাজারে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইটা কামানও দশটায় পরিণত হইয়া গ্রামে প্রচারিত হইল। গ্রামবাসী গৃহস্থগণের ভয়ের সীমা রহিল না।

কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া কমলার মাতার কর্ণে আরও একটু অতিরঞ্জিতভাবে প্রবেশ করিল। দশ হাজার সৈন্য, দশটা কামান ছাড়া তিনি গোপনে আরও শুনিলেন যে, ফৌজদার ঘোষণা করিয়াছেন, যে রূপনাথের মাথাটা আনিতে পারিবে, সে দুই হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। শুনিয়া কমলার মাতা ভয়ে শুকাইয়া গেলেন। তিনি তখন বাটীতে গিয়া কন্যাকে বলিলেন,—"এ সব কি শুন্‌ছি?"

কমলা বলিল,—"কি মা?"

ক-মা। তোকে কতদিন বলেছি, বামুনের ছেলে তপ-জপ করুক, আপনার সংসারধর্ম্ম দেখুক; তা নয়, কেবল লড়াই আর লড়াই।

ক। তাতে হয়েছে কি?

ক-মা। হবে আর কি? বামুনের ছেলের কি এ সব সয়? দিন নাই, রাত নাই, ঘর-সংসার ফেলে কেবল মার্ মার্ কাট্ কাট্। এ সব ছোট লোকের কাজ কি বামুনের সয়?

ক। কি হয়েছে, তাই ভেঙ্গেই বল না?

ক-মা। হয়েছে মাথা আর মুণ্ডু। আমার তো আর মরণ নাই, তাই সব ছেড়ে এখানে এই সব দেখতে এসেছি।

কমলা মাতার স্বভাব জানিত। সে আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তখন তাহার মাতা কতকগুলা আক্ষেপের পর অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে শ্রুতকাহিনী সমূহ একে একে কন্যাকে বলিলেন; শুনিয়া কমলা মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল,—"তার আর কি হয়েছে মা! যুদ্ধ করিতে গেলেই মরিতে হয়, এ তো আর নূতন কথা নয়।"

মাতা বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু তোর মত পাহাড়ে মেয়ে আর দুটি নাই।"

কমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি করি মা, যেমন দেশ, তেমনই চল্‌তে হবে। পাহাড়ে মেয়ে না হ'লে সে দিন কি মান-প্রাণ বাঁচিয়ে আস্‌তে পার্‌তাম?"

মাতা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তাই ব'লে কি চিরকালটা খাঁড়া হাতে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে হবে? দেখ্, বুড়ীর কথা শোন্, এখনও জামাইকে বারণ কর, বুঝিয়ে শুঝিয়ে ফেরা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছেড়ে বামুনের ছেলে আপনার সংসারধর্ম্ম করুক।"

ক। তুমি মনে কর মা, আমি বারণ করি না। বারণ করি, কিন্তু তিনি পুরুষমানুষ, আপনার বল বুঝেন। তিনি কি আর আমার কথায় চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাক্‌বেন?

ক-মা। তুই যদি মেয়ের মত মেয়ে হতিস্‌, তবে তোর বাপকে থাকৃতে হতো।

ক। কিন্তু মা, তা আমি পার্‌বো না।

ক-মা। তা তো আমি জানি. যেমন দেবা, তেমনি দেবী। সে রণভৈরব, আর তুই রণচণ্ডী; কেবল ভেবে মরি আমি।

ক। তুমি কেন ভাব মা?

ক-মা। আমি পোড়াকপালী যে, ঐ মা হয়েই মরেছি। তা নইলে আর আমার ভাবনা কিসের? তোকে পেটে ধরেছি ব'লেই তো আমার এই ছট-ফটানি। তোদের পায়ে একটা কাঁটা ফুটবে, সেটা আমার বুকে শেলের মত বিঁধবে। তাই একবার না শুন্‌লেও আমি পাঁচবার বলি। যম আমায় ভুলে রয়েছে. তাই তোদের জ্বালাতন করি।

মাতার নয়নে অভিমানের অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। কমলা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল,—"রাগ কোরো না মা, এবার ভাল ক'রে বলব।"

মাতা আর কিছু বলিলেন না, তিনি নয়নে অঞ্চল চাপিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন কমলা মনে মনে বলিল, "দেবতার কার্য্যে এ আবার কি বাধা ঠাকুর?"

তিন দিন পবে রূপনাথ গৃহে ফিরিলেন। তখন কমলা তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া রূপনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়, তবে দশ হাজার সৈন্য নহে, প্রায় চারি হাজার হইবে, আর কামানও দশটা নহে, দুইটা। মাথার পুরস্কারের কথাটা বোধ হয় সমস্তই মিথ্যা।"

কমলা বলিল,—"মা তো শুনে অবধি কাঁদাকাটা করছেন।"

রূপনাথ বলিলেন,—"কাঁদবাব কথা বটে, কিন্তু তুমি কি বল কমলা?"

কমলা বলিল,—"আমার আর বলিবার কি আছে? তোমার কার্য্য তুমি করিবে, তাহাতে বাধা দিবার কে? তবে মার চোখে জল দেখ্‌লে বড় কষ্ট হয়।"

রূপ। উপায় থাকিলে মার কষ্ট নিবারণ করিতাম, কিন্তু এখন আর উপায় নাই। এই যুদ্ধটা শেষ হইলেই মাকে যেরূপে হউক, কাশী পাঠাইয়া দিব।

ক। এখন কি আর যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই?

রূপ। না, আমি যুদ্ধ ত্যাগ করিলেও তুমি কি মনে কর, ফৌজদার আমাকে ছাড়িয়া দিবে? কখনই না। তবে কমলা! ফৌজদারের শূলে মরার অপেক্ষা দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া মরা ভাল নয় কি?

ক। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার ভালমন্দ কি আমি বেশী বুঝি? আমি কেবল জানি, তুমি আমাকে মরিতে বারণ করিয়াছ, তাই এখনও বাঁচিয়া আছি; যে দিন বলিবে, সেই দিন মরিব।

রূপনাথ নীরব রহিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হায় কমলা! তোমার নারীহৃদয়ে যে শক্তি, যে সাহস আছে, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালার পুরুষহৃদয়ে তাহার এক কণাও দেখিতে পাই নাই কেন? এই পরপদাহত লাঞ্ছিত জাতি মরিতে এত ভয় করে কেন? অর্দ্ধমৃত বাঙ্গালীর বাঁচিতে এত সাধ কেন?"

কমলা বলিল,—তোমাদের কত সৈন্য আছে?"

রূপ। দুই হাজার।

ক। এই দুই হাজার সৈন্য লইয়া কিরূপে চারি হাজার সিপাহীকে পরাজয় করিবে?

রূপ। কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পাণ্ডবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কিরূপে জয়লাভ করিল কমলা?

ক। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহায় ছিলেন।

রূপ। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহায় ছিলেন না, কৃষ্ণ ধর্ম্মের সহায় ছিলেন। যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে কৃষ্ণ। যেখানে ন্যায়, সেইখানে কৃষ্ণ; যেখানে সত্য, সেই-খানে কৃষ্ণ। আর যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই জয়। তবে ভয় কি কমলা?

কমলা আর কোন উত্তর করিল না। রূপনাথ ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন। কমলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "যেখানে সত্য, সেইখানে কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে জয়। তবে ভয় কি?"

হায় কমলা! ইহাই কি তোমার স্বামীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা? অথবা তুমি রূপনাথের সহ-ধর্ম্মিণী। কিন্তু তোমার ন্যায় রমণী আর কি বাঙ্গালায় আসিবে না?

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### সন্ধি-পূজা।

যুদ্ধারম্ভের দুই দিন পূর্ব্বে রূপনাথ নব-প্রতিষ্ঠিত শঙ্করপুর গ্রামে একটা মেলা বসাইবেন। অনেকেই এরূপ সময়ে মেলার আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইল। মেলা দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে দর্শকবৃন্দ দলে দলে আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্ত্রী, বালক বা বৃদ্ধ একজনও ছিল না। তাহারা সকলেই

বলিষ্ঠ, সাহসী ও উদ্যমশীল যুবক। রূপনাথ পূর্ব্ব হইতেই দর্শকদিগের জন্য বাসস্থান ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মেলায় যে দর্শনযোগ্য এমন কিছু ছিল, তাহা নহে, তথাপি দিবারাত্রি দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কিন্তু তথা হইতে কেহ ফিরিল না। কেবল দুই এক জন সুচতুর ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই অসাময়িক এই উৎসবের কারণ বুঝিতে পারিল না। দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে দর্শকের আগমন-সংখ্যা কিছু কমিল।

তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে রুস্তম আলি প্রায় চারি হাজার সৈন্যসহ গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই সৈন্যশ্রেণী লইয়া তিনি একেবারে দেবীগড়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবেন, গ্রামখানাকে পদদলিত করিয়া একেবারে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিবেন। সেইরূপ বাসনা ও উৎসাহ লইয়াই তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বদিবসের রাত্রিতে কৃষ্ণকান্ত গিয়া তাঁহার এ শুভ ইচ্ছায় বাধা দিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, শঙ্করপুর গ্রামখানা কেবল পাইক সৈন্যে পরিপূর্ণ। একেবারে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিলে তাহারা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে।

রুস্তম আলি হাসিয়া বলিলেন,—একখানা গ্রামে কয়টা লোক আছে? আমার চারি হাজার সৈন্য।

কৃষ্ণকান্ত বিশেষরূপে তাঁহাকে মেলার ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া রুস্তম আলি বলিলেন,—"তবে আগেই শঙ্করপুর ধ্বংস করিব।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"তাহা হইলে আক্রমণকালে শঙ্করের সৈন্য পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবে।"

রুস্তম আলি বলিলেন,—"সে দিকে একটা কামান থাকিবে।"

ফৌজদার সাহেবের যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞতা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিলেন। তিনি তখন পার্শ্বদেশ হইতে শত্রুর আক্রমণ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর এবং তাহা যে কেবল একটা কামানের সহায়ে রোধ করা অসম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। রণকৌশলানভিজ্ঞ গর্ব্বোদ্ধত রুস্তম আলি তাহা না বুঝিলে তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়ক জনাব আলি বুঝিতে পারিলেন। তখন অনেক পরামর্শের পর উভয় দিক্ হইতে দূরে থাকিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য স্থির হইল।

পরদিন সেই ভাবেই আক্রমণ করা হইল। সম্মুখে দেবীগড়া এবং দক্ষিণে শঙ্করপুর গ্রাম—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী রহিল। বামপার্শ্বে কিছু দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলাবৃত একখানা গ্রাম, পশ্চাতে ক্রোশব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তর। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ সজ্জিত হইল, ব্যূহের বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে দুইটি কামান স্থাপিত হইল। সেই সুসজ্জিত সৈন্যশ্রেণী দর্শনে শঙ্কর বুঝিলেন, এইবার ভাগ্যপরীক্ষা, হয় উত্থান, নয় পতন।

কিন্তু শঙ্কর এ জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনিও সশস্ত্র দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইল, উভয় পক্ষই স্ব স্ব বন্দুক তুলিয়া আক্রমণোদ্যত হইল। তখন হিন্দুসৈন্যমণ্ডলী হইতে সেই রণপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্বিসহস্র কণ্ঠে নিনাদিত হইল,—"জয় জগদীশ হরে!" সঙ্গে সঙ্গে "আল্লা হো আক্‌বর" শব্দে বিপক্ষপক্ষ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। উভয়শব্দে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। তার পর অনলোদ্গারী আগ্নেয়াস্ত্রের ভীমগর্জ্জন, অস্ত্রের ঝনৎকার, বীরের হুঙ্কার, আহতের আর্ত্তনাদ মিলিত হইয়া রণস্থল এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই কৃতান্তের লীলাস্থলে উন্মত্ত সৈন্যগণ সংহারমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কেবল গগন বিদীর্ণ করিয়া শব্দ উঠিতে লাগিল,—"জয় জগদীশ হরে!"

ক্রমে যুদ্ধস্থল আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ হইতে কামানের জলন্ত গোলা আসিয়া হিন্দু সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। সেই অগ্নিবৃষ্টিতে দলে দলে হিন্দুসৈন্য পড়িল। কিন্তু ইহাতে তাহারা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইল না বা এক পদও পশ্চাতে হটিল না। পশ্চাৎ হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া আহতের স্থান সম্পূরণ করিতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। হিন্দুপক্ষ হইতেও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষেই অনেক লোক হতাহত হইল। ক্ষতিটা হিন্দুপক্ষেই অধিক। ক্রমে যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রান্তর আচ্ছন্ন হইল, তখন সে দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত হইল। রণক্লান্ত সৈন্যগণ এক রাত্রির জন্য বিশ্রামলাভের অবসর পাইল। কিন্তু আজিকার যুদ্ধে রূপনাথকে কেহ দেখিতে পায় নাই। এ দিকে যখন ভীষণ মৃত্যুক্রীড়া চলিতেছিল, তখন রূপনাথ শঙ্করপুরে উৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। তার পর যখন যুদ্ধ শেষ হইল, যখন নিশার ঘোর অন্ধকারে নির্জ্জন রণক্ষেত্র হইতে আহতের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন কয়েকজন অনুচরের সহিত রূপনাথ সেই শবরাশিসমাচ্ছন্ন রণভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তার পর আলোক-হস্তে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া শত্রুমিত্র উভয় পক্ষে আহতগণের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন। বহু

পরিশ্রমের পর আহত ও মুমূর্ষু সৈনিকগণকে সঙ্গে লইয়া শঙ্করপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলকে রক্ষা করিয়া তাহাদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই যত্ন ও সেবায় আহত শত্রুপক্ষীয়গণ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইল, মুমূর্ষুগণ মুহূর্ত্তের জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া শেষ নিশ্বাস টানিতে টানিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে আল্লাকে ডাকিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রাত্রিশেষে যখন সৈন্যগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে, রূপনাথ তখনও আহত যন্ত্রণাকাতর সৈনিকগণের পার্শ্বে বসিয়া জয়দেবের সুধাসমুদ্র উদ্বেলিত করিতে করিতে মধুর-কণ্ঠে গাহিতেছেন,—

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল এ,
কলিত ললিতবনমাল, জয় জয় দেব হরে।
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন এ,
মুনিজনমানসহংস জয় জয় দেব হরে।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন এ,
যদুকুলনলিনদিনেশ, জয় জয় দেব হরে।
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন এ,
সুরকুলকেলিনিদান, জয় জয় দেব হরে।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন এ,
ত্রিভুবনভবননিধান, জয় জয় দেব হরে।
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ এ,
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর, জয় জয় দেব হরে।
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় এ,
কুরু কুশলং প্রণতেষু, জয় জয় দেব হরে॥"

সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে সুধাবৃষ্টি হইতেছে, মৃদু-বায়ু-প্রবাহে তাহা দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে, নৈশ-গগনে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে আর আহত মুমূর্ষু সৈনিক মধুর-কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই সুধাধারা পান করিতে করিতে ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া চিরশান্তির কোমল অঙ্কে ঢলিয়া পড়িতেছে। সেই শান্তিধামে অনন্তের পথে দাঁড়াইয়াও তাহারা যেন অনন্তকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনিতেছে,— "জয় জয় দেব হরে।"

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

### প্রতিষ্ঠা।

পরদিন প্রভাতে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণ সমবেত হইয়া আবার পরস্পরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই হিন্দু-সৈন্যগণ ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিল, বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পশ্চাতে হটিল। এবার বিপক্ষগণ আরও উৎসাহিত হইয়া দ্বিগুণ বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সেই ভীম আক্রমণে হিন্দুসৈন্যগণ ক্রমেই পশ্চাতে হটিতে লাগিল, বিপক্ষগণও ক্রমেই অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ আক্রমণ করিতে করিতে উৎসাহদৃপ্ত বিপক্ষগণ যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিল, তখন হিন্দুসৈন্যগণ সহসা একবার অটল পর্ব্বতবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া বিপক্ষগণ একটু বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্ত পরেই তাহারা আবার ভীমবেগে অগ্রসর হইয়া শত্রুবিনাশে উদ্যত হইল। তখন সেই স্থির হিন্দুসৈন্যমণ্ডলী হইতে অগ্রগামী হইয়া আবদুল চীৎকার করিয়া বলিল,—"কে মরিতে পার, আইস।" কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল বিপক্ষের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ কামান লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে ছুটিল, পশ্চাতে আরও কয়েকজন সৈন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

কিয়দ্দূর না যাইতেই ভীমরবে কামান গর্জ্জিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা জলন্ত গোলা আসিয়া অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে পড়িল। তৎক্ষণাৎ দুই জন সৈন্য ধরাশায়ী হইল, কয়েকজন ভীত হইয়া পশ্চাতে ছুটিল, কেবল দুই জন মাত্র সৈন্য আবদুলের পশ্চাৎ ছুটিল। উভয়পক্ষই বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিল। দ্বিতীয়বার কামান-গর্জ্জনের পূর্ব্বেই আবদুল নক্ষত্র-গতিতে গিয়া কামানের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে পাঁচজন সৈন্য দাঁড়াইয়া কামান দাগিতেছিল। আবদুল উপস্থিত হইয়াই তরবারির আঘাতে একজনকে ধরাশায়ী করিল। অমনই চারিখানা অসি তাহার মস্তকের উপর উত্থিত হইল। পশ্চাদাগত সৈন্যদ্বয় উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুই জনের শিরশ্ছেদন করিল, আবদুলের তরবারিও এক জনের উপর পড়িল। অবশিষ্ট একখানা তরবারি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও আবদুলের স্কন্ধে পড়িল, কিন্তু তাহাতে আঘাত সামান্যই লাগিল। আবদুল সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আঘাতকারীকে ধরাশায়ী করিল। দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া কয়েকজন মোগলসৈন্য সেই দিকে ছুটিল। কিন্তু তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই কামানের মুখ ফিরিয়া গেল। এবার মুসলমানসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া ভীমরবে কামান গর্জ্জিল। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ

হইতে শব্দ উঠিল,—"জয় জগদীশ হরে!" বিস্মিত স্তম্ভিত বিপক্ষ-সৈন্যগণ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পশ্চাতে পিপীলিকাশ্রেণীবৎ দলে দলে পাইক সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। বিপক্ষগণ প্রমাদ গণিল।

তখন উভয় দিক্ হইতে শঙ্কর ও রূপনাথ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শত্রুসৈন্য নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যুদ্ধ ত্যাগপূর্ব্বক পলায়নের জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই বাধা পাইল। সে দিকে আবদুল দাঁড়াইয়া ঘন ঘন গোলাবর্ষণ করিতেছে, শতাধিক সৈন্য কামানের মুখ রক্ষা করিতেছে। সে দিকে বাধা পাইয়া বিপক্ষগণ বামদিকে ছুটিল। অমনই বামপার্শ্বস্থ জঙ্গলাবৃত গ্রাম হইতে শত শত পাইক সৈন্য বাহির হইয়া তাহাদিগের উপর পড়িল। বিপক্ষগণ হতাশ্বাস হইয়া সে দিক্ হইতেও ফিরিল। এবার তাহারা জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত ফিরিয়া দাঁড়াইল। আর একবার "আল্লা হো আক্‌বর" রবে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া সিংহবিক্রমে শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। সে আক্রমণের বেগে হিন্দুসৈন্য অস্থির হইয়া উঠিল। তখন রূপনাথ সেই ক্ষুব্ধ সাগরবৎ সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—"জয় জগদীশ হরে।" অমনই গগন বিদীর্ণ করিয়া চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, "জয় জগদীশ হরে!" হিন্দুগণ আবার প্রবল উৎসাহের সহিত শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত প্রবলভাবে যুদ্ধ চলিল। তাহার পর চতুর্দ্দিকের ভীষণ আক্রমণে বিপক্ষদল ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি তাহারা দুর্দ্ধর্ষ মোগল বীর্য্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধত্যাগ করিল না। তার পর যখন একে একে অর্দ্ধাধিক সৈন্য ধরাশায়ী হইল, তখন সেনানায়ক জনাব আলি বাধ্য হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনর্থক সৈন্যক্ষয় অবিধেয় বোধে তিনি রূপনাথের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। রূপনাথ শত্রুগণের কামান, বন্দুক প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকারে গা ঢাকিয়া রস্তম আলি দেড় সহস্র মাত্র সৈন্য সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে হিন্দুসৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এবার পরাজিত অপমানিত রস্তম আলি সম্মুখ আক্রমণে সাহসী না হইয়া গুপ্তভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি রণজিৎ রায়ের জমীদারীর প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে স্থির করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা প্রজাগণের গৃহ লুণ্ঠন করিল, গ্রাম জ্বালাইয়া দিল, সতীর সতীত্ব নাশ করিতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন শঙ্কর এক সহস্র সৈন্য লইয়া রাজনগর আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রস্তম আলি রাজনগর ত্যাগ করিলেন। শঙ্কর ইহাতেই নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি সৈন্যসহ ফৌজদার সাহেবের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রস্তম আলি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া আশ্রয় লইলেন, শঙ্কর সেইখানে গিয়াই তাঁহাকে তাড়া করিতে লাগিলেন, এইরূপে পশ্চাদতাড়িত হইয়া রস্তম আলি দামোদর নদ পার হইলেন। শঙ্কর নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিলেন।

দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল, অত্যাচার অবিচার দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। প্রজাগণ বহুকাল পরে আবার কিছু দিনের জন্য স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করিতে করিতে শান্তির সুশীতল ছায়ায় বিশ্রামলাভ করিবার অবসর পাইল। ইহার পর রূপনাথ রণজিৎ রায়কে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সকলেই তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইল। কেবল কৃষ্ণকান্ত তাহা স্বীকার করিলেন না। আবদুল তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া স্বীকার করাইতে চাহিল, কিন্তু রূপনাথ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাঙ্গালী বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার করিলে এ রাজ্য টিকিবে না।"

আবদুল বলিল,—"কিন্তু এই বাঙ্গালীই শেষে সর্ব্বনাশ করিবে।"

রূপনাথ বলিলেন,—"বাঙ্গালী বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিলে তুমি আমি কি করিতে পারি আবদুল?"

আবদুল বলিল, "আগে হইতেই সাবধান হইলে হয় না?"

রূপনাথ বলিলেন,—"না আবদুল, তাহা হয় না। তাহা হইলে অনেক কৃষ্ণকান্তকে ধ্বংস করিতে হয়।"

আবদুল ক্ষুব্ধস্বরে বলিল,—"তবে এত করিয়া এমন সোনার রাজ্য গড়িতেছ কেন ঠাকুর?"

রূপনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"কে গড়ে আবদুল? যাঁহার খেলা-ঘর, তিনিই গড়িতেছেন, আবার ইচ্ছা হইলে তিনিই ইহা ধ্বংস করিবেন। তুমি আমি গড়িবার ভাঙ্গিবার কে আবদুল?"

এ কথার উত্তর আবদুল কি দিবে? সে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন রূপনাথ

ঊর্দ্ধে চাহিয়া যুক্তকরে বলিলেন,—"ঠাকুর! তোমার সাধ হইয়াছে, তাই এই সোনার রাজ্য গড়িতেছ: আবার তোমার ইচ্ছাতেই ইহা একদিনে ধূলিসাৎ হইবে। আমি তাহার কি করিতে পারি? সংসারের এই ক্ষুদ্র বালুকাকণা তোমার সেই বিরাট্ সৃষ্টিলয়শক্তির কি সহায়তা করিবে? একবিন্দু বারি দ্বারা অনন্ত সাগরের কি হ্রাসবৃদ্ধি হইবে? তোমার মহীয়সী ইচ্ছার নিকট ক্ষুদ্র মানব আমি কে?"

# তৃতীয় খণ্ড

## বিসর্জ্জন

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ো সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন! ॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"

(গীতা ৬। ৪৩, ৪৫।)

### প্রথম পরিচ্ছেদ

অভিমান ও স্নেহ।

প্রণয়ে অবিশ্বাসের তুল্য মনুষ্যের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। যে ধৈর্য্যশালী ব্যক্তি সংসারের শত যন্ত্রণা অকাতরে বুক পাতিয়া সহ্য করিতে পারে, সেও এই প্রণয়ে সন্দেহ—ভালবাসায় অবিশ্বাস দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়া পড়ে, তাহার চির-সহনক্ষম হৃদয় এই কঠোর আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার মত সংসারের নির্ম্মম কশাঘাত বুঝি আর কিছুই নাই। সংসারের অবলম্বন, বার্দ্ধক্যের সহায় একমাত্র পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া কয়জন জনকজননী আত্মহত্যা করিয়াছে? সুখদুঃখসঙ্গিনী হৃদয়ানন্দ-দায়িনী প্রণয়িনীকে অকালে কালের হস্তে ডালি দিয়া কয়জন পুরুষ মৃত্যুর করাল গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিয়াছে? ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনায় প্রবলের কঠোর অত্যাচারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কয়জন মানব সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়াছে? কিন্তু যে একবার হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া প্রণয়ের পূজা করিয়াছে, সে যদি সেই ভালবাসার প্রতিদানে এতটুকুও অবিশ্বাসের রেখা দেখিতে পায়, সেই প্রণয়ের মহাপূজায় একটু অঙ্গহানি দর্শন করে, তবে তাহার সমস্ত ধৈর্য্য, সমস্ত সুখ, সমস্ত শক্তি এক মুহূর্ত্তে কোথায় উধাও হইয়া যায়, সন্দেহের একটা বিকট ছায়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া সে উন্মাদের ন্যায় চিরবিস্মৃতির গর্ভে আত্মগোপন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাহার মত দুঃখী সংসারে আর নাই।

শঙ্কর এখন বড় দুঃখী। তাঁহার আশা গিয়াছে, আনন্দ গিয়াছে, সুখ গিয়াছে, আছে কেবল নিদারুণ যন্ত্রণাকাতর শূন্য প্রাণ। চন্দ্রাকে তিনি হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, নিভৃত মানস-সিংহাসনে তাহার চিরানন্দময়ী মূর্ত্তিখানি বসাইয়া কল্পনার আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তৃপ্তির অমৃতধারা পান করিয়া কণ্টকিত সংসারপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু যে দিন তিনি রামরূপের পদতলে বসিয়া চন্দ্রাকে হৃদয় সমর্পণ করিতে দেখিলেন, যে অশুভলগ্ন হইতে তাঁহার প্রণয়ে সন্দেহ আসিল, ভালবাসায় দৃঢ় অবিশ্বাস হইল, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তে হইতে তিনি সকল সুখ, সকল আনন্দ, সকল আশায় বঞ্চিত হইলেন। রহিল কেবল ভালবাসার তীব্র কশাঘাত, নিরাশার উচ্চ হাহাকার, ব্যথিত যন্ত্রণা-পীড়িত জীবন। এখন তাঁহার দৃষ্টিতে সংসার মরুভূমি, লোকালয় শুষ্ক শ্মশান, আনন্দের কলধ্বনি কঠোর আর্ত্তনাদ।

শঙ্কর যদি আপনার জীবন-তরণীর স্বাধীন কর্ণধার

হইতেন, তবে তিনি কোন্ দিন তাহাকে নিরাশ-বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। কিন্তু এখন তিনি স্বাধীন নহেন, রূপনাথ এখন তাঁহার পরিচালক। তাই তিনি অনিচ্ছা-সত্বেও এই দুর্ভর জীবনভার-বহনে বাধ্য হইলেন এবং রূপনাথের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই যন্ত্র-পরিচালিত পুত্তলিকার ন্যায় কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। উত্তাল তরঙ্গমালাময় কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তিনি স্মৃতির সন্দেহের সবিষ-দংশনজ্বালা ভুলিতে চেষ্টা করিলেন।

শঙ্কর একটা বিষয়ে বড় সাবধান হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা, প্রাণের কাতর হাহাকার কাহা-কেও শুনিতে দিলেন না, রূপনাথকেও না। তিনি কেবল অগ্নিগর্ভ শমীর ন্যায় আপনার হৃদয়-বহ্নিতে আপনিই নীরবে পুড়িতে লাগিলেন। সে অগ্নির তীব্রশিখা কেহ দেখিল না, সে দহনের মর্ম্মকাতরতা কেহ শুনিতে পাইল না। সকলেই তাঁহার একটা দৈহিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; কিন্তু পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

সকলের নিকট হৃদয়ভাব গোপন করিলেও এক-জনের নিকট শঙ্কর ধরা পড়িলেন। সে আবদুল। প্রভুভক্ত আবদুল প্রভুর হৃদয়ভাব সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিল। সে বুঝিল, প্রভুর হৃদয়ে একটা তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে; কিন্তু সেই ঝটিকার উৎপত্তিস্থান কোথায়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল না। তবে কৃষ্ণকান্তের বাটীর নিকট হইতেই যে ঝড়ের বেগটা উঠিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু অনেক অনুসন্ধা-নেও আবদুল ঝটিকার মূল কারণটা ঠিক করিতে পারিল না। সে তখন যে দিক্ হইতে ঝড় আসিয়াছে, সেই দিকটায় একটু খরদৃষ্টি রাখিল।

আবদুল দেখিত, শুব্ধ নিশীথে জগৎ যখন সুষুপ্ত, তখন শঙ্কর একা বাটীর বাহির হইতেন, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণকান্তের বাটীর সম্মুখে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইতেন। তার পর স্থির-দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ অট্টালিকার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইতেন। অমনই তাঁহার বদন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত, ভ্রূ কুঞ্চিত হইত, নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিত, দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত হইতে থাকিত, হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইত। তখন তিনি উভয় হস্তে বক্ষ চাপিয়া উন্মাদের ন্যায় অধীর-পদক্ষেপে সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইতেন। কখনও বা শান্ত-সুন্দর প্রভাতে একা গিয়া নদীকূলে বসিতেন, বসিয়া বসিয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিতেন, অশ্রুধারায় তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত হইত। তার পর সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিয়া যাইতেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আবদুল বড় অস্থির হইয়া পড়িল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত, প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের ব্যথাটা জানিয়া লইবে; কিন্তু তাহার এতটা সাহস হইত না। তাই সে কেবল সতর্ক দৃষ্টিতে প্রভুর গতিবিধি লক্ষ্য করিত।

এইরূপে যখন শঙ্করের অসহ্য দিনগুলা নীরবে কাটিয়া যাইতেছিল, তখন সহসা একদিন কৃষ্ণকান্ত আসিয়া রণজিতের নিকট একটা প্রস্তাব উত্থাপন করি-লেন। শঙ্করের সহিত চন্দ্রার বিবাহ দিবার নিমিত্ত তিনি রায় খুড়াকে ধরিয়া বসিলেন। রণজিৎ পূর্ব্ব হইতে এ প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন, এক্ষণে আবার কৃষ্ণ-কান্তের অনুনয় শ্রবণে তাঁহার সরল হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি অকপট-চিত্তে ইহাতে সম্মতিদান করিলেন। কথাটা ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল; যে শুনিল, সে-ই আনন্দ প্রকাশ করিল। কেবল রূপনাথ আন-ন্দিত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণকান্তের একটা চক্রান্ত আছে।

কথাটা শঙ্করও শুনিলেন। তাঁহার ক্রোধ ও বির-ক্তির সীমা রহিল না। তিনি জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে আসিয়া অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলিলেন,—"আমি বিবাহ করিব না।"

রণজিৎ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—তদ্গতপ্রাণ শঙ্কর লজ্জা-সঙ্কোচশূন্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে বলিতে সাহস করিল, "আমি বিবাহ করিব না।" তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কেন?"

শঙ্কর বলিলেন,—"আমার ইচ্ছা।"

বৃদ্ধের হৃদয়ে একটা দারুণ আঘাত লাগিল। তথাপি তিনি বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে বাক্য দিয়াছি?"

শঙ্কর নীরস-কণ্ঠে বলিলেন,—"সে জন্য আমি দায়ী নহি; আমি এ বিবাহ করিব না।

শঙ্করের হৃদয়ে তখন ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতে-ছিল, যে যন্ত্রণায় তিনি উন্মাদপ্রায় হইয়া কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই কঠোর উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। শঙ্কর দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখন চিরপরিচিত সংসারটা রণজিতের সম্মুখে উপহাসের একটা অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল, অভিমানের একটা তীব্র কশাঘাত আসিয়া তাঁহার মর্ম্মে প্রহৃত হইল। বৃদ্ধ বুঝিলেন, তিনি এখন সংসারপথের একজন শ্রান্ত পথিক, আর শঙ্কর

উন্নতশীর্ষ বিজয়ী যুবক। তাঁহার অবসন্ন হৃদয় মথিত করিয়া অভিমানের একটা দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল।

পরদিন রায় মহাশয় শঙ্করকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,—"শঙ্কর! আমাদের সংসারের নিকট বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা কখন দেখি নাই—দেখিবার আশাও করি নাই, তাহাই আজি দেখিলাম। এই শেষ-বয়সে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও যাহা দেখিলাম, তাহাতে আরও কিছুদিন বাঁচিতে সাধ হয়। কিন্তু সে সাধ বৃথা। আমার কালের ডাক পড়িয়াছে, এ সময়ে আমি তোমাদের নিকট ছুটী চাই।"

শঙ্কর জ্যেষ্ঠতাতের অভিমান বুঝিলেন। অনুতাপে—লজ্জায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অশ্রুপ্লাবিত-নয়নে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রণজিৎ তাঁহার মস্তকে সস্নেহে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"কি করিব শঙ্কর! কাল কাহারও কথা শুনে না! নতুবা এমন সোনার রাজ্য ছাড়িয়া কি রণজিৎ যাইতে চাহিত? তুমি বালক হইলেও বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, কার্য্যক্ষম্। তুমি চেষ্টা করিয়া নিজের হাতে যে রাজ্য গড়িয়াছ, নিজেই তাহার ভার গ্রহণ কর। আমাকে শেষ কয়দিন পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে দাও।"

শঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে জ্যেষ্ঠতাতের পাদমূলে বসিয়া পড়িলেন। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে কি জন্য এত কষ্ট করিলাম? আমার সাধ্য কি, এ ভার একদিনের জন্যও বহন করি। এ সময়ে আপনি চলিয়া যাইলে এ রাজ্য যে একদিনও টিকিবে না?"

রণজিৎ শঙ্করের হাত ধরিয়া তুলিলেন। বলিলেন, —"কেন শঙ্কর! তুমি তো এখন আর অক্ষম নও?"

শঙ্কর বলিলেন,—"সত্য, কিন্তু আমার সে ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল? কাহার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া আমার ক্ষুদ্রশক্তি এই দুর্লভ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইল? আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন, আপনাকেই আমার মাতা, পিতা—আমার আরাধ্য দেবতা বলিয়া জানি; আপনারই স্নেহে—আপনারই করুণায় অনাথ শিশু আজি সংসারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে; আপনারই অমোঘ আশীর্ব্বাদে সে এই মহাশক্তি লাভ করিয়াছে। আপনি কি মনে করেন, আপনাকে হারাইয়া শঙ্কর একদিনের জন্যও সংসারে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে? সব যাইবে—এত দিনে, এত চেষ্টায় তিল তিল করিয়া যে মহাসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিবেন, আপনার অভাবে তাহা একদিনেই ধূলিসাৎ হইবে; আপনার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।"

অশ্রুপ্রবাহে শঙ্করের বক্ষঃপ্লাবিত হইল। রণজিৎ আর থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার অভিমান, ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল, তাঁহারও নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি আবেগভরে শঙ্করকে বক্ষে চাপিয়া বলিলেন,—"না শঙ্কর! আমি যাইব না। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, দেশের সেবাই আমার তপস্যা, জন্মভূমিই আমার বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর আমি —আর কোন্ ফলের আশায় কোন্ তীর্থে যাইব শঙ্কর?"

বৃদ্ধের অশ্রুধারায় শঙ্করের মস্তক সিক্ত হইতে লাগিল। শঙ্কর তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সানন্দে প্রস্থান করিলেন। রণজিৎ মনে মনে বলিলেন,—"হায়, যদি আর একবার অতীত জীবনটা ফিরিয়া পাইতাম?"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### বিবেক ও মোহ।

অনেকের এমন একটা সময় আসে, যখন বিবেক বলে, যা হবার হয়েছে, আর কেন, ফিরে চল। মন বলে, "তাও কি হয়, যখন এতদূর আসা হয়েছে, তখন শেষটাই দেখা যাক্।" বিবেক বলে, "কিন্তু শেষ দেখিতে এ দিকে আর যে শেষ থাকে না।" মন বলে, "তাতে আর কি হবে, এখন ফিরলে লোকে হাসবে।" বিবেক বলে, "হাসে হাসুক, ক্ষতি কি, আপনার ভাল-মন্দ তো দেখ্‌তে হবে।" মন বলে, "অত ভাল-মন্দ দেখ্‌তে গেলে কোন ভাল কাজই হয় না।"

কৃষ্ণকান্তের এখন এই অবস্থা। তিনি এখন আর অগ্রসর হইবেন কি পশ্চাৎপদ হইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে দেশের সুখশান্তিপূর্ণ উন্নতি, অন্য দিকে তাঁহার কুটিল স্বার্থ; একদিকে সুখৈশ্বর্য্যময়ী আশার মধুর আহ্বান, অন্য দিকে ভীতির তীব্র কটাক্ষ। এক সঙ্কীর্ণ সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি কোন্ পথটা অবলম্বন করিবেন, তাহা নিরূপণ করিতে পারিতেছেন না। বিবেক বলিতেছে, দেশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এ সময় তাঁহার মনোভাব প্রকাশ পাইলে আর রক্ষা নাই: তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত অভিসন্ধিটা যে অনেকের নিকট অপ্রকাশিত নাই, তাহা নিশ্চয়। তথাপি যে এখনও তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু এইরূপে আর কয়দিন চলিবে? বিশেষতঃ দেশটা যখন একপ্রকার স্বাধীন হইয়াছে, তখন আবার তাহাকে মুসলমানের পদানত করা উচিত কি? মন বলিতেছে, অনুচিতই বা কিসে? দেশের স্বাধীনতায় তাঁহার লাভ কি? দেশ স্বাধীন, রণজিৎ রাজা হইয়াছে, রূপনাথ মন্ত্রীর পদে বসিয়াছে, শঙ্কর রাজ্যশাসন করিতেছে। আর তিনি? তিনি তো সেই একজন অধীন প্রজাই আছেন? তবে লাভটা কি? আর দেশটা কি চিরদিনই এইরূপ থাকিবে? মোগলেরা কি এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের ভয়ে বাঙ্গালাটা ছাড়িয়া দিয়া পলাইবে? কখনই না। শীঘ্রই অসংখ্য মোগলসৈন্য আসিয়া আবার আপনাদের অধিকার স্থাপন করিবে। তখন—তখন তাঁহাকেও বিদ্রোহীর দলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে? হায়, হায়, তবে কি হইবে? কৃষ্ণকান্ত এখন মারীচের অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন। সম্মুখে ও পশ্চাতে বিপদের ভীষণ ভ্রূকুটিদর্শনে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আশাময় ভবিষ্যৎটা গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। তখন কৃষ্ণকান্ত এই অন্ধকারময় দুর্গমপথে পার্ব্বতীর পরামর্শ-বর্ত্তিকার সাহায্য লওয়া যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত আপনার অবস্থাটা পার্ব্বতীকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—"পার্ব্বতি? এখন কি করা উচিত?"

পার্ব্বতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—তোমার মত কি?"

কৃষ্ণ। আমার মতে এখন কোন পক্ষেই যোগ দেওয়া উচিত নয়।

পা। তার পর?

কৃষ্ণ। তার পর যে দিক্‌টা ভারী দেখিব, সেই দিক্‌টা ধরিব।

পা। সে কখন্?

কৃষ্ণ। যখন দেখিব, হাজার হাজার মোগলসেনা আসিয়া দেশ ছারখার করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন ধীরে ধীরে গিয়া সেই দলে মিশিব।

পা। তখন তুমিও যে বিদ্রোহী নও, কেবল ভয়ে পড়িয়াই তাহাদের পক্ষে যোগ দিতেছ না, তাহা কিরূপে প্রমাণ করিবে?

কৃষ্ণ। প্রমাণ ফৌজদার।

পা। এখন ফৌজদারের কোন সাহায্য করিতেছ না, আর তখন তোমার হইয়া সাক্ষ্য দিবে কেন?

কৃষ্ণ। দিবে না?

পা। না। তখন কি হইবে জান?

কৃষ্ণ। কি হইবে?

পা। আগেই তোমার শূলের হুকুম হইবে।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"তবে উপায়? এখন মুসলমানপক্ষে যোগ আছে জানিতে পারিলে রণজিৎ রায় যে সর্ব্বনাশ করিবে?"

পা। সাধ্য কি? তবে তোমার মত নির্ব্বোধ পুরুষের কাছে সকলই সম্ভব বটে।

কৃষ্ণকান্ত ব্যগ্রদৃষ্টিতে পার্ব্বতীর জ্ঞানোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখন আমাকে কি করিতে বল?"

পা। বোধ হয় শুনিয়াছ, রণজিৎ রায়ের দমনের জন্য সুবাদার পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠাইয়াছে?

কৃষ্ণ। শুনিয়াছি, কিন্তু এখনও তো তাহারা আসিতে পারিল না?

পা। কেন আসিতে পারিতেছে না, জান কি?

কৃষ্ণ। শুনিতে পাই, তাহারা যেখানে যেখানে আসিয়া তাঁবু ফেলিতেছে, সেইখানেই হাজার হাজার গ্রামবাসী মিলিয়া তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিতেছে, তাঁবুতে আগুন ধরাইয়া দিতেছে, রসদ কাড়িয়া লইতেছে, কামান-বন্দুক লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিতেছে। এই জন্যই তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

পা। এ জন্য তাহারা সতর্ক হইলেই তো আর এরূপ ঘটে না? শুধু ইহাই নয়, আরও কারণ আছে।

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"আর কি কারণ?"

পা। তাহারা রসদ পাইতেছে না। আগে দেশের লোকেই সে ভার লইত, কিন্তু এখন আর কেহ রসদ দেয় না। সিপাহীরা রসদের জন্য গ্রাম লুঠ করে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সকলে সতর্ক হয়। দেশে খাদ্যদ্রব্য যাহা কিছু থাকে, তাহা লোকে যতদূর পারে, লুকাইয়া রাখে, অবশিষ্ট নদীতে ফেলিয়া দেয়। সিপাহীরা লুঠ করিয়া টাকা পায়, কিন্তু রসদ পায় না। লোক প্রাণ দেয়, তথাপি এক মুষ্টি রসদ দিতে চাহে না। কাজেই রসদ না পাইয়া সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ নত করিলেন। পার্ব্বতী বলিল,—"এখন তোমাকে তাহাদের রসদ যোগাইতে হইবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিল,—"কি উপায়ে যোগাইব?"

পার্ব্বতী বলিল,—"উপায় অনেক আছে।"

তখন স্বামি-স্ত্রী মিলিয়া অনেক পরামর্শ করিল। পার্ব্বতীর প্রতি কথায় কৃষ্ণকান্তের দুর্ব্বল হৃদয় সবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরামর্শ-শেষে কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"কিন্তু রণজিৎ রায় যে সর্ব্বনাশ করিবে?"

পার্ব্বতী বলিল,—"তাহার উপায় আগেই করিতে হইবে। চন্দ্রার সহিত শঙ্করের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া আইস।"

কৃষ্ণকান্ত সাবস্ময়ে পার্ব্বতীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"সত্যই কি বিবাহ হইবে?"

তিরস্কারপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পার্ব্বতী গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল,—"না।"

পার্ব্বতী সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেল। কৃষ্ণকান্ত একা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ধ্বনিত হইতে লাগিল, "দেশের লোক প্রাণ দেয়, তথাপি এক মুষ্টি রসদ দেয় না।"

কৃষ্ণকান্ত যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"না—আমি নিমিত্ত হইব না।" তার পর কি ভাবিয়া তিনি উঠিলেন। চন্দ্রার সহিত শঙ্করের বিবাহ স্থির করিবার নিমিত্ত রণজিৎ রায়ের নিকট চলিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### ঘটনাচক্র।

বিবাহের কথাটা ক্রমে অনেকেই শুনিল। চন্দ্রাও শুনিল, শুনিয়া সে প্রথমে বিস্মিতা, পরে আনন্দিতা হইল। শঙ্কর তাহার আপনার হইবে, প্রাণের আরাধ্য দেবতাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে পাইবে, ইহা হইতে সুখের সংবাদ আর কি আছে? আনন্দে চন্দ্রার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

একদিন রামরূপ চন্দ্রার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

চন্দ্রা উত্তর করিল, "কি?"

রামরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আমার পুরস্কার কোথায়?"

চন্দ্রা লজ্জায় মুখ নত করিল। রামরূপ পূর্ব্বেই চন্দ্রাকে বুঝাইয়াছিল যে, এবারকার যুদ্ধে সে যদি না থাকিত, তাহা হইলে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে নিশ্চয়ই শঙ্করকে প্রাণ দিতে হইত। কিন্তু সে মোগলসৈন্য সাজিয়া শঙ্করের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু চন্দ্রা ইহাতেই বিশ্বাস করিয়াছিল।

চন্দ্রাকে নীরব দেখিয়া রামরূপ বলিল,—"সে দিনের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ চন্দ্রা?"

চন্দ্রা মুখ তুলিয়া বলিল,—"এ জীবনে ভুলিব না।"

রাম। তবে তোমার অঙ্গীকৃত পুরস্কার দাও?

চন্দ্রা। আমার দিবার কি আছে? বল, তোমার কি চাই?

রাম। তোমার যাহা আছে, তাহাই চাই।

চন্দ্রা নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন রামরূপ—লালসার দাস পাষণ্ড রামরূপ চন্দ্রার পদতলে জানু পাতিয়া বসিল। গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল,—"আমি তোমার করুণার ভিখারী চন্দ্রা! ভিখারীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

চন্দ্রা কাঁপিয়া উঠিল, সভয়ে দুই পদ পিছাইয়া গেল, কোন উত্তর করিতে পারিল না। তখন রামরূপ কাতরস্বরে বলিল,—"চন্দ্রা! আমি তোমার রূপে মজিয়াছি; তোমার ঐ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য আমার বুকে আগুন জ্বালাইয়াছে। এখন চন্দ্রা! আমাকে বাঁচাও!"

চন্দ্রার দেহ বায়ুবিতাড়িত বল্লরীবৎ কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত-কণ্ঠে বলিল,—"তুমি এত পাষণ্ড, তাহা আমি জানিতাম না। তুমি কি জান না, আমি আর একজনের বাগ্‌দত্তা পত্নী?"

রামরূপ সে বাগ্‌দানের মর্ম্ম বুঝিত। তথাপি বলিল,—"কিন্তু সে বাগ্‌দানে তুমি তো আবদ্ধা নও? তবে কেন আমাকে বিমুখ করিবে? আমি যে মরিতে বসিয়াছি চন্দ্রা?"

চন্দ্রা তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"তোমার মরণই মঙ্গল। তুমি জান, আমি কাহার ভাবী পত্নী?"

রামরূপ মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"যাহারই হও, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি যে অনেকদিন হইতে তোমার মুখ চাহিয়া আছি?"

চন্দ্রা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল,—"তুমি নরাধম।"

পৈশাচিক হাসি হাসিয়া রামরূপ বলিল,—"আমি তোমার দ্বারে প্রেমের অতিথি।"

চন্দ্রা মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। রামরূপ আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"নিষ্ঠুর হইও না চন্দ্রা! আমার প্রাণ যায়. কেবল একবিন্দু—একবিন্দু প্রেমদানে আমাকে বাঁচাও, অঙ্গীকার পালন কর। নতুবা চন্দ্রা! তোমার সাক্ষাতেই আমি আত্মহত্যা করিব।"

রামরূপের নয়নে জল। সে দুই হাতে চন্দ্রার উভয় পদ জড়াইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল। চন্দ্রা

সবলে পা টানিয়া লইয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বলিল,—"পাষণ্ড !"

রামরূপ উঠিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রার সে ভীমভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া একটু ভীত হইল, তাহার উপেক্ষিত হৃদয় হতাশে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রোধে, ক্ষোভে তাহার হিতাহিতজ্ঞান তিরোহিত হইল। সে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"তবে শোন চন্দ্রা! যাহা আশা করিয়াছ, তাহা কোনদিনই পূর্ণ হইবে না, শঙ্করকে তুমি কখনও পাইবে না। এ বিবাহের প্রস্তাব কেবল তোমার পিতার স্বার্থসিদ্ধির কৌশলমাত্র—কেবল শঙ্করের আর রণজিৎ রায়ের ছিন্ন মস্তকটা তাঁহার পায়ে লুটাইবার জন্য। তুমি আমারই হইবে, তখন এই অপমানের—এই পদাঘাতের কঠোর প্রতিশোধ লইব।"

চন্দ্রা কাঁপিয়া উঠিল, রামরূপ অস্থির-পদে কক্ষ ত্যাগ করিল। কক্ষের বাহিরে গিয়া সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তীব্র-কণ্ঠে বলিল,—"আরও শুন, তুমি এখন শঙ্করের দৃষ্টিতে অবিশ্বাসিনী পাপিষ্ঠা।"

রামরূপ চলিয়া গেল, চন্দ্রা শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ঠাকুর, এ কি শুনিলাম ?"

শয্যায় পড়িয়া চন্দ্রা অনেক কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল, সে এখন শঙ্করের দৃষ্টিতে অবিশ্বাসিনী! কেন এ অবিশ্বাস? তাহার অপরাধ কি? চন্দ্রা অনেক ভাবিয়াও কোন অপরাধের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। তখন সে ভাবিল, রামরূপ মিথ্যাবাদী। কিন্তু সে এমন অসম্ভব মিথ্যাটা বলিবে কেন? তবে কি সে সত্যই শঙ্করের ভালবাসা হারাইয়াছে? চন্দ্রা ভাবিল, বুঝি হারাইয়াছে। ভাবিতেই তাহার হৃদয়টা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে সবলে উপাধানে বুকটা চাপিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ পরে চিত্তটা একটু স্থির হইল। তখন সে ভাবিল, ক্ষতি কি! আমি তো শঙ্করকে পাইবার আশায় ভালবাসি না, আমার এ ভালবাসায় তো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নাই? তবে দুঃখ কি? আমার এ ভালবাসার স্রোতে কে বাধা দিবে? চন্দ্রা একটু নিশ্চিন্ত হইল।

তার পর আর একটা ভয়ঙ্কর কথা তাহার মনে পড়িল। কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য—কেবল শঙ্করের সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার পিতা এই বিবাহ-রূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন। মিথ্যাপ্রলোভনে মুগ্ধ রাখিয়া শত্রু বিনাশ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। কি ভয়ঙ্কর কথা! কি ঘৃণিত কৌশল! কেবল চন্দ্রার মুখ চাহিয়াই শঙ্কর ও রণজিৎ তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধির দিকে লক্ষ্য করিবে না, তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা দিবে না এই অবসরে পিতা আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। তবে কি চন্দ্রাই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে? সে কি কোন উপায়ই করিতে পারিবে না? জীবন দিয়াও কি শঙ্করকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। চন্দ্রার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয্যাত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষের নিকটে গিয়া বসিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। অপরাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম-গগনপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার শেষ কনকরশ্মি শঙ্খেশ্বরীর তরঙ্গে পড়িয়া নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইতেছে। দিগন্তের শেষ-প্রান্ত হইতে সন্ধ্যার ক্ষীণ রেখা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে; মন্দানিলে শঙ্খেশ্বরীর ঘাটের উপর সেফালিকার পাতাগুলি অল্পে অল্পে কাঁপিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার শেষ সূর্য্যরশ্মি দিগন্তের কোলে মিশাইয়া গেল, ক্ষীণ ধূসর ছায়ায় ধরণী আচ্ছন্ন হইল। চন্দ্রা তখনও বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,——'জীবন দিলেও কি শঙ্কর নিরাপদ্ হয় না?' সে একবার ভাবিল, কোন উপায়ে এই গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিয়া শঙ্করকে সাবধান করিলে হয় না? পরক্ষণেই ভাবিল, তাহা হইলে পিতা বিপন্ন হইবেন। তবে এই মহাসন্ধিক্ষণে আপনাকেই বলি দিয়া সকল দিক্ রক্ষা করিলে হয় না? অন্ধকারাচ্ছন্ন সেফালিকা-বৃক্ষের পত্রান্তরাল হইতে একটা পাখী চীৎকার করিয়া বলিল,—"না না না।" কোন উপায় না দেখিয়া চন্দ্রা কেবল কাঁদিতে লাগিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে পার্ব্বতী কর্কশস্বরে ডাকিল,—"চন্দ্রা!"

চমকিত হইয়া চন্দ্রা ফিরিয়া চাহিল, পার্ব্বতীর রোষ-কম্পিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। পার্ব্বতী বলিল,—"আজ তুই রামরূপকে লাথি মারিয়াছিস্?"

চন্দ্রা নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল,—"হাঁ।"

পার্ব্বতী গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"কেন?"

চন্দ্রা তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তখন পার্ব্বতী বলিল,—"বুঝিয়াছি, শঙ্করের সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া তোর বড় অহঙ্কার হইয়াছে। কিন্তু আমি তোর এ অহঙ্কার চূর্ণ করিব। শঙ্করের সহিত কিছুতেই তোর বিবাহ হইবে না।"

চন্দ্রা নীরবে বিমাতার রোষারক্ত বদনের দিকে চাহিয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল,—"আরও শোন্, আজ তুই যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিস্, তাহারই সহিত তোর বিবাহ হইবে। ইহাই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

পার্ব্বতী বেগে গৃহ হইতে নিক্রান্তা হইল। চন্দ্রা স্তম্ভিত-হৃদয়ে বসিয়া শঙ্খেশ্বরীর নর্ত্তনশীল তরঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মি আসিয়া নদীতরঙ্গের উপর পড়িয়াছে। সেই জ্যোৎস্নাস্নাত তরঙ্গমালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চন্দ্রা ভাবিল,—"এইবার মরিতে হইবে।"

পার্ব্বতী বলিলেও বাস্তবিকই রামরূপের সহিত চন্দ্রার বিবাহ অসম্ভব। কৃষ্ণকান্ত কখনই ইহাতে সম্মত হইবেন না। রামরূপ তাঁহাদের স্বজাতি নহে, বংশ-মর্য্যাদাতেও সমান নহে। যশোলিপ্সু কৃষ্ণকান্ত সমাজ বা লোকনিন্দার শাসন অগ্রাহ্য করিয়া কখনই এরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি চন্দ্রা এত কথা বুঝিল না। সে জানিত, বিমাতার যাহা ইচ্ছা, পিতা তাহার প্রতিরোধে অসমর্থ। তাই সে এবার যে পথটা সুগম দেখিল, তাহারই অনুসরণ করিল। তাহার যন্ত্রণাপীড়িত ব্যথিত হৃদয় শঙ্খেশ্বরীর জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল নৃত্যশীল তরঙ্গের দিকে চাহিয়া হায় হায় করিয়া উঠিল; অমনই শঙ্খেশ্বরী যেন স্নেহপূর্ণ শত বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে 'আয় আয়' বলিয়া ডাকিল। সে স্নেহের আহ্বানে চন্দ্রা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল, এইবার মরিতেই হইবে।

কৌমুদীপ্লাবিতা গভীরা রজনীতে শঙ্কর একা নদীতীরে সেফালিকা-বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন। অনতিদূরে একটা বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া আবদুল স্থির-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই শঙ্কর সে স্থান ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আবদুলও তাঁহার অনুসরণ করিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু আর এক ভীষণ দৃশ্য আবদুলের গতিরোধ করিল। সহসা নৈশগগন ভেদ করিয়া একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ উঠিল। চমকিত হইয়া আবদুল চারিদিকে চাহিল। পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে সে দেখিল, কৃষ্ণকান্তের বাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যানের নিকট এক পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে ধরিয়াছে। মুহূর্ত্ত পরেই পুরুষ সেই রমণীকে বক্ষে লইয়া যেখানে অন্ধকার বৃক্ষতলে আবদুল দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল। আবদুল চিনিল, সে পুরুষ রামরূপ। আবদুলের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত ছুটিল। তার পর রামরূপ রমণীকে লইয়া যখন আবদুলের সমীপস্থ হইল, তখন আবদুল লম্ফ দিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল; চীৎকার করিয়া বলিল,—"সয়তান!"

রামরূপ একবার আবদুলকে বেশ চিনিয়াছিল, আজি সে সহসা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল; মুহূর্ত্ত পরেই কক্ষস্থিত রমণীকে মাটীর উপর ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া পলাইল। আবদুল তাহার অনুসরণ অনাবশ্যক বোধ করিল। সে তখন ভূলুণ্ঠিতা রমণীর নিকটে আসিল। দেখিল, রমণী সংজ্ঞাহীনা। সে অঞ্জলি দ্বারা নদী হইতে জল আনিয়া রমণীর মস্তক ও মুখে দিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার চৈতন্য হইল না। এ দিকে শঙ্কর কোন্ দিকে গেলেন, তাঁহার কি হইল, তাহা আবদুল জানিতে পারিল না। সে ভাবিল, সে দিন রূপনাথের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত সয়তান যেরূপ চক্রান্ত করিয়াছিল, আজিও হয় তো এই ঘটনার মধ্যে সেইরূপ একটা ভীষণ চক্রান্ত আছে। তখন শঙ্করের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। এ দিকে মূর্চ্ছিতা রমণীকেও এরূপে ফেলিয়া যাওয়া যায় না। একটু ভাবিয়া শেষে আবদুল সেই সংজ্ঞাশূন্য রমণীদেহ স্কন্ধে তুলিয়া শঙ্করের অনুসরণে ছুটিল।

ঘটনার সূক্ষ্মচক্র আর এক দিকে ঘুরিয়া পড়িল। সে আবর্ত্তনে বিবেক ও মোহের দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবসান হইল। জিতিল কে?

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### মোহ জিতিল।

আবদুল বাটীর নিকটে আসিয়া শঙ্করের সাক্ষাৎ পাইল। শঙ্কর তাহার স্কন্ধে রমণীদেহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন আবদুল সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিল। শঙ্কর তৎক্ষণাৎ সেই অচেতন রমণীদেহ বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া এক কক্ষে স্থাপন করিলেন, এবং তাহার শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আবদুলের ডাকাডাকিতে কয়েকজন দাসদাসী উপস্থিত হইল। তাহাদের শুশ্রূষায় অল্পক্ষণমধ্যেই রমণীর চৈতন্য হইল। এতক্ষণ শঙ্কর বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, এক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দাসদাসীরা প্রস্থান করিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই শঙ্কর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে চন্দ্রা। তাঁহার সর্ব্বশরীরে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিল, তিনি এক পদ পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। তার পর ডাকিলেন,—"চন্দ্রা!"

চন্দ্রা কোন উত্তর করিতে পারিল না। সে এখন কোথায়, কি হইয়াছে, তাহাই প্রথমে বুঝিতে পারিল না। তার পর শঙ্করের কণ্ঠে এমন নীরব স্নেহহীন আহ্বান সে এই প্রথম শুনিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া শঙ্কর

আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"চন্দ্রা! এত রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিলে?"

এবার ধীরে ধীরে সকল কথা চন্দ্রার মনে পড়িল। মৃত্যুকামনায় গোপনে গৃহ হইতে নির্গমন, তার পর রামরূপের আক্রমণ, তাহার প্রদত্ত বিষ আঘ্রাণে মূর্চ্ছা, এ সকল ঘটনাই তাহার মনে আসিল। কিন্তু তার পর কি হইয়াছে, কিরূপে সে এখানে আসিয়াছে, তাহা অনেক করিয়াও মনে করিতে পারিল না। দুইবারেও উত্তর না পাইয়া একটু ক্রুদ্ধস্বরে শঙ্কর বলিলেন,—"তুমি লজ্জায় বলিতে না পারিলেও আমি তাহা বুঝিয়াছি।"

চন্দ্রা উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে বলিল,—"কি?"

শঙ্কর বলিলেন,—"তুমি অভিসারে বাহির হইয়াছিলে।"

অভিসার! চন্দ্রা কাঁপিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিল,—"না।"

শঙ্কর। তবে রাত্রিকালে কোথায় যাইতেছিলে?

চন্দ্রা। মরিতে।

শঙ্কর। তবে মরিলে না কেন?

কি নিষ্ঠুর প্রশ্ন! শঙ্করের স্বরে উপহাসের তীব্রতা মিশ্রিত। চন্দ্রা বুঝিল, রামরূপের কথা সত্য। দুঃখে অভিমানে তাহার হৃদয়টা ফাটিয়া যাইতেছিল। সে কম্পিত-কণ্ঠে বলিল,—"এবার মরিব।"

শ। সত্য?

চ। সত্য।

শ। কেন মরিবে?

চ। জানি না।

শ। আমি জানি।

চ। কি জান?

শ। অনুতাপে। কিন্তু আজি আর মরিয়া কাজ নাই, এখন গৃহে যাও।

চ। আমি গৃহে যাইব না।

শ। কেন?

চ। বলিব না।

শ। উত্তম, আজি রাত্রিতে এইখানেই থাক, কালি যাহা হয় হইবে।

শঙ্কর প্রস্থানোদ্যত হইলেন। চন্দ্রা দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তার পর কাতর-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"তুমি এমন হইলে কেন?"

"তাহা তুমিই বলিতে পার" বলিয়া শঙ্কর ক্ষিপ্র-পদে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রা সেইখানেই বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার পর এক জন দাসী আসিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে যাইতে বলিল; চন্দ্রা উঠিয়া ধীরে ধীরে দাসীর পশ্চাৎ চলিল।

পরদিন প্রভাতে রণজিৎ রায় সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়া ভাবিলেন, হয় তো বিমাতার সহিত বিবাদ করিয়া বালিকা অভিমানে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিল। কেবল বিধাতার কৃপায় সে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। তখন তিনি চন্দ্রার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বাটীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রা তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। সে বৃদ্ধের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি আপনার বাটীতে দাসীবৃত্তি করিব, তথাপি গৃহে যাইব না। গৃহে যাইতে হইলেই আমি আত্মহত্যা করিব।"

বৃদ্ধ বুঝিলেন, অভিমানটা কিছু গুরুতর। তখন তিনি ভাবিলেন, দুই দিন এখানে থাকিলেই রাগটা পড়িয়া যাইবে। তখন বুঝাইয়া যাহা হয় করা যাইবে। ইহা ছাড়া বৃদ্ধের আর একটি দৃঢ় অভিপ্রায় ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, যে কোন কারণেই হউক, চন্দ্রার উপর শঙ্করের একটু রাগ বা অভিমান হইয়াছে। এখন কিছুদিন একত্র থাকিলে সেই রাগ বা অভিমান পড়িয়া যাইতে পারে। তখন চন্দ্রাকে আশ্বাস দিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। চন্দ্রা বুঝিয়াছিল, শঙ্কর নিশ্চয়ই কোনরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন অথবা তাঁহার মস্তিষ্ক কোন কারণে বিকৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় শঙ্করকে ছাড়িয়া, অবিশ্বাসের গুরুভার মস্তকে লইয়া চন্দ্রার মরিতে ইচ্ছা হইল না! শঙ্করের নিকটে থাকিয়া, তাঁহার এই যন্ত্রণাময় ব্যাধির উপশমের চেষ্টা করাই সে আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল।

এ দিকে চন্দ্রাকে দেখিতে না পাইয়া কৃষ্ণকান্তের বাটীতে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। তার পর কৃষ্ণকান্ত যখন শুনিলেন যে, রণজিৎ রায়ের বাটীতে চন্দ্রা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহার মাথাটা যেন কাটা গেল। তিনি পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি আমার কুল, মান সমস্তই ডুবাইলে।"

পার্ব্বতী শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল,—"আমি ডুবাই নাই, তোমার গুণধরী কন্যাই ডুবাইয়াছে।"

কৃষ্ণকান্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"তোমার অত্যাচারেই সে এ কাজ করিয়াছে।"

পার্ব্বতী হাত নাড়িয়া বলিল,—"তোমার যেমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি, তেমনই বুঝিয়াছ।"

কৃষ্ণ। তুমি চিরদিনই আমার বুদ্ধির দোষ দাও।

পা। দোষ দেখিলেই বলিতে হয়। নতুবা তুমি বলিবে কেন যে, আমিই চন্দ্রাকে তাড়াইয়াছি?

কৃষ্ণ। তবে কে তাড়াইল?

পা। কেহই তাড়ায় নাই, সে নিজে ইচ্ছা করিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণ। ইচ্ছা করিয়া?

পা। হাঁ, ইচ্ছা করিয়া। জান না কি. সে শঙ্করকে কত ভালবাসে?

কৃষ্ণ। জানি, কিন্তু সেজন্য গৃহ ত্যাগ করিবে কেন?

পা। তাহাও কি তোমার বুদ্ধিতে আসে না? সে শঙ্করকে পাইবার আশায় গিয়াছে।

কৃষ্ণ। শঙ্করের সহিত তাহার বিবাহের কথা তো স্থির করিতেছিলাম?

পা। সে নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। তোমার সমস্ত কৌশলই সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই গোপনে গভীর রাত্রিতে শঙ্করের সহিত পলাইয়াছে।

কৃষ্ণ। শঙ্করের সহিত?

পা। হাঁ, শঙ্করের সহিত। পূর্ব্বেই তাহাদের সমস্ত ষড়্যন্ত্র ঠিক হইয়াছিল। তার পর কল্য শঙ্কর আসিয়া বাগানের ধারে অপেক্ষা করিতেছিল, কালামুখী উঠিয়া গিয়া তাহার সহিত পলাইয়াছে।

কৃষ্ণ। তবে যাহা শুনিলাম, সে সমস্তই মিথ্যা?

পা। সমস্তই মিথ্যা।

কৃষ্ণ। কিন্তু শঙ্কর এমন কাজ করিল?

পা। কেন, শঙ্কর এতই সাধুপুরুষ নাকি?

কৃষ্ণ। প্রমাণ চাই।

পা। প্রমাণ দিতেছি।

তৎক্ষণাৎ রামরূপকে ডাকা হইল। রামরূপ আসিয়া বলিল,—"গত রাত্রিতে আমি অনিদ্রা বশতঃ উঠিয়া বাহিরে যাই। বাহিরে যাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলাম, বাগানের পার্শ্বে পথের উপর এক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা, সুতরাং তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু সে পুরুষ যে শঙ্কর, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তখন ব্যাপারটা জানিতে আমার কৌতূহল হইল, আমি দ্রুতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু বাড়ীটা ঘুরিয়া যাইতে আমার একটু বিলম্ব হইল, সেই অবসরে বোধ হয়, আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহারা আমার উপস্থিতির পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিল। আমি সেখানে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন মনে হইল, বোধ হয়, আমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে। তাই কথাটা লইয়া রাত্রিতে আর কোন গোলমাল করি নাই।"

রামরূপ এক নিশ্বাসে এত বড় কল্পিত মিথ্যাটা বলিয়া ফেলিল। কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ঈশ্বর সাক্ষী, যে নরাধম আমার কুলমানের মস্তকে এরূপ আঘাত করিয়াছে, তাহার শোণিতাক্ত মস্তক মুসলমানের পদতলে লুটাইবে। কিন্তু হায়, শঙ্কর এমন?"

পার্ব্বতী বলিল,- "কেবল ইহাই নয়।"

কৃষ্ণকান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। পার্ব্বতী বলিল,—"শঙ্কর ঘোর পাষণ্ড। এতদিন লজ্জায় ঘৃণায় যাহা বলি নাই, আজি তাহা বলিব। তবে শুন, শঙ্কর আমার উপরেও—"

পার্ব্বতীর নেত্রপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণকান্ত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"যথেষ্ট হইয়াছে। বুঝিয়াছি, বাঙ্গালার পতন অনিবার্য্য—বাঙ্গালীর অদৃষ্ট ঘোর তমসাচ্ছন্ন।"

ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে কৃষ্ণকান্ত বাহিরে গেলেন। তখন পার্ব্বতী রামরূপের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে বলিল,—"কেমন?"

রামরূপও হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমিও কেমন?"

পা। তুমি তো আমার হাতের গাধা-পেটা ঘোড়া।

রাম। স্বীকার করিলাম।

তখন পার্ব্বতী মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল,—"বল দেখি রূপ! ইহার পরিণাম কি হইবে?"

রাম। শঙ্করের পতন।

পা। আর?

রাম। আর কৃষ্ণকান্তের কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

পা। তার পর?

রাম। তার পর তুমি রাণী।

পা। আর তুমি?

রাম। আমি রাজা হইব।

একটা বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ সন্ধান করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"তুমি আমার গোলাম হইবে।"

রামরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এখনও যা, তখনও তাই? আমার কি আর পদোন্নতি হইবে না?"

পার্ব্বতী হাসিয়া বলিল,—"তোমার আশার শেষ নাই।"

রামরূপ বলিল,—"এমন অসীম সুধার সমুদ্র থাকিতে কাহার আশার শেষ হয়?"

পা। আমি কি এতই সুন্দর?

রাম। তুমি সুন্দরের অপেক্ষাও সুন্দর।

পার্ব্বতী হাসিয়া রামরূপের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সত্যই রূপ! তোমাকেই এ রাজ্যের—এ হৃদয়ের রাজা করিব।" মনে মনে বলিল,—"তোমাকেই আগে জাহান্নামে পাঠাইব।"

রামরূপ সেই প্রেমবিহ্বলা সুন্দরীকে উভয় বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া মনে মনে ভাবিল,—"বুকের উপর যে রাজ্য, ইহাব অধিক রাজ্য কোথায়?"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### ভালবাসা ও সন্দেহ।

চন্দ্রা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না; সে আসিয়া অবধি আর শঙ্করের সাক্ষাৎ পাইল না। শঙ্কর এখন আর বাটীর ভিতর প্রায় আসেন না, বহির্ব্বাটীতে থাকেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "কাজ অনেক, যাইবার অবসর নাই।"

কাজ যে অনেক, ইহা যথার্থ। রস্তম আলি দামোদর নদ পার হইয়া পলায়ন করিলেও ভবিষ্যৎ আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এবার যে রস্তম আলি সুবাদারের সাহায্য লইয়া প্রচণ্ড-পরাক্রমে আব একবার আক্রমণ করিবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। সুতরাং ভাবী আক্রমণাশঙ্কায় রণজিৎকে যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন সহকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। শঙ্করই সে বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী; অতএব তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদাই বিবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার অন্তঃপুরে একবার আগমনের অবসর ছিল না, তাহা নহে। ফল কথা, শঙ্কর ইচ্ছা করিয়াই আসিতেন না। না আসিবার বিশেষ কারণও ছিল।

যে যতই সন্দেহ বা অবিশ্বাসের দৃঢ় বন্ধনে বেষ্টিত হউক, ভালবাসার প্রাণহীন কঠোর প্রতিদানের আঘাতে যাহার হৃদয় যতই জর্জ্জরিত হউক, যে একবার ভালবাসিয়াছে—মুখের ভালবাসা নয়, হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে, আপনার সর্ব্বস্ব পরের চরণে উৎসর্গ করিয়া ভিখারী হইয়াছে, সে সন্দেহের শত আঘাতে—প্রাণহীন প্রতিদানের সহস্র ভ্রূকুটি সত্ত্বেও ভালবাসা ভুলিতে পারে না। যাহা একবার বিলাইয়া দিয়াছে, তাহা আর ফিরাইয়া লইতে চাহে না। সেই গভীর অতলস্পর্শী ভালবাসার যখন সন্দেহ আসিবে, যখন তীব্র প্রতিদানের নির্ম্মল ছুরিকা উন্মুক্ত জীবনের উপর উত্থিত হইবে, তখন সেই ছুরিকার আঘাতে আত্মহৃদয় সহস্র খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিবে, আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ভালবাসার মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইবে; কিন্তু যাহাকে ভালবাসে, তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না, তাহার হৃদয়ে এতটুকুও আঘাত করিতে সাহসী হইবে না। যে হইবে, সে ভালবাসে না, সে কেবল লালসার দাস। ভালবাসায় আত্মবিসর্জ্জন—লালসার উপভোগ।

শঙ্কব চন্দ্রাকে ভালবাসিয়াছিলেন। সে ভালবাসা ভুলিবার নয়, শত আঘাতেও তাহা স্থিতিশীল। সেই অতলস্পর্শী ভালবাসায় যখন সন্দেহের প্রলয় তরঙ্গ উত্থিত হইল, তখন শঙ্কর সেই ভীম তরঙ্গে আপনাকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু চন্দ্রাকে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। এই ভীষণ তরঙ্গের প্রথম আঘাতটা যখন তাঁহার হৃদয়ে প্রচণ্ড ভাবে আহত হইল, তখন সে আঘাতে হৃদয়টা একবার উদ্বেলিত—একবার বিকৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভালবাসার স্বভাবসিদ্ধ গুণে আবাব তাহা ক্রমে স্থির—গম্ভীর হইল। তখন আর শত আঘাতেও তাহা বিচলিত হইবার নহে।

কিন্তু সেই প্রথম আলোড়নকালে—সেই ভয়ঙ্কর সময়ে যখন চন্দ্রা তাঁহার সম্মুখে পড়িল, তখন তিনি বিকৃত হৃদয় লইয়া চন্দ্রার হৃদয়ে একটু আঘাত করিলেন। কিন্তু সেই একটু আঘাত তাঁহার হৃদয়ে শত গুণ প্রতিঘাত করিল। তখন আর তাঁহার লজ্জা, অনুতাপ ও ভয়ের সীমা থাকিল না। শঙ্কর ভাবিলেন, ছিঃ ছিঃ, করিলাম কি? আত্মসুখে বাধা পাইয়া চন্দ্রার হৃদয়ে এমন কঠোর আঘাত করিলাম? এই আঘাতের যন্ত্রণায়—এই অভিমানে চন্দ্রা যদি আত্মহত্যা করে? ছিঃ ছিঃ, কি করিলাম? আমি চন্দ্রার নিকট যাইয়া তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব। আমি তাহাকে ভালবাসি, সে আমার ইচ্ছা, তাহাতে চন্দ্রার কি? সে যদি অন্যকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, ভালবাসিয়া যদি সে সুখ পায়, তবে আমি তাহার সে সুখে বাধা দিবার কে? আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারি, কিন্তু তাহার ভালবাসার দাবী করিতে আমার অধিকার কোথায়? আমি চন্দ্রার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব।

কিন্তু ক্ষমা চাহিতে যাইতে শঙ্করের সাহস হইল না। ভাবিলেন, 'তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া হৃদয়ের আবেগে আবার যদি তাহার হৃদয়ে ব্যথা দিই? এ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। এ হৃদয় ক্ষমার অযোগ্য। আমি আর তাহার সম্মুখে যাইতে পারিব না।'

কয়দিন হইতেই শঙ্করের হৃদয়ে এইরূপ তুমুল ঝড়

বহিতেছিল। ক্ষোভে অনুতাপে তাঁহার বুকটা ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কিছুতেই হৃদয় স্থির করিতে না পারিয়া তিনি রূপনাথের নিকট ছুটিলেন।

রূপনাথ তখন সেতারের ঝঙ্কারের সহিত আপনার গলা মিশাইয়া মধুর-কণ্ঠে গাহিতেছিলেন,—

শ্যামা নয় সামান্য রে মন, গাছের ফল কি পেড়ে খাবি ?
বিবেক-কুলুপে আগে অভিমানের দ্বারে লাগাও চাবী ॥
শ্যামামায়ের প্রেমসাগরে, ডুবিয়ে দাও মন বাসনারে,
(সেথা) আপনার রতন খুঁজলে পরে
শুধুই মরবি খেয়ে খাবি।
আগুন জ্বালাও সুখের মুখে, দুঃখের অনল জ্বাল বুকে,
আমার আমার যাবে চুকে, তবে শ্যামা মাকে পাবি ॥

শঙ্কর বিহ্বল-হৃদয়ে দাঁড়াইয়া এই মধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। তার পর গীত থামিলে ধীরে ধীরে রূপনাথের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রূপনাথ তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। শঙ্কর উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! অভিমান থাকিলে কি পাওয়া যায় না ?"

রূপনাথ বলিলেন,—"না শঙ্কর! প্রেমে অভিমান নাই।"

শ। তবে আছে কি ?

রূ। আছে অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি।

শ। আর দুঃখ ?

রূ। প্রেমে দুঃখ নাই, প্রেম অভ্যাসে দুঃখ আসে।

শ। অভ্যাসে দুঃখ কেন ?

রূ। অভ্যাসকালে বাসনা থাকে।

শ। তার পর ?

রূ। তার পর যখন বাসনার শেষ হইবে, তখনই দুঃখেরও অবসান হইবে। তখন কেবল সুখ, কেবলশান্তি।

শঙ্কর একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"কিন্তু ইহা ঈশ্বর প্রেমের কথা; মানুষের প্রতি যে প্রেম ?"

রূপনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"প্রেম একই, তাহাতে মানুষ ঈশ্বর ভেদ নাই। প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষ ঈশ্বর এক। আর যে সসীম ক্ষুদ্র মানবকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহার অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্যময় ঈশ্বরকে ভালবাসিতে কতক্ষণ ?"

শ। ঈশ্বরকে ভালবাসিতে গেলেও কি দুঃখ পাইতে হয় ?

রূ। অভ্যাসকালে দুঃখ আছে বৈ কি।

শ। অসম্ভব; ঈশ্বরের ভালবাসায় সন্দেহ নাই। শঙ্কর নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রূপনাথ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন—"শঙ্কর!"

শঙ্কর উত্তর করিলেন,—"কি ?"

"কাহাকেও ভালবাসিয়াছ ?"

"বাসিয়াছি।"

"তাহাকে পাইবার আশা আছে ?"

"আগে ছিল।"

"এখন ?"

"এখন নাই।"

"কেন ?"

"তাহা বলিতে পারিব না।"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"তুমি না বলিলেও আমি তাহা বুঝিয়াছি।"

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কি বুঝিয়াছেন ?"

রূ। তুমি যাহাকে ভালবাস, সে তোমাকে ভালবাসে না, অথবা তাহার ভালবাসায় তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

শ। আপনি জ্যোতিষী।

রূ। ঠিক তাহা নহি। আর এই সামান্য বিষয়টা বুঝিবার জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শঙ্কর, আমার একটা কথা শুনিবে ?

শ। আপনার কোন্ কথা না শুনি ?

রূ। উত্তম; যাহাকে ভালবাস, তাহার ভালবাসায় সন্দেহ করিও না।

শ। আমি নিজে দেখিয়াছি।

রূ। ভালবাসার প্রাবল্যে তোমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটা অসম্ভব নহে।

শ। নিজের কর্ণে সে কথা শুনিয়াছি।

রূ। শুনিলেও কথার কোন এক অংশ শুনিয়াছ। হয় তো প্রথমটা শুন নাই, কিংবা প্রথমাংশে শুনিয়া ধৈর্য্য সহকারে শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে অপেক্ষা কর নাই। কেমন ইহা সত্য কি ?

শ। আপনি সর্ব্বজ্ঞ।

রূ। হইতে পারি। কিন্তু এখন বুঝিয়া দেখ, তোমার এ সন্দেহ মিথ্যা কি না।

শঙ্কর নীরবে রহিলেন। রূপনাথ বলিলেন, —"আর এক কথা, তুমি যাহাকে ভালবাস বলিয়া মনে কর, তাহাকে তুমি যথার্থ ভালবাস নাই।"

শঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"মিথ্যা কথা।"

রূপ। মিথ্যা নহে, কঠোর সত্য। যে ভালবাসায় ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ—ক্ষণে ক্ষণে বিরাগের আবির্ভাব হয়, তাহা ভালবাসা নামের অযোগ্য, সে ভালবাসা লালসার নামান্তর। যাহাকে ভালবাসিব, তাহার

আবার দোষ কোথায়? তাহার সব সুন্দর, সকলই নির্দ্দোষ, সমস্তই গুণ। যতক্ষণ তাহার এতটুকু দোষ দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ ভালবাসার গর্ব্ব করিও না।

শঙ্কর বিস্মিত, স্থির, নির্ব্বাক্। রূপনাথ বলিতে লাগিলেন,—"এই গর্ব্ব, এই লালসা, এই সন্দেহ ত্যাগ করিয়া যথার্থ ভালবাসিতে অভ্যাস কর। যে ভালবাসায় অভিমান নাই, আনন্দ আছে, ভোগ নাই, ত্যাগ আছে, তাহাই প্রকৃত ভালবাসা। সে ভালবাসার পরিণাম বড় সুন্দর, বড় মধুর, বড় শান্তিময়। কিন্তু তাহার মধ্যে সন্দেহকে স্থান দিও না। যাহাকে ভালবাস, আপনার হৃদয় দিয়া তাহার হৃদয় দর্শন কর; তাহার সুখদুঃখে আপনাকে সুখী-দুঃখী জ্ঞান কর; তবে ভালবাসা সম্পূর্ণ হইবে। ভালবাসার শান্তিময় কুটীরে দুঃখের অনল জ্বালাইও না শঙ্কর!"

শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"প্রত্যক্ষ দেখিলেও বিশ্বাস করিব না?"

রূ। কাহাকে বিশ্বাস? চক্ষুকে অথবা কর্ণকে বিশ্বাস করিও না। আপনার হৃদয় দিয়া ভালবাসার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে।

এমন সময় বাহির হইতে আবদুল ডাকিল,—"ঠাকুর!"

রূপনাথ ও শঙ্কর উভয়ে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### বাঙ্গালীর ব্রতপালন।

রূপনাথ ও শঙ্কর বাহিরে আসিলে আবদুল তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া বলিল,—"রস্তম আলি ছয় হাজার সৈন্য লইয়া দামোদর পার হইয়াছে।"

রূপনাথ বলিলেন,—"কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।"

আব। দশ বারো ক্রোশ।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"এতদূর! কেহ বাধা দিতেছে না?"

আব। না।

রূপ। তাহারা রসদ পাইতেছে কোথায়?

আব। তাহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না। তবে শুনিতেছি, তাহারা যে পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার স্থানে স্থানে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী চাল-ধানের বড় বড় কারবার খুলিয়াছে।

রূপ। সেখানকার লোকেরা কি বলিতেছে?

আব। তাহারা বলে, আমরা আর কতদিন এরূপে ধনপ্রাণ নষ্ট করিয়া শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিব?

রূপ। আরও পূর্ব্বে সংবাদ লওয়া উচিত ছিল।

আব। দুই তিন দিনের মধ্যেই এতদূর হইয়াছে।

রস্তম আলি তৃতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত ও পশ্চাত্তাড়িত হইয়া দামোদর পার হইতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি বুঝিলেন, এ বিদ্রোহ সামান্য নয়। ভাবিলেন, এই সময়ে এ সংবাদ সুবাদারের কর্ণগোচর করা আবশ্যক, কে জানে, কালে এই বিদ্রোহ কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। তখন হয় তো এজন্য তাঁহাকেই দায়ী হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রস্তম আলি সংবাদ-জ্ঞাপনার্থ সুবাদারের নিকট এক বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন; এবং আত্মদোষ-ক্ষালনার্থ বিদ্রোহের প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া এক কল্পিত বিকৃত সংবাদ লিপিবদ্ধ করতঃ তাহা সুবাদার-সমীপে গোচর করিলেন। সে সংবাদ শুনিয়া সুবাদার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তার পর এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির নেতৃত্বে চারি হাজার সৈন্য বিদ্রোহ-দমনার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

সুবাদার-প্রেরিত চারি হাজার সৈন্য আসিয়া রস্তম আলির দুই সহস্র সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। তখন তিনি সেই ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া মহোৎসাহে আবার দামোদর পার হইলেন। কিন্তু দামোদর পার হইলেও তাঁহার অগ্রসর হইবার পথে ভীষণ বাধা সমূহ উপস্থিত হইতে লাগিল। রূপনাথের উপদেশানুসারে চতুর্দ্দিকের অধিবাসিগণ সমবেত হইয়া অতর্কিতভাবে মোগল-শিবির আক্রমণ করিতে লাগিল এবং নানারূপে সৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অধিকন্তু কেহই সৈন্যগণকে রসদ যোগাইল না। এই সকল অসুবিধায় রস্তম আলি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি দামোদর-তীরে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক এই সকল অসুবিধা নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই মাস কাটিয়া গেল।

ইহার পর সৈন্যগণের নিকট যে রসদ ছিল, অথবা তাহারা গ্রাম লুঠ করিয়া যে যৎকিঞ্চিৎ রসদ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া আসিল। তখন রসদের অভাবে সৈন্যগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, তাহারা রাজধানীতে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যস্ত হইল। রস্তম আলি অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি কৃষ্ণকান্তের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত প্রথমে রসদ যোগাইতে স্বীকৃত হইলেন না। রস্তম আলি প্রমাদ গণিলেন। তিনি বার বার বিবিধ

প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণকান্তকে রসদ যোগাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকান্ত যে বিবেকটুকু লইয়া বার বার ফৌজদার সাহেবের অনুরোধ প্রত্যাখান করিতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে পার্ব্বতীর চক্রান্তে অথবা ঘটনাবশে তাঁহার সে বিবেকটুকু অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রতিশোধের নিদারুণ বহ্নি হৃদয়ে জ্বালাইয়া তিনি দেশের সর্ব্বনাশে বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন তিনি ফৌজদার সাহেবকে অভয় দিয়া সৈন্যগণের রসদ সরবরাহ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। সঙ্কল্পমাত্রেই স্থানে স্থানে তাঁহার বৃহৎ বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইল, ব্যবসায়চ্ছলে তিনি গোপনে মোগলসৈন্যের আহার যোগাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষিত উত্তেজিত গ্রামবাসিগণকে বিবিধ বাক্যে বুঝাইয়া, অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, ভয় দেখাইয়া মোগল-বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে নিবারণ করিলেন। তখন রস্তম আলি নির্ব্বিঘ্নে সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেশের লোকেই রূপনাথের নিকট শত্রুসৈন্যের গতিবিধির সংবাদ জানাইত, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকান্তের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া কেহই এ সংবাদ রূপনাথকে জানাইল না; সুতরাং রূপনাথ এ সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই শত্রুসৈন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। তিনি যখন সংবাদ পাইলেন, তখন শত্রুগণ দেবীগড়া হইতে ছয় ক্রোশ মাত্র দূরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে। আবদুলের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রূপনাথ ভাবিলেন, এইবার শেষ। তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়া একটা তপ্ত শ্বাস বহির্গত হইল।

পরদিন অপরাহ্ণকালে ছয় সহস্র মোগলসৈন্য আসিয়া দেবীগড়ার এক ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিল। তাহা দেখিয়া রণজিৎ রায় একটু চিন্তিত হইলেন। তিনি রূপনাথকে ডাকাইয়া ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"এ যুদ্ধে জয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব যদি আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সন্ধিসংস্থাপনের চেষ্টা করুন।"

রণজিৎ কহিলেন,—"কিন্তু গর্ব্বিত ফৌজদার কি সন্ধিতে সম্মত হইবে?"

রূপনাথ বলিলেন,—"না হওয়াই সম্ভব। তবে সেনাপতি ও ফৌজদারকে গোপনে কিছু অর্থ দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বোধ হয় সন্ধি হইতে পারে।"

রণজিৎ বলিলেন,—"সন্ধির প্রার্থনা করা হউক, কিন্তু গোপনে উৎকোচ দান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব না।"

তখন সন্ধিপ্রার্থনার জন্য এক দূত মোগল-শিবিরে প্রেরিত হইল। রস্তম আলি তাহাকে বলিয়া দিলেন,—"কুড়ি হাজার টাকার সহিত রূপনাথ ও কমলাকে অর্পণ করিলে সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে।"

রণজিৎ পুনর্ব্বার দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি রূপনাথ ও কমলার পরিবর্ত্তে আরও দশ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। কিন্তু রস্তম আলি এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, রূপনাথ ও কমলাকে হস্তগত করিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। সন্ধির প্রস্তাবে সেনাপতি কতকটা সম্মত হইলেও রস্তম আলি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এই বুড়া জমীদারটা বড়ই বেইমান; সৈন্যেরা প্রত্যাগমন করিলেই আবার বিদ্রোহ বাধাইবে। সেনাপতি বলিলেন,—"তবে বেইমানকে জাহান্নমে দাও।"

সন্ধ্যার পর রণজিৎ পুনর্ব্বার রূপনাথকে ডাকাইয়া সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া রূপনাথ বলিলেন,—"এত সহজে যদি সন্ধি হয়, তবে তাহাতে আপত্তি কি?"

রণজিৎ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন,—"তুমি ফৌজদারের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে?"

রূপনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"ক্ষতি কি? আপনি আমার জন্য এতদূর করিলেন, আর আমি আপনার জন্য এই তুচ্ছ কাজটা করিতে পারিব না?"

সবিস্ময়ে রণজিৎ বলিলেন,—"কমলাও যাইবে?"

রূপনাথ স্থিরকণ্ঠে বলিলেন,—"যাইবে।"

রণজিৎ স্তম্ভিতের ন্যায় ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তার পর?"

রূপনাথ বলিলেন,—"সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।"

রণজিৎ কপালে করসংলগ্ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। তার পর বলিলেন,—"আমাদের কত সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে?"

রূ। অস্ত্রধারী সৈন্য দেড় সহস্রাধিক।

র। আর পাইক সৈন্য?

রূ। আট শত।

র। আরও কিছু সংগৃহীত হইতে পারে?

রূ। আরও আট শত পাইক সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা একদিন পরে এখানে পৌঁছিতে পারে।

র। আপাততঃ এই সৈন্য দ্বারা একদিন যুদ্ধ চলিতে পারে না কি?

রূ। একদিন অনায়াসেই চলিবে।

র। আর যদি একদিন যুদ্ধ স্থগিত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, সংগৃহীত সৈন্যেরাও উপস্থিত হইবে?

রূ। নিশ্চয়ই।

র। উত্তম, আমি একদিনের জন্য সময় প্রার্থনা করিব।

রূ। তাহারা সময় দিবে না।

র। চেষ্টা করিব। অবশেষে উপস্থিত সৈন্য লইয়াই যুদ্ধ চলিবে।

রূ। তবে কি সন্ধি হইবে না?

র। না।

রূ। কিন্তু——

রণজিৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"ইহার আর কিন্তু নাই। ব্রাহ্মণ! রণজিৎ রায় প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু সত্য ভঙ্গ করিতে পারে না। ঠাকুর! সেদিনকার কথা মনে পড়ে? সেদিন তুমিই তো এ বৃদ্ধের অবসন্ন হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়াছিলে? এই বৃদ্ধ বাঙ্গালী জমীদারের জীর্ণ হৃদয়ে উৎসাহের তীব্র মদিরা ঢালিয়া তাহাকে রণমদে মাতাইয়াছিলে? তোমার মোহন মন্ত্রে বশীভূত হইয়াই তো ভীরু দুর্ব্বল বাঙ্গালী এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল? তবে আজি আবার এ ভগ্ন হৃদয়কে আরও ভাঙ্গিয়া দাও কেন ঠাকুর? যাও, আপনার কার্য্য দেখ; এ যুদ্ধে বৃদ্ধ স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিবে।"

রূপনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—"আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।"

রণজিৎ বলিলেন,—"চিনিবার মত আমার কিছুই নাই। তবে আমার অস্ত্রধারণের গুহ্যরহস্য শুন ঠাকুর। আমাদের বংশে একটী প্রবাদ আছে, যে দিন এ বংশের কোন প্রবীণ ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিবে, সেই দিন বিশালাক্ষী দেবী স্বয়ং খড়্গহস্তে রণস্থলে আবির্ভূতা হইবেন। আমি এবার সেই প্রবাদের পরীক্ষা করিব। যাও ঠাকুর, এ যুদ্ধে মা স্বয়ং আসিবেন, রণরঙ্গিণী খড়্গাকবে শত্রু নিপাত করিবেন; বৃদ্ধ প্রাণ দিয়া একবার রণস্থলে মাকে নাচাইবে, সর্ব্বস্ব দিয়া এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিবে।"

রূপনাথ আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখন রণজিৎ ফৌজদারের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, একদিনের জন্য তাঁহাকে সময় দেওয়া হউক, তিনি বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবের উত্তর দিবেন। কিন্তু ফৌজদার সাহেব তাঁহার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। তিনি রণজিৎ রায়কে চিনিতেন। সে যে এক্ষণে শক্তিসঞ্চয় করিবার জন্যই এইরূপ গোলমাল করিয়া সময় লইতেছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। তখন ফৌজদার সাহেবের পরামর্শে সেনাপতি পরদিনই যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### প্রেম না ভ্রান্তি?

সেই দিন সন্ধ্যার অনতিকাল পরে শঙ্কর একাকী প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়াছিলেন। শুভ্র চন্দ্রকর আসিয়া তাহার চিন্তাখিন্ন মুখের উপর পড়িয়াছিল, স্নিগ্ধ বায়ু-প্রবাহ উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। রূপনাথের উপদেশ তাঁহার হৃদয়ভাবকে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, অবিশ্বাসের স্থানে একটু একটু করিয়া অনুতাপের জ্বালা ফুটিয়া উঠিতেছিল। তখন তিনি চন্দ্রার প্রতি অসদ্ব্যবহারের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আপনার দুর্ব্বল হৃদয়কে সংযত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হৃদয় তো শান্ত হয় না? একবার তাহাতে সন্দেহের যে বিষময় বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, শত চেষ্টাতেও তো তাহাকে নির্ম্মূল করা যায় না। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া অপ্রত্যক্ষে বিশ্বাস-স্থাপন, কঠোর সাধনাসাপেক্ষ।

শঙ্কর ভাবিতেছিলেন. "জীবন কি ক্ষণভঙ্গুর; তাহাতে প্রেম, ভালবাসা, প্রাণ কি ক্ষণস্থায়ী? বিশ্ব অনন্ত—কাল অনন্ত; সেই অনন্তের নিকট মানবজীবন কত ক্ষুদ্র—কত তুচ্ছ? এই ক্ষুদ্র জীবন লইয়া অনন্তের বক্ষে প্রেমের—প্রণয়ের অভিনয় কি ভ্রম? ইহা অনন্ত সাগরবক্ষে এক বিন্দু বারির চঞ্চল নৃত্য নয় কি? কিন্তু এই তুচ্ছ বালুকাকণা-সদৃশ জীবন কি মহান্ কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ! এ সূত্রের শেষ নাই—পরিমাণ নাই; এই ক্ষুদ্র জীবন লইয়া অনন্ত কাল এই অনন্ত-সূত্রের অনুসরণ কি ভয়ানক! বার বার প্রত্যাহত, বিতাড়িত, তথাপি নিবৃত্তি নাই। অনন্তের এক বিন্দু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, অবিশ্বাস-নিপীড়িত হতাশ হৃদয় লইয়া তাহার অনুসরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। হায় অনন্ত, তুমি কত সুন্দর, কত মনোহর, কত প্রেমময়! কিন্তু তোমার বক্ষে সন্দেহের—নিরাশার এ পৈশাচিক তাণ্ডব কেন? তোমারই অনন্ত প্রেম হৃদয়ে লইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৌন্দর্য্যে, অনন্ত প্রেমে মগ্ন হই না কেন?"

শঙ্কর মুগ্ধ-নেত্রে উর্দ্ধে চাহিলেন। দেখিলেন, উপরে অনন্ত আকাশ; আদিহীন, অন্তহীন, সীমাশূন্য, নির্ম্মল নীলাকাশ। তাহাতে চন্দ্র হাসিতেছে, নক্ষত্র জ্বলিতেছে, তরল মেঘখণ্ড সেই অনন্ত সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে চাহিলেন; দেখিলেন, নীচে অনন্ত বিশ্ব কৌমুদী-সম্পাত-প্রফুল্লা অনন্ত পৃথিবী। শঙ্কর ভাবিলেন, "হায় অনন্ত!" সহসা তাঁহার দৃষ্টি দূর-প্রান্তরে নিপতিত হইল। দেখিতে পাইলেন, সেই

বিশাল প্রান্তর ব্যাপিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত মোগলশিবির-মালা শুভ্র সাগবতরঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, শিবিরে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত মহম্মদীয় কেতন পত্‌পত্‌ শব্দে উড়িতেছে। শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "জানি না মা জন্মভূমি! কালি তোমার উত্থান অথবা চিরপতন হইবে।" দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নেত্রপ্রান্তে গড়াইয়া পড়িল। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে মোগল-শিবিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা মৃদু অলঙ্কারশিঞ্জন শুনিয়া শঙ্কর ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চন্দ্রা। শঙ্করের হৃদয় উথলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কেবল নীরবে চন্দ্রার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চন্দ্রাও নীরবে অনিমিষলোচনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। উভয়েই স্থির, ধীর, নীরব। উপর হইতে অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে এই প্রণয়িযুগলের নীরব অভিনয় দেখিতে লাগিল।

প্রথমে শঙ্কর কথা কহিলেন। বলিলেন,—"এ সময়ে তুমি এখানে কেন চন্দ্রা?"

চন্দ্রা কোন উত্তর করিল না, উত্তর করিবার শক্তিও বুঝি তখন তাহার ছিল না। শঙ্কর বলিলেন,—"আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তোমাকে বলিবার একটা কথা আছে।"

একটা কথা। এত দিনের পর দেখা, সে দেখার পর শুধু একটা কথা। চন্দ্রা কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"কি কথা?"

শঙ্কর বলিলেন,—"তোমাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম,—বাসিয়াছিলাম কেন, এখনও ভালবাসি। সে জন্য তুমি আমাকে—"

একটু থামিয়া, স্বরটা একটু পরিষ্কার করিয়া শঙ্কর বলিলেন,—"সে জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে কি?"

চন্দ্রা মৃদুস্বরে বলিল, "কেন, তুমি কি করিয়াছ?"

শঙ্কর বলিলেন,—"কি করিয়াছি, তাহা আমিই বুঝিতে পারি না; কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর; যদি কখন আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা ভুলিয়া যাও।"

চন্দ্রা সেইখানে বসিয়া পড়িল। সকাতর দৃষ্টিখানি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল,—"কেন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

শঙ্কর বলিলেন,—"কি করিয়াছ, তাহা আমি বলিতে পারিব না; যাহাতে তুমি ব্যথা পাও, তেমন কাজ আর করিব না। আর আমি তোমার সুখের পথে বাধা হইব না।"

চন্দ্রা তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ? আমি কি করিয়াছি? বল তুমি, কি করিলে তোমার মনের মত হইতে পারিব?"

শ। তাহা আর হয় না চন্দ্রা!

চ। কেন?

শ। কেন, তাহা বলিতে পারিব না। আমি এখন জীবন্মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান।

চন্দ্রা সবিস্ময়ে বলিল,—"সে কি?"

শঙ্কর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ঐ দেখ।"

চন্দ্রা বলিল,—"ও কি?"

শ। মোগল-শিবির।

চ। কবে যুদ্ধ হইবে?

শ। কা'ল।

চ। তুমিও যুদ্ধে যাইবে?

শ। হাঁ, যাইব।

চন্দ্রা আর কিছু বলিল না, কেবল নতবদনে বসিয়া রহিল, অশ্রুপ্রবাহে তাহার বক্ষোবসন সিক্ত হইতে লাগিল। শঙ্কর নীরবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু সে মুখে অবিশ্বাসের কোন ছায়াই দেখিতে পাইলেন না; তাহাতে দেখিলেন, কেবল শান্ত সৌন্দর্য্য, কেবল ভালবাসার স্নিগ্ধ লাবণ্য। দেখিয়া শঙ্করের কত কথাই মনে পড়িল; সেই বালিকা চন্দ্রা, সেই তাহার সরল হাস্যচ্ছবি, সেই তাহার বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য,—তাহার পর সেই কিশোরী চন্দ্রা—শান্ত নম্র, করুণার—সরলতার প্রতিমূর্ত্তি চন্দ্রা,—শঙ্করের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্নেহপরিপ্লুত কণ্ঠে ডাকিলেন,—"চন্দ্রা!"

সজল দৃষ্টিখানি তুলিয়া চন্দ্রা বলিল,—"কি?"

শ। কি ভাবিতেছ?

চ। কিছু না।

শ। যুদ্ধের কথায় তোমার কি ভয় হইয়াছে?

চ। না।

শ। এ যুদ্ধের পরিণাম কি জান?

চ। জানি।

শ। কি জান?

চ। মুসলমানের জয়।

শ। আর?

চ। আর আমাদের পরাজয়?

শ। আমাদের?

চ। হাঁ আমাদের—আমাদের দেশের।

শ। দেশ কি তোমাদের?

চ। আমাদের দেশ—আমাদের নয় তো কার?

শঙ্কর একবার ঊর্দ্ধে চাহিলেন, একবার দূর শিবির-শীর্ষে মোগল-পতাকার চঞ্চল নৃত্য দেখিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হায়, কতদিনে বাঙ্গালী বলিতে শিখিবে আমাদের বাঙ্গালা—আমাদের দেশ!" তার পর চন্দ্রার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কেবল পরাজয় নহে চন্দ্রা, এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ হইতে আর কেহ ফিরিবে না। অন্তে ফিরিলেও রূপনাথ বা শঙ্কর আর ফিরিবে না।"

শঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

চন্দ্রা বলিল,—"সে কথা আমাকে কেন বলিতেছ?"

শ। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।

চ। আমি যাইব না।

শ। কেন?

চ। সেখানে আমার স্থান নাই।

শ। কিন্তু এখানে থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। সম্ভবতঃ আমাদের পরাজয়ের পর মুসলমানেরা প্রাসাদাদি আক্রমণ করিবে।

চ। তথাপি আমি যাইব না।

শ। তাহা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু যাইলেই ভাল হইত।

চ। কিসে ভাল হইত?

শ। মুসলমানের হাতে পড়িতে হইত না।

চ। তাহার অপেক্ষাও বাড়ীতে আমার শত্রু আছে।

শঙ্কর রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কে?"

চ। সে—সে রামরূপ।

শঙ্কর দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রা সেইভাবে সেইখানেই বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকিরণ পশ্চিমাকাশে মিলাইয়া গেল। চন্দ্রা উঠিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### উল্টা বুঝিলি রাম।

রামরূপ ভাবিল, যখন বাধিয়াছে, তখন ইহাকে একটু ভাল করিয়া বাধানই ঠিক। আমি এত করিয়া কাদা মাখিলাম, আর শেষে কৃষ্ণকান্ত যে বড় মাছটা ধরিবে, তাহা কখনই হইবে না। এত বড় ক্ষমতাটা পাইলে পার্ব্বতীই যে আমাকে মনে রাখিবে, তাহারই বা স্থির কি? অতএব জালের খেইগুলা নিজের হাতে রাখিয়া কাজ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, পরের হাতে যাওয়া ভাল নয়। বিশেষতঃ চন্দ্রাকে হাত করা চাই-ই। সে এখন যেখানে গিয়া পড়িয়াছে, এই সময় একটু কৌশল না খাটাইলে শেষে তাহাকে পাওয়া বড় কঠিন হইবে।

এই সকল ভাবিয়া রামরূপ পার্ব্বতীকে বলিল—"আমি একবার গোপনে উভয় পক্ষের উদ্যোগ আয়োজনটা দেখিয়া আসি।"

পার্ব্বতী তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি কতকটা বুঝিল, কিন্তু কিছু বলিল না। তখন রামরূপ গভীর রাত্রিকালে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মোগলশিবিরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু সোজা পথে যাইবার উপায় নাই, চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিতেছে। গ্রাম হইতে কাহারও বাহিরে যাইবার বা বাহির হইতে ভিতরে আসবার অধিকার নাই। অগত্যা রামরূপ একখানা ক্ষুদ্র নৌকা ঠিক করিল এবং আপনি ছদ্মবেশী মাঝি সাজিয়া একা দাঁড় বাহিয়া চলিল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া নৌকাখানা নদীর বাঁকের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে শঙ্খেশ্বরী দক্ষিণমুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামখানাকে বেষ্টন করিয়া পশ্চিমমুখে ছুটিয়াছে। রামরূপের নৌকা সেই বাঁকের মাথায় উপস্থিত হইলে তীর হইতে এক জন প্রহরী হাঁকিল,—"কে যায়?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রামরূপ উত্তর করিল,—"আমি নয়ান মাঝি।"

প্রহরী বলিল,—"যাইবার হুকুম নাই, নৌকা ফেরাও।"

রামরূপ তখন নৌকা ফিরাইয়া তাহাকে তীরসংলগ্ন করিল এবং প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইয়া, অনেক মিনতি করিয়া বলিল, তাহার স্ত্রীর কঠিন পীড়া, সে তাহার বাপের বাড়ীতে আছে। এই রাত্রির মধ্যে যাইতে না পারিলে তাহার সহিত দেখা হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু প্রহরী কিছুতেই ছাড়িল না। তখন রামরূপ একটু ক্ষুণ্নস্বরে বলিল,—"ভাই! যখন কিছুতেই ছাড়বে না, তখন আর লুকোচুরিতে কাজ কি? আমি অনেক কষ্টে দু'শোখানি টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, একটা বে-থা করবো। কিন্তু এখন যে রকম ব্যাপার দেখ্‌ছি, তাতে তো দু একদিনের মধ্যেই টাকাগুলো মুসলমানের হাতে পড়্‌বে। তাই সেগুলা যাতে রক্ষা পায়, তার একটা উপায় দেখতে যাচ্ছি। ধরমপুরে আমার এক পিসীর বাড়ী; মনে করেছি, এগুলা সেইখানেই রেখে

আসন। তা তুমি যখন কিছুতেই ছাড়বে না, তখন তুমি তার অর্দ্ধেকগুলা নাও, বাকী অর্দ্ধেক আমি রেখে আসি।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই রামরূপ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কতকগুলা টাকা বাহির করিয়া গণিতে বসিল। প্রহরী সতৃষ্ণনয়নে সেগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। গণনা শেষ হইলে রামরূপ একশত টাকা লইয়া প্রহরীর সম্মুখে রাখিল। প্রহরী একবার সেই শুভ্রোজ্জ্বল রজত-মুদ্রাগুলির দিকে, আরবার রামরূপের দিকে চাহিতে লাগিল। শেষে তাহার কর্ত্তব্যপালন অপেক্ষা সম্মুখস্থ এই টাকাগুলির মর্য্যাদা-রক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। তখন সে রামরূপকে দ্রুত পলায়ন করিতে আদেশ দিয়া টাকাগুলা কাপড়ে বাঁধিতে লাগিল। রামরূপ দ্রুতপদে গিয়া নৌকায় উঠিল। অন্ধকারে প্রহরী তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখখানা দেখিতে পাইল না। নৌকা আবার নিঃশব্দে দ্রুত-বেগে চলিল।

গ্রামপ্রান্তে আবার একজন প্রহরী রামরূপকে আটকাইল। কৌশলী রামরূপ আবার তাহাকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিয়া নৌকা চালাইল। নির্ব্বোধ প্রহরিদ্বয় বুঝিল না, তুচ্ছ অর্থের লোভে আজি তাহারা কি সর্ব্বনাশ করিল।

গ্রাম ছাড়াইয়া রামরূপ আরও অনেক দূর গেল। শেষে একটা ক্ষুদ্র জঙ্গলের পার্শ্বে গিয়া নৌকা বাঁধিল। সেই জঙ্গলের পরেই বিস্তৃত প্রান্তর। সেখান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে মোগল-শিবির। তখন চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, অন্ধকারে প্রান্তর-বক্ষ আচ্ছন্ন হইয়াছে। কেবল সেই অন্ধকারাবৃত প্রান্তরবক্ষে দূর মোগল-শিবির হইতে ক্ষীণালোক-রশ্মি দৃষ্ট হইতেছে। সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া রামরূপ দ্রুতপদে চলিল।

শিবিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া রামরূপ একবার দাঁড়াইল। দেখিল, শিবিরের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে মশাল জ্বলিতেছে; মশালের নিকটে রক্তবর্ণ পরিচ্ছদধারী যমদূত সদৃশ এক একজন প্রহরী পাহারা দিতেছে। মশালের আলোকে তাহাদের বন্দুকের অগ্রভাগ ঝলসিতেছে। দেখিয়া রামরূপের ভয় হইল, সে আর অগ্রসর হইবে কি পশ্চাৎপদ হইবে, সহসা স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু প্রহরীর সতর্কদৃষ্টি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। একজন প্রহরী চীৎকার করিয়া বলিল,—"কোন্ হ্যায়?"

সে বজ্রনির্ঘোষতুল্য স্বর শুনিবামাই রামরূপ চমকিয়া উঠিল। কি উত্তর করিবে, স্থির করিতে না। করিতে দুই জন প্রহরী আসিয়া তাহাকে ধরিল, রামরূপ জড়িত স্বরে বলিল,—"আমি শত্রু নহি।" প্রহরীরা সে কথা শুনিল না, ধমক দিয়া বলিল,—"চুপ রও কাফের!"

অগত্যা রামরূপ চুপ করিল। তখন প্রহরীরা তাহাকে ধরিয়া ধাক্কা দিতে দিতে শিবির নিকট আনয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে আরও কয়জন প্রহরী আসিয়া জুটিল। একজন রামরূপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল; রামরূপ কাঁপিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মিঞা সাহেব, আমায় মারিও না। তোমাদের পয়গম্বরের দোহাই, আমি শত্রু নহি। তোমাদের ফৌজদারের নিকট সংবাদ দাও।"

তখন একজন প্রহরী তাহাকে মারিতে নিষেধ করিয়া সেনাপতির নিকট সংবাদ দিতে ছুটিল। উপস্থিত প্রহরিগণ রামরূপকে লইয়া কৌতুক করিতে লাগিল। এক এক জন পরিহাস করিয়া বন্দুক তুলিলেই রামরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে, প্রহরীরা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠে। রামরূপ ভাবিল, কি বিপদেই আজি পড়িলাম।

সেনাপতি সাহেব সুসজ্জিত শিবির মধ্যে বসিয়া সিরাজির সহিত অপ্সরাকণ্ঠের সঙ্গীত-সুধাপানে নিবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় প্রহরী তাঁহাকে কুর্নিশ করিয়া জানাইল যে, একটা কাফের চুপে চুপে শিবিরে আসিতেছিল, সে ধরা পড়িয়াছে। সেনাপতি সুরা-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"শির লে আও।"

প্রহরী কুর্নিশ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি আবার আদেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"আজ কয়েদে রাখ, কাল হাজির করিও।"

প্রহরী চলিয়া গেল। সেনাপতি সাহেব এক গ্লাস সিরাজি পান করিয়া বলিলেন,—"কাফের জাহান্নামে যাউক, ঠুংরী চালাও।" নর্ত্তকীগণ অপ্সরাকণ্ঠে আবার ঠুংরী ধরিল।

এ দিকে প্রহরী আসিয়া সকলকে সেনাপতির আদেশ জানাইল। তখন তাহারা রামরূপকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া কড়া পাহারায় রাখিয়া দিল। রামরূপ মনে মনে বলিল,—"উল্টা বুঝিলি রাম।"

---

## নবম পরিচ্ছেদ

### অনুতাপ না প্রতিহিংসা?

ঠিক সেই সময়ে পার্ব্বতী আপনার কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, "রামরূপ কাইবে, কৃষ্ণকান্ত

যাইবে, শঙ্কর যাইবে। থাকিবে কে? কেহই না। রামরূপ তো একটা পশু, সে যাইলেই কি, থাকিলেই কি? আর কৃষ্ণকান্তের তো কথাই নাই। কিন্তু শঙ্কর?" পার্ব্বতীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল, এ কি করিলাম? শঙ্কর যদি গেল, তবে থাকিল কে—রহিল কি? কাহার জন্য আমার এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান? কিন্তু শঙ্কর—শঙ্কর আমার কে? সে আমার সর্ব্বস্ব — না না, শঙ্কর আমার শত্রু। সে পদে পদে আমাকে অবমানিত—পদদলিত করিয়াছে; আমার সর্ব্বস্ব চুরী করিয়া আমাকে পথের কাঙ্গালিনী সাজাইয়াছে; আমাকে পাপের পথে টানিয়া আনিয়া সে কৃতঘ্ন আপনি সরিয়া গিয়াছে; আমার বুকে তুষের আগুন জ্বালাইয়া সে নিষ্ঠুর দূর হইতে হাসিতে হাসিতে আমার যন্ত্রণা দেখিয়াছে; সহানুভূতির একবিন্দু বারি দিয়াও সে আমার যন্ত্রণা-নিবারণের চেষ্টা করে নাই। তাহাকে পূর্ণাহুতি দিয়া এ মহাযজ্ঞের সমাপ্তি করিব।"

পার্ব্বতীর নয়নে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, দন্তে অধর নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। সে অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এ ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না। অল্পক্ষণ পরেই তাহার হৃদয়ের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, প্রজ্বলিত নেত্র সজল হইল, দশন-পীড়িত অধর কাঁপিয়া উঠিল। পার্ব্বতী উভয় হস্তে বক্ষ চাপিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। অশ্রু-রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"শঙ্কর শঙ্কর! কেন তুমি এ কালসাপিনীর মস্তকে পদাঘাত করিলে?"

সহসা পার্ব্বতী চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্ত গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন,—"পার্ব্বতি!"

পার্ব্বতী উত্তর করিল,—"কি?"

কৃ। শঙ্কর তোমার কে?

পা। কেহই নয়।

কৃ। সত্যকথা বল।

পা। বলিব না।

কৃষ্ণকান্ত লাফাইয়া শয্যার উপর উঠিলেন। তার পর দৃঢ়মুষ্টিতে পার্ব্বতীর কেশগুচ্ছ ধরিয়া বলিলেন,—"পাপীয়সি, শঙ্কর তোর জার।"

পার্ব্বতী তীব্র-দৃষ্টিতে কৃষ্ণকান্তের মুখের দিকে চাহিল; মুক্তকণ্ঠে বলিল,—"জার নহে, শঙ্কর আমার সর্ব্বস্ব।"

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পার্ব্বতীর কেশ ত্যাগ করিলেন। শয্যা হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন,—"এতদিনে সব বুঝিয়াছি। মূর্খ আমি, কুলটার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছি। আর যাহা নিজের জীবন হইতেও মূল্যবান্, সহস্র বৎসরের কঠোর সাধনাতেও যাহা দুর্লভ, পাষণ্ড আমি, দেশের সেই সুখের—সেই স্বাধীনতার মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছি। তোমার অপেক্ষা, পার্ব্বতি, আমি মহাপাপী, - এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে শঙ্করের—সেই মহাপাপীর শাস্তির প্রয়োজন।"

পার্ব্বতী স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"তবে শুন, শঙ্কর নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ। সে ইচ্ছা করিয়াই আমার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে নাই।"

কৃষ্ণকান্ত তীব্রস্বরে বলিলেন,—"যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছে। ধর্ম্ম নষ্ট করে নাই, কিন্তু প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া পরস্ত্রীর উত্তম ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছে।"

গর্জ্জন করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"মিথ্যা কথা। শঙ্কর দেবতা; সে আপনিই পাপের জাল ভেদ করিয়া পলাইয়াছে। সে আমাকে মজায় নাই, আমিই—"

পার্ব্বতী একটু থামিল, একটু ভাবিল। তার পর দুই হাতে বুক চাপিয়া বলিল,—"না, যাও,সেই আমাকে মজাইয়াছে, অবলার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। যাও —পাপীর শাস্তি দাও; শঙ্করের রক্তে স্নান করিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

কৃষ্ণকান্ত একবার তীব্রদৃষ্টিতে পার্ব্বতীর রোষদৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পার্ব্বতী সেইভাবেই বসিয়া ডাকিয়া বলিল,—"আরও শুন, যদি যথার্থ পাপীকে শাস্তি দিতে চাও, তবে রামরূপই সে শাস্তির উপযুক্ত পাত্র। সে কেবল আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সে ঘোর বিশ্বাসঘাতক।"

কৃষ্ণকান্ত তখন বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছেন। পার্ব্বতীর কথা তিনি শুনিতে পাইলেন না।

কৃষ্ণকান্ত যখন বাটীর বাহিরে আসিলেন, তখন সংসারটা তাঁহার চতুর্দ্দিকে সশব্দে ঘুরিতেছিল, রজনীর অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার একটা প্রেতমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে ভৈরবনৃত্য করিতেছিল, চারিদিক্ হইতে অবিশ্বাসের—প্রতারণার অট্টহাস্যধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তিনি উন্মাদের ন্যায় অস্থিরপদক্ষেপে মোগলশিবিরের দিকে চলিলেন।

কিয়দ্দূর যাইতেই জনৈক প্রহরী তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তিনি সরোষে বলিলেন, "পথ ছাড়িয়া দাও;"

প্রহরী বলিল,—"ছাড়িতে পারিব না।"

কৃ। কেন?

প্র। হুকুম নাই।

কৃ। কাহার হুকুম?

প্র। সেনাপতির।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন,—"সেনাপতি কে?"

প্রহরী কৃষ্ণকান্তকে চিনিত। সে বলিল,—"যাহার সর্ব্বনাশের জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছ।"

কৃষ্ণকান্ত সক্রোধে বলিলেন,—"চুপ্ রহ সয়তান!"

প্রহরী কোন উত্তর করিল না। তখন কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,"—আমাকে সেনাপতির নিকট লইয়া চল।"

প্রহরী একটা সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। তৎক্ষণাৎ আর একজন প্রহরী আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। প্রথম প্রহরী কৃষ্ণকান্তকে লইয়া শঙ্করের নিকট চলিল।

## দশম পরিচ্ছেদ

### পাপী কে?

এক আলোক-সমুজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া শঙ্কর ও রূপনাথ যুদ্ধ-বিষয়ক পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় প্রহরী কৃষ্ণকান্তকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকান্তকে দেখিয়া শঙ্কর আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রহরী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্ত না বসিয়াই বলিলেন,—"গ্রামের বাহিরে যাইতে কে নিষেধ করিয়াছে?"

শঙ্কর বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি করিয়াছি।"

কৃ। কি জন্য?

শ। গ্রাম হইতে কোন লোক বাহিরে গিয়া শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে পারে।

কৃ। যে ষড়যন্ত্র করিবে, সে কি গ্রামে বসিয়াই তাহা করিতে পারে না?

শ। পারে, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কা অল্প।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি মূর্খ, সেই জন্যই আশঙ্কার অল্পতা অনুমান করিতেছ। ষড়যন্ত্রকারী ভিতরে থাকিলে যতটা অমঙ্গলের সম্ভাবনা, বাহিরে থাকিলে ততদূর আশঙ্কা নাই।

রূপনাথ বলিলেন,—"অমঙ্গলাশঙ্কা অল্প করিবার জন্যই কি আপনি বাহিরে যাইতে চাহিতেছেন?"

কৃষ্ণকান্ত রোষকষায়িত লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! এ অনুস্বার-বিসর্গের সমস্যা নয়। এ সমস্যার মীমাংসার জন্য স্বতন্ত্র বুদ্ধির প্রয়োজন।"

রূপনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি এতটা অনুগ্রহ না করিলে বোধ হয়, এতদিনে সে অভাবটুকু পূরণ হইয়া যাইত।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"ঠাকুর! পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া প্রেমের উপাসনা করিতে করিতে দেশোদ্ধার করা যায় না। এ পথে অনেক কণ্টক, অসংখ্য বাধা। কৌশলে সেই সমস্ত কণ্টক উৎপাটিত করিয়া, সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের সকল লোকই একদিনে তোমার মত হয় না, সকলের হৃদয় তোমার মত স্বার্থবিসর্জ্জনে প্রস্তুত নহে। দেশে কোটি কোটি লোক—তাহাদের হৃদয় কোটি কোটি ভাবে গঠিত। সেই কোটি-ভাবাপন্ন হৃদয় কি কোন দিন একসূত্রে বদ্ধ হইতে পারে?"

রূপনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"পারে না বলিয়াই বাঙ্গালার পতন অনিবার্য্য।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"ভুল, ভুল; এত বিভিন্ন হৃদয় কোন দিনই এক হয় না, কোন দেশেরই ইতিহাসে ইহার প্রমাণ নাই। কিন্তু তুমি যদি শক্তিমান্ হও, তোমার হৃদয় যদি সবল হয়, তবে ছলে বলে, কৌশলে সেই সকল হৃদয়কে দমন করিবার চেষ্টা কর, সেই ভিন্ন-ভাবাপন্ন কোটি হৃদয়কে আপনার শক্তিশালী হৃদয়ের নিকট অবনত করাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও; দেখিবে, আশার সফলতা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাহা করিয়াছ কি? কেবল আপনার হৃদয় পানে চাহিয়া আর সকলকে উপেক্ষা করিয়াছ, কেবল এক একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছ, 'হায় বাঙ্গালি!' ঠাকুর! দেশের সকল লোক যে দিন তোমার মত সাধু পুরুষ হইবে, সেই দিন বাঙ্গালী সুখশয্যায় শয়ন করিয়া অনায়াসে দেশের উদ্ধারসাধন করিবে!"

রূপনাথ স্তম্ভিত-হৃদয়ে বসিয়া সকল কথা শুনিলেন। তার পর আসন ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকান্তের উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"আপনি জ্ঞানী, আপনি বুদ্ধিমান্, আপনি কার্য্যজ্ঞ; আপনি জানিয়া শুনিয়া কেন এমন কাজ করিলেন?"

কৃষ্ণ। বলিয়াছি তো, সকলের হৃদয় তোমার মত নহে।

রূ। যাহা হইবার হইয়াছে; কিন্তু এখন রক্ষা করুন। এখনও সময় আছে, উপায় আছে—এ রাজ্য আপনারই, আপনি এ বিপদে সহায় হউন।

কৃ। আর হয় না। রাজ্যে একদিন আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। এখন আমি চাই, দোষীর দণ্ড, পাপীর শাস্তি।

রূ। দেশের মুখ চাহিয়া কি সে সকল ভুলিতে পারেন না ?

কৃ। তাহা ভুলিবার নহে। যদি কেহ তোমার স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়া, তোমার কুলমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া এইরূপে তোমাকে উপদেশ দিত, তবে তুমি কি তাহা ভুলিতে পারিতে ঠাকুর? তুমি ভুলিলেও আমি ভুলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত রূপনাথের হস্ত হইতে আপনার হস্ত টানিয়া লইলেন। তার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখন অধিক কথার সময় নহে। আমাকে গ্রামের বাহিরে যাইতে দিবে কি না বল ?"

শঙ্কর নতমুখে বলিলেন,—"ক্ষমা করিবেন, তাহা হয় না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"তবে আমি প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমি ষড়যন্ত্রকারী, তোমাদের শত্রু, আমাকে বধ কর।"

রূপনাথ বলিলেন,—"আপনি যে ষড়যন্ত্রকারী, তাহা অনেকদিন হইতে জানি, তথাপি আপনাকে আমরা বধ করি নাই, করিবও না।"

কৃ। ছিঃ, তোমরাই দেশোদ্ধার করিবে ?

রূ। আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, দেশোদ্ধার আমাদের ব্রত নয়, অত্যাচার-দমনই আমাদের মুখ্যব্রত। নতুবা আপনাকে আজও নিজের বুদ্ধিগৌরবে স্ফীত হইতে হইত না। আমরা জানি, আপনাকে বিনাশ করিলেই এ ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হইবে না। সত্য বলুন দেখি, এ ষড়যন্ত্রের মূল কি আপনি ?

কৃষ্ণকান্ত বদন বিনত করিলেন। রূপনাথ বলিলেন,—"কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়েই আমরা এই ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিতে পারি নাই। আপনি জ্ঞানহীন, অন্ধমাত্র, নতুবা একজন বিশ্বাসঘাতক লম্পটের হস্তে আপনার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নির্দ্দোষীর শান্তির জন্য এরূপ কুটিল বজ্র উদ্যত করিতেন না।"

কথাগুলা কৃষ্ণকান্তের মর্ম্মে আঘাত করিল। তিনি নীরবে অবনত বদনে গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, শঙ্কর প্রহরীকে ডাকিয়া তাঁহাকে ইচ্ছামত স্থানে রাখিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আর গ্রামের বাহিরের দিকে না গিয়া আপনার ভবনাভিমুখে চলিলেন।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### শেষপূজা।

প্রভাতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া মোগলশিবির হইতে কামান গর্জ্জিল, 'গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্'; সঙ্গে সঙ্গে ছয় সহস্র মোগলসৈন্য 'আল্লা হো আকবর' রবে প্রভাতগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া অগ্রসর হইল। হিন্দুসৈন্যগণও প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারাও 'জয় জগদীশ হরে' গাহিতে গাহিতে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল।

তখন মুসলমান-পক্ষ হইতে কামানের জ্বলন্ত গোলা আসিয়া হিন্দুসৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল; হিন্দুপক্ষ হইতেও অগ্নিময় গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া মুসলমানসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে থাকিল। ছয় সহস্র মোগলসৈনিকের সহিত দুই সহস্র হিন্দুসৈন্যের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ বন্দুক উত্তোলন করিয়া পরস্পরের উপর গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। সংখ্যাধিক শত্রুসৈন্যের অগ্নিবাণবর্ষণে দলে দলে হিন্দুসৈন্য পড়িতে থাকিল। কিন্তু ইহাতে তাহারা কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণে শত্রু বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। রূপনাথ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর অগ্রে থাকিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে থাকিলেন।

তার পর যখন উভয় সৈন্য পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সকলে বন্দুক ছাড়িয়া অসি ধারণ করিল। সমবেত হিন্দুসৈন্য একবার উচ্চকণ্ঠে গাহিল—'জয় জগদীশ হরে!' তার পর তাহারা অসিহস্তে ভীমপরাক্রমে সেই শত্রুসৈন্যসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পাইক সৈন্যগণও তাহাদের অনুসরণ করিল। কিন্তু এবার বিপক্ষগণ রীতিমত ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, হিন্দুসৈন্যগণ তাহাদের সে ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না। পাষাণগাত্র-প্রহত সাগরতরঙ্গবৎ তাহারা বার বার প্রতিহত ও পশ্চাদ্বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। অনেক সৈন্য মরিল, আহত হইল, রক্তস্রোতে রণস্থল প্লাবিত হইল, আহত ও মৃত সৈনিকের দেহে প্রান্তর পরিপূরিত হইয়া গেল; আহতের আর্ত্তনাদ, বীরের হুঙ্কার, অস্ত্রের ঝনঝনা মিলিত হইয়া রণভূমি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সন্ধ্যার সময় সে দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত হইল। জয়-পরাজয় নির্ণীত হইল না। কিন্তু হিন্দুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

রূপনাথ সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া কমলাকে বলিলেন,—"কমলা! আজি শেষ দিন।"

কমলা অকম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"বুঝিয়াছি।"

রূপনাথ বলিলেন,—"কিন্তু কমলা! আমার একটি শেষ অনুরোধ আছে।"

কমলা বলিল,—"বল, এখনও কি মরিতে বারণ করিবে?"

রূপনাথ বলিলেন,—"না। কিন্তু কমলা! তুমি বাঙ্গালীর মেয়ের মত মরিও না। স্বামীর সহিত জলন্ত চিতায় দগ্ধ হইলে যদি অক্ষয় বৈকুণ্ঠ থাকে, তাহা থাক, তুমি তাহার লোভ করিতে পাইবে না। অন্ততঃ একজন শত্রু মারিয়াও তোমাকে মরিতে হইবে, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।"

কমলা বলিল,—"পারিব কি?"

রূপনাথ বলিলেন,—"কেন পারিবে না? সে দিনকার কথা কি মনে নাই কমলা?"

ম্লান হাসি হাসিয়া কমলা বলিল,—"তাহাই হইবে।"

রূপনাথ সহর্ষে কমলাকে আলিঙ্গন করিলেন। শক্তির সহিত কর্ম্মের শেষ সম্মিলন হইল। রূপনাথ বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি কমলা, বৈকুণ্ঠের উপরেও যদি কোন পুণ্যলোক থাকে, তবে তুমিই তাহার অধিকারিণী।"

রূপনাথ বিদায় হইলেন। কমলা মনে মনে বলিল,—"আমি বৈকুণ্ঠ চাহি না, তোমার আদেশই আমার বৈকুণ্ঠ, তুমিই আমার বৈকুণ্ঠেশ্বর।"

কমলা বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তার পর উঠিয়া সেই মরিচাধরা তরবারিখানা খুঁজিয়া বাহির করিল। সবিস্ময়ে দেখিল, তাহাতে আর মরিচার নামমাত্রও নাই, তাহা এক্ষণে সুশাণিত, সুতীক্ষ্ণ। কমলা বুঝিল, ইহা স্বামীরই কাজ। তখন তরবারি যথাস্থানে রাখিয়া সে স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরিল, সীঁথায় উজ্জ্বল করিয়া সিঁদুর দিল, অলক্তকে পদদ্বয় রঞ্জিত করিল, সুদীর্ঘ কুন্তলরাশি এলাইয়া দিল, মৃণাল-জড়িতা ফণিনীর ন্যায় কৃষ্ণ কেশদাম তাহার পৃষ্ঠ অংস ঢাকিয়া দুলিতে লাগিল। তার পর কমলা দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজা করিতে বসিল।

পূজা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় বাহিরে একটা কোলাহল উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কে দ্বারে ভীষণ আঘাত করিল। একবার, দুইবার, তিনবার আঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল। কমলা দেখিল, ভগ্ন দ্বারপার্শ্বে চারিজন মুসলমান। মুহূর্ত্তের জন্ত তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্ত সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর আদেশ মনে পড়িল, তাঁহার শেষবাসনা পূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল। কমলা মনে মনে ডাকিল,—"কোথায় আমার দেবতা। তোমার দাসীর হৃদয়ে বল দাও। চিরদিন তোমারই পূজা করিয়া আসিয়াছি, আজি শেষ দিন তোমারই আদেশে শত্রুশোণিতে একবার মা'র পূজা করিব।"

তখন মুসলমানেরা ঘরের ভিতর আসিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে কমলা কটিদেশে বস্ত্রাঞ্চলটা জড়াইয়া ফেলিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সিন্দূররঞ্জিত তরবারিখানা তুলিয়া লইয়া 'মার্ মার্' শব্দে মুসলমানগণের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। হতভাগিনী বঙ্গভূমি বুঝি সেই দিন একবার শেষ হাসি হাসিয়া উঠিল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### ঘাতক না বন্দী?

এ দিকে যুদ্ধান্তের পূর্ব্বে বন্দী রামরূপকে লইয়া প্রহরী ফৌজদারের দরবারে হাজির করিল। পূর্ব্বদিন রামরূপ শিবিরের একপাশে পড়িয়া এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতেছিল। চারিদিক্ হইতে জলন্ত গোলাগুলী আসিয়া শিবিরের নিকট পড়িয়াছিল। রামরূপ প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করিতেছিল, এখনই উহার একটা আসিয়া তাহার সকল আশা-ভরসার শেষ করিয়া দিবে। হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, পলায়নেরও উপায় নাই। অগত্যা রামরূপ উদ্বেগে আশঙ্কায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল। এক একটা জলন্ত গোলা ছুটিতে দেখিলেই সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সভয়ে মৃত্যুর করালমূর্ত্তি কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবলেই হউক অথবা দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়াই হউক, তাহা ঘটিল না। যুদ্ধ শেষ হইলে সে প্রহরীর নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিল এবং পরদিন যুদ্ধকালে যাহাতে এইখানে পড়িয়া থাকিতে না হয়, তজ্জন্ত অনেক অর্থের লোভ দেখাইয়া প্রহরীকে একটা উপায় করিতে বলিল। প্রহরী সান্ত্বনা দিয়া পরদিন যুদ্ধান্তের পূর্ব্বেই তাহাকে ফৌজদারের নিকট উপস্থিত করিল।

ফৌজদার সাহেব রামরূপকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহার বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। রামরূপ বলিল,—"আমার সহিত দুই শত সৈন্ত প্রেরণ করুন।"

রস্তম আলি বলিলেন,—"তুমি সৈন্য লইয়া কি করিবে ?"

রা। কৌশলে আপনার যুদ্ধজয় করাইয়া দিব।

র। কেন, আমরা কি যুদ্ধজয় করিতে পারিব না ?

রা। কেবল সম্মুখ-যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হইবে।

র। কেন ?

রা। একজনও হিন্দুসৈন্য জীবিত থাকিতে যুদ্ধ-জয়ের আশা নাই।

র। একজনও জীবিত থাকিবে না।

রা। কিন্তু যাহার জন্য আপনার এত আয়োজন, তাহাকে ততক্ষণে আর পাইবেন না।

র। কাহাকে পাইব না ?

রা। কমলাকে।

র। সে কোথায় যাইবে ?

রা। যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলেই সে—হিন্দুরমণীরা যাহা করিয়া থাকে, তাহাই করিবে।

র। মরিবে ?

রা। নিশ্চয়ই।

র। তাহার পূর্ব্বে তুমি তাহাকে হস্তগত করিতে পারিবে ?

রা। দুইশত সৈন্যের সহায়তা পাইলেই পারিব।

র। আর একবার তুমি এই ভার লইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলে ?

রা। তখন আমি উপযুক্ত সাহায্য পাই নাই। বিশেষতঃ এখন সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত।

র। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। কিন্তু কেন তুমি এ কাজ করিবে ?

রা। আমার স্বার্থ আছে।

র। কি স্বার্থ ?

রা। যুদ্ধ শেষ হইলে বলিব।

ফৌজদার সাহেব রামরূপকে বেশ চিনিতেন, সুতরাং তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রামরূপকে দুই শত সৈন্য প্রদান করিলেন। রামরূপ সেই দুই শত সিপাহী লইয়া সহর্ষে পূর্ব্বোক্ত পথে যাত্রা করিল। লোকে এক ঢিলে দুইটা পাখী মারে, কিন্তু রামরূপ এক ঢিলে অনেকগুলা পাখী মারিবার উদ্যোগ করিল।

অল্পক্ষণ পরেই যুদ্ধ বাধিল। শঙ্কর দেড় সহস্র সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। রণজিৎ রায় স্বয়ং অশ্বারোহণে আসিয়া সৈন্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই পঞ্চদশ শত সৈন্যের বাহুতে যেন পঞ্চদশ সহস্র যোদ্ধার বল আসিল। তাহারা অমিতবিক্রমে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিল। তাহাদের সেই উৎসাহ, সেই বিক্রম দেখিয়া বিপক্ষগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। পর মুহূর্ত্তেই তাহারা ভীমবেগে সেই সৈন্যশ্রেণীর উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া মারিবার জন্য অগ্রসর হইল। অদূরে চারি শত পাইক সৈন্যসহ দাঁড়াইয়া রূপনাথ এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। সে দিন তিনি লাঠীর পরিবর্ত্তে তরবারি ধারণ করিয়াছেন।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### আবদুলের পুরস্কার।

প্রভাতে কৃষ্ণকান্ত দেখিলেন, কিয়দ্দূরে নদীর পরপারে প্রায় একশত নৌকা বাঁধা আছে। দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তখন ইহার কারণ অনুসন্ধান নিমিত্ত উচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া একদল সৈন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা সংখ্যায় অনুমান সাত আট শত হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহারা অনেক দূর আসিয়া পড়িল। কৃষ্ণকান্ত চিনিলেন, ইহারা পাইক সৈন্য। তখন বুঝিলেন, এই জন্যই পরপারে নৌকা রহিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত চিন্তিতান্তঃকরণে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন: কিন্তু কামান ও বন্দুকের ধূমরাশি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সহসা তাঁহার দৃষ্টি বামভাগে নিপতিত হইল। সবিস্ময়ে দেখিলেন, আর এক দল সৈন্য দক্ষিণদিক্ হইতে নদীতীরের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। কৃষ্ণকান্ত তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিয়াই চিনিলেন, ইহারা মোগল সৈন্য। দেখিলেন, তাহাদের অগ্রে রামরূপ। তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট বদন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাসাদ হইতে দ্রুত অবতরণ করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া মোগল সৈন্যগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই দুই শত সিপাহী সহ রামরূপ তথায় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকান্ত রামরূপকে বলিলেন,—"এই সকল সৈন্য কোথায় যাইবে ?"

রামরূপ বলিল,—"নগর অধিকার করিতে।"

কৃ। ইহারা তোমার আদেশ পালন করিবে?

রা। করিবে।

কৃ। ঐ যে নদীর ওপারে নৌকাগুলা বাঁধা আছে, ইহাদিগকে ঐগুলা এপারে আনিতে আদেশ কর।

রা। কেন?

কৃ। এখনই দেখিতে পাইবে।

তখন রামরূপের আদেশে প্রায় পঞ্চাশ জন সিপাহী নৌকায় আরোহণ করিয়া পরপারে উপস্থিত হইল এবং পরপারস্থিত নৌকা সকল ফিরাইয়া আনিতে মাঝিদিগকে আদেশ করিল। মাঝিরা কেহ কেহ ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু সিপাহীদের উদ্যত সঙ্গীন দেখিয়া ভয়ে ভয়ে নৌকা পরপারে আনিতে বাধ্য হইল। সমস্ত নৌকা আসিলে কৃষ্ণকান্ত দাঁড়ী-মাঝিগণকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া সভয়ে প্রস্থান করিল। কেবল একজন মুসলমান মাঝি সেলাম করিয়া বলিল,—"খোদাবন্দ। আমাদের জানবাচ্চা মারা যাবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—"কোন ভয় নাই, আমি তাহার উপায় করিব।"

মাঝি সভয়ে একবার কৃষ্ণকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। রামরূপ দেখিল, মাঝির চোখ দুটা যেন জ্বলিতেছে। সে মাঝি আর কেহ নহে, আবদুল।

অনতিকাল পরে আট শত পাইক সৈন্য আসিয়া নদীর পরপারে দাঁড়াইল। তাহারা একবার ব্যগ্রদৃষ্টিতে চারিদিকে নৌকার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু দেখিল, নৌকা সকল পরপারে, সেখানে দুই শত সশস্ত্র সিপাহী দণ্ডায়মান। তখন তাহারা "মাঝি মাঝি" বলিয়া চীৎকার করিল। তাহাদের সে চীৎকার নদীবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সিপাহীগণ হাসিয়া উঠিল। পাইকগণ বুঝিতে পারিল, নৌকা শত্রুরা অধিকার করিয়াছে। এ দিকে নদীর একটানা স্রোত, পার হইবার উপায় নাই। তথাপি কয়েকজন পাইক সাহস করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইচ্ছা—পরপারে গিয়া নৌকা আনিবে। কিন্তু তাহারা অর্দ্ধপথে না আসিতেই রামরূপের আদেশে সিপাহীগণ তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিল। গুলীর আঘাতে অনেকেই আহত হইয়া নদীস্রোতে ভাসিয়া চলিল। তখন পাইকগণ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তাহারা সতৃষ্ণ-নয়নে পরপারের দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রামরূপ সেখানে এক শত সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট এক শত সৈন্যসহ রণজিতের প্রাসাদ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইল।

তাহাদের গমনের কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণকান্তের স্মরণ হইল, রণজিৎ রায়ের প্রাসাদে চন্দ্রা আছে। স্মরণমাত্র তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। প্রাসাদ লুণ্ঠনকালে সিপাহীগণের হস্তে চন্দ্রা কিরূপ লাঞ্ছিত হইবে, তাহা ভাবিয়া তিনি অস্থির হইলেন। তখন সৈন্যগণকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া তিনিও সেই দিকে ছুটিলেন। পার্ব্বতী গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। কৃষ্ণকান্তকে ছুটিতে দেখিয়া সেও গবাক্ষ রুদ্ধ করিল।

এ দিকে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর হিন্দুপক্ষ ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিল, বিপক্ষের প্রবল আক্রমণে তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িল। তাহারা কেবল রূপনাথের উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উত্তেজিত হইয়াই তখনও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু সেই অগণ্য মোগলসৈন্যের সম্মুখে তাহারা কেবল নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। তথাপি কেহ পশ্চাৎপদ হইল না। রূপনাথ ব্যগ্রদৃষ্টিতে বার বার পশ্চাতে চাহিতে লাগিলেন, প্রতিমুহূর্ত্তেই পাইক সৈন্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই আসিল না। শেষে আবদুল আসিয়া যে নির্ঘাত সংবাদ দিল, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আবদুল তাঁহার নিকট দুই শত সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু রূপনাথ দেখিলেন, যুদ্ধস্থলে সাত শতাধিক সৈন্য নাই। ইহার মধ্য হইতে দুই শত সৈন্য দিলে যুদ্ধ আর চলিবে না। অগত্যা তিনি আবদুলের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিলেন না। হতাশ হইয়া আবদুল তখন ক্ষুব্ধহৃদয়ে, যেখানে শঙ্কর প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প সৈন্যগণকে পরিচালনা করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া ঘর্ম্মার্দ্র-কলেবরে শঙ্করকে সেলাম করিল। শঙ্কর বলিলেন,—"কি আবদুল?"

আবদুল ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে বলিল,—"আমায় সেই বখ্‌শিশ্‌ দিন।"

শঙ্কর একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—"কি চাও বল?"

আবদুল বলিল,—"আমি কৃষ্ণকান্তের মাথাটা চাই।"

শঙ্কর বলিলেন,—"অন্য প্রার্থনা কর।"

আবদুল দৃঢ়স্বরে বলিল,—"অন্য প্রার্থনা নাই।"

শঙ্কর বলিলেন,—"তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার শক্তি আমার নাই।"

আবদুল বলিল,—"তবে, গোলামকে মরিতে হুকুম দিন।"

আবদুলের স্বর অভিমানে ভগ্ন। শঙ্কর স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন,—"এ প্রার্থনা কেন আবদুল ?"

——ল হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"কেন ? ডাইয়া মনিবের সর্ব্বনাশ দেখিতে পারিবে ল সে মনিবের কাজ উদ্ধার করিতে পারে ়াটশত পাইক তাহার মুখ চাহিয়াছিল, কিন্তু নন, তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। সে ; ঠাকুব গোলযোগের ভয়ে তাহার হাতে অস্ত্র দেয় নাই। তাই বিশ্বাসঘাতকের াকে মনিবের কাজ ফেলিয়া পলাইতে হই- আবদুল কাজ করিতে পারে নাই, আর কেন ?"

ল কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার এই স্বার্থশূন্য ঙ্করের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি বলি- াবদুল! স্থির হও।"

ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে আবদুল বলিল,—"আজ গোলাম স্থির হইবে। সেলাম হুজুর, এ গোলাম বে না, আর বখশিস্ চাহিবে না।"

শেষ করিয়াই আবদুল নিকটস্থ জনৈক মৃত একখান অস্ত্র কুড়াইয়া লইল এবং ছুটিয়া সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শঙ্কর —"আবদুল! আবদুল!"

আবদুল তখন সৈন্য-সাগরে মিশিয়া গিয়াছে। টা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অল্পক্ষণ কটা ভীত কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বসিয়া সবিস্ময়ে দেখি- াবদুল সেই মোগল-সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া দারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, চারিদিক্ ক্ষকগণ তাহাকে বাধা দিবার জন্য চীৎকার রিতে ছুটিয়াছে। শঙ্কর আর থাকিতে পারি- আবদুলের অভিমানক্ষুব্ধ শেষ স্বর তখনও র্ণে বাজিতেছিল,—"গোলাম আর ফিরিবে চনি আবদুলের রক্ষার্থ সেই দিকে অশ্ব ছুটাই- গণ তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিল।

অধিক দূর না যাইতেই শঙ্কর দেখিলেন, ক্ষগ্রহস্তে ফৌজদারের শারীররক্ষক ষ্টরের মস্তক ছিন্ন করিল। পার্শ্ব হইতে কজন সিপাহী ছুটিয়া আসিল, কিন্তু আবদুল ায় অসিচালনা করিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী াগিল। অশ্বপৃষ্ঠস্থিত রস্তম আলি উহা। তিনি অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়া আবদুলের স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া অসি তুলিলেন। আবদুল একবার তাঁহার দিকে চাহিল; পিতৃঘাতী, পুত্রঘাতী, আততায়ী শত্রুকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল; উত্তপ্ত পাঠানশোণিত তাহার শিরায় শিরায় দ্রুতবেগে ছুটিল। সে একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—"আল্লা!" পরক্ষণেই—ফৌজদারের উত্থিত অসি তাহার স্কন্ধে না পড়িতেই সে লাফাইয়া উঠিল; মুহূর্ত্তে তাহার অসি চমকিত হইয়া রস্তম আলির স্কন্ধে সবেগে পতিত হইল, ফৌজদার সাহেবের মস্তকহীন দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ চারিদিক্ হইতে শত অসি উত্থিত হইল; ক্ষণমধ্যেই আবদুলের রক্তাক্ত দেহ ফৌজদার সাহেবের দেহের উপর পতিত হইল। শঙ্কর নয়ন মার্জ্জনা করিলেন।

এ দিকে যুদ্ধনিরত রণজিৎ যখন শুনিলেন যে, প্রাসাদ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তখন তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি শঙ্করকে ডাকিয়া তাঁহাকে প্রাসাদরক্ষার্থ যাইতে আদেশ করিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে শত্রুমধ্যে ফেলিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে বৃদ্ধের কঠোর আদেশ শুনিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। শঙ্কর চলিয়া গেলে রণজিৎ ভক্তিপূর্ণকণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা! মা! আসিবার সময় হইয়াছে, এবার তবে আয় মা!" কিন্তু তিনি বুঝিলেন, এখনও আসিতে বিলম্ব আছে, এখনও ঠিক সময় হয় নাই, এখনও তিনি অক্ষতদেহে রণস্থলে দণ্ডায়মান। চিন্তামাত্র রণজিৎ দ্রুত অশ্ব চালাইয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোগল-সৈন্যগণ 'আল্লা হো আক্‌বর' শব্দে চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। দূর হইতে রূপনাথ ইহা দেখি-লেন; তিনি দুইশত পাইক সৈন্য লইয়া রণজিতের সাহায্যার্থ ছুটিলেন।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

### বলিদান।

কৃষ্ণকান্ত দ্রুতপদে রণজিৎ রায়ের প্রাসাদ-সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, সিপাহীগণ প্রাসাদ আক্রমণ করি-য়াছে। পঞ্চবিংশতি জনমাত্র প্রহরী প্রাসাদরক্ষায় নিযুক্ত ছিল; তাহারা প্রাণপণে সিপাহীগণকে বাধা দিতেছে। কিন্তু একশত সিপাহীর সম্মুখে সেই কয়-জন প্রহরী কতক্ষণ দাঁড়াইবে? অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই তাহারা একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিংশতিজন প্রহরী, সিপাহীর অস্ত্রে

আহত হইয়া ধরাশয়ন করিল, কেবল পাঁচজন মাত্র প্রহরী তখনও দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের বাধা দিতে লাগিল। উন্মত্ত সিপাহীগণ 'আল্লা হো আকবর' রবে চীৎকার করিতে করিতে সেই পাঁচজন প্রহরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"চন্দ্রা! চন্দ্রা!" রামরূপ তাঁহার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটী করিল।

এমন সময় কে ঐ ছুটিয়া আসে রমণী? কৃষ্ণকান্ত সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, আলুলায়িতকুন্তলা, অসিকরা এক রমণী দানব-দলনী মূর্ত্তিতে ছুটিয়া আসিতেছে; রমণীর বসনাঞ্চল কটিদেশে বিজড়িত, পূর্ণেন্দুসুন্দর মুখমণ্ডল রোষদীপ্ত, আয়ত লোচনযুগল বিঘূর্ণিত, মৃণালকোমল ভুজে তীক্ষ্ণধার অসি রবিকিরণে ঝলসিত! রমণী মুহূর্ত্তে সেই উন্মত্ত সিপাহীশ্রেণী ভেদ করিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তে তাহার করধৃত অসি সম্মুখস্থ সিপাহীর বক্ষঃ ভেদ করিল; শোণিত-রঞ্জিত অসি ঘন ঘন নাচিতে লাগিল।

সেই ভীমা প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া সিপাহীগণ স্তম্ভিত হইল, রামরূপ সভয়ে পিছাইয়া আসিল; কৃষ্ণকান্ত ছুটিয়া গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উন্মাদকণ্ঠে বলিলেন,—"চন্দ্রা—আমার চন্দ্রা কোথায়?"

রামরূপ তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল, তার পর হস্তস্থিত অসি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার স্কন্ধে প্রচণ্ড আঘাত করিল। রামরূপ একবার ফিরিয়া চাহিল, একবার কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"পার্ব্বতি!" পরক্ষণেই তাহার শোণিতপ্লুত দেহ পার্ব্বতীর পাদমূলে লুণ্ঠিত হইল। "এখন চন্দ্রা কোথায়?" বলিয়া পার্ব্বতী সরোষে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিল, তার পর অসিহস্তে উন্মাদিনীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিতা হইল।

কিন্তু কয়েকপদ না যাইতেই পার্ব্বতী দেখিল, শঙ্কর অশ্ব ছুটাইয়া বায়ুবেগে সেই দিকে আসিতেছেন। পার্ব্বতী দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তমধ্যে শঙ্কর প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িলেন। তখন পার্ব্বতী যেন শঙ্করের মুখে শত যমদূতের ভীষণ ভ্রূকুটী দেখিতে পাইল, তাঁহার নয়নে প্রতিশোধের করাল বহ্নিশিখা দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পর-মুহূর্ত্তেই সে হস্তস্থিত অসি আপনার বক্ষে সবলে বিদ্ধ করিয়া দিল। শঙ্কর নিকটে না আসিতেই তাহার জীবনশূন্য দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। শঙ্কর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, পার্ব্বতীর দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, অতৃপ্ত-বাসনার শত হাহাকার হৃদয়ে লইয়া পার্ব্বতী অনন্ত নরকের পথে যাত্রা করিয়াছে। শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্বে কশাঘাত করিলেন।

তখন ভৈরবীরূপিণী রমণীর অস্ত্রাঘাতে অনেক সিপাহী গতাসু হইয়াছে। অবশিষ্ট সিপাহীগণ বার বার তাহাকে আক্রমণ করিয়াও বিফলকাম হইতেছে; তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে। এমন সময় শঙ্কর আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সিপাহীগণ আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহারা যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তার পর শঙ্কর দ্বারমধ্যস্থিত সেই রমণীমূর্ত্তি দেখিলেন, দেখিয়াই চিনিলেন। তিনি ভক্তিবিহ্বল-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা, মা! এ কি দেখি মা?"

শঙ্কর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া প্রণাম করিলেন। রমণী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"তোমার গুরুপত্নীর আদেশ, তুমি আর যুদ্ধে যাইও না শঙ্কর।"

রমণী দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইল। শঙ্কর মুগ্ধনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর রমণীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া আহত রামরূপের নিকট দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণকান্ত তখনও স্তম্ভিতের ন্যায় সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিলেন।

শঙ্কর দেখিলেন, রামরূপের আঘাত গুরুতর। তিনি ডাকিলেন,—"রামরূপ!"

রামরূপ অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল,—"বড় যন্ত্রণা!"

শঙ্কর বলিলেন,—"ভয় নাই, শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেছি।"

রামরূপ বলিল,—"না, আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার মৃত্যু নিকট।"

শ। আমি তোমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব।

রা। কেন?

শ। তুমি মহাপাপী হইলেও এখন আহত—দয়ার পাত্র।

রা। বাঁচাইতে পারিবে না। তবে যদি আর একটা উপকার—

শ। কি বল।

রা। চন্দ্রাকে ক্ষমা করিতে বলিও।

শ। তুমি তাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছ?

রা। অপরাধের সীমা নাই। আমি তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু—

শঙ্কর রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন,—"কিন্তু কি?"

রামরূপ একটু থামিয়া আরও ক্ষীণস্বরে বলিল,

—"কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয় নাই। এখনও ধর্ম্ম আছে।"

শ। চন্দ্রা তোমায় ভালবাসে ?

রা। ভালবাসিলে বুঝি এরূপে মরিতে হইত না।

একটু বিশ্রাম লইয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল,—"সে পাষাণী তোমাকেই ভালবাসে, আমি কেবল—পুড়িয়া —মরিলাম।"

শঙ্কর ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"আর একটা কথা, তাহার ধর্ম্ম ?"

রামরূপ শেষ নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল,—"তুমি—মূর্খ—সতীর—ধর্ম্ম, কার—সাধ্য,—ক্ষমা—ক্ষমা—"

রামরূপ চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। এতদিনে—বিসর্জ্জনের সময়ে পাপ ও লালসার বলিদান হইল।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### ব্রতোদ্যাপন।

একা বহুশত্রুবেষ্টিত হইয়াও রণজিতের হৃদয় কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। তিনি সেই জরাজর্জ্জর হস্তে যুবজনোচিত শক্তি দেখাইয়া সিংহবিক্রমে শত্রু বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক বীরত্ব, অসাধারণ রণকৌশল দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। কিন্তু একা তিনি, সেই অসংখ্য শত্রুসৈন্যের মধ্যে কতক্ষণ যুঝিবেন ? রূপনাথ তখনও শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ক্রমে রণজিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, অসিমুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল, দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিল, চারিদিক্ হইতে শত্রুর শাণিত কৃপাণ উত্থিত হইল। রণজিৎ আপনার অবস্থা বুঝিলেন, কিন্তু সে জন্য এতটুকুও কাতর হইলেন না। তিনি কেবল বারংবার সোৎসুক দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিতে লাগিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিতে থাকিলেন,—"মা ! মা !"

সহসা কে ঐ আসে রণরঙ্গিণী ? রণজিৎ স্থিরদৃষ্টিতে দেখিলেন, দৃপ্ত পদভরে রণাঙ্গন কম্পিত করিয়া কোটি-মার্ত্তণ্ডকিরণমণ্ডিতা, শোণিত-রঞ্জিত-বসনা,মুক্তকেশী, অসিকরা, ভীমারূপিণী বামা শত্রুসৈন্য পদদলিত করিতে করিতে ভৈরববিক্রমে ছুটিয়া আসিতেছে; বামার নয়নে বহ্নিশিখা জ্বলিতেছে, কুন্দদশনে রক্তাধর দংশিত হইতেছে, পদভরে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিতেছে, রূপের প্রভায় রণভূমি উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেই ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া—স্বয়ং বিশালাক্ষী দেবী খড়্গাকরে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ ভাবিয়া হিন্দুসৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রণজিৎ ভক্তি উদ্বেলিত-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা ! মা ! আয় মা—সব কথাটা শেষ হইল না, শত্রুচালিত একটা তরবারি আসিয়া তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। বৃদ্ধের কম্পিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতেছিল, রূপনাথ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সেই অবসন্ন দেহ ধরিয়া ফেলিলেন। রণজিৎ একবার ক্ষীণ-দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর সেই ব্রাহ্মণের ক্রোড়েই ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় চিরমুদ্রিত করিলেন। রূপনাথের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সহচর পাইকগণও আসিয়া জুটিল। রূপনাথ তাহাদের কয়েক জনের হস্তে রণজিতের দেহরক্ষার ভার দিয়া অসিহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একবার উদাস-দৃষ্টিতে রণভূমির চতুর্দ্দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁহার সহচর একশত সৈন্য ব্যতীত প্রায় আর সকলেই একে একে ধরাশায়ী হইয়াছে। কেবল কিছু দূরে শতাধিক মাত্র সৈন্য দুই সহস্র বিপক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া তখনও অমিতবিক্রমে শত্রুসংহার করিতেছে। রূপনাথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া একবার পশ্চাতে চাহিলেন, কমলার ভীষণ সংহারিণী মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। অমনই তিনি ভীম হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া শত্রুসৈন্য-মণ্ডলীমধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। রুদ্রকণ্ঠে একবার শেষ ডাকিলেন, "জয় জগদীশ হরে !" একশত পাইকের কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল—"জয় জগদীশ হরে !"

দলে দলে শত্রুসৈন্য আসিয়া রূপনাথ ও তাঁহার অনুচরগণকে বেষ্টন করিল। পাইকগণ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই অসংখ্য শত্রুর সহিত এই কয়জন অস্ত্রহীন লাঠিমাত্রসম্বল সৈন্য অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিল না, অচিরেই তাহারা একে একে ধরাশয়ন করিতে লাগিল। কিন্তু একজনও পশ্চাৎপদ হইল না। তখন রূপনাথের বাহ্যজ্ঞান এক প্রকার তিরোহিত। তাঁহার হস্তস্থিত অসি কেবল ঘুরিতেছে, আর রাশি রাশি শত্রুমুণ্ড পদতলে লুটাইতেছে। সেই স্তূপীকৃত শত্রুমুণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া রূপনাথ রুদ্রমূর্ত্তিতে কেবল শত্রু সংহার করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিতেছেন, 'জগদীশ !' শত্রুগণ দৃঢ়সংকল্প সহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে।

এ দিকে শত্রু সংহার করিতে করিতে কমলা তাঁহার নিকটে আসিল। বিপক্ষগণ সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে বিস্ময়ে মরিয়া যাইতে লাগিল। কমলা আসিয়া

রূপনাথের পার্শ্বে একবার দাঁড়াইল, একবার শোণিত-সিক্ত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ললাটের স্বেদ মোচন করিল। রূপনাথ ফিরিয়া চাহিলেন ঃ সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন. একবার ক্লান্ত কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"কমলা!"

সেই মুহূর্ত্তে একজন সৈনিক রূপনাথের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া বর্শা তুলিল; মুহূর্ত্তে কমলা লাফাইয়া রূপনাথের সম্মুখে পড়িল। বর্শা সবেগে আসিয়া কমলার কোমল বক্ষঃ ভেদ করিল, কমলা রূপনাথের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। রূপনাথ দৃঢ়-মুষ্টিতে অসি-চালনা করিয়া আঘাতকারীর মস্তক ছিন্ন করিলেন। তখন চারিদিক্ হইতে অসিধারা আসিয়া তাঁহার দেহের উপর পড়িতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা ছুটিল। তথাপি রূপনাথ যুদ্ধবিরত হইলেন না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অসিচালনা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর মুষ্টি ক্রমে শিথিল হইল, চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল, কম্পিত অবসন্ন হস্ত হইতে অসি খসিয়া পড়িল, পদতলে পৃথিবীটা ভীম শব্দে ঘুরিতে লাগিল। রূপনাথ আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার শোণিতাপ্লুত কম্পিত অবসন্ন দেহ কমলার বক্ষের উপর পতিত হইল। বাঙ্গালার গগন বিদীর্ণ করিয়া একটা 'হায় হায়' শব্দ উঠিল; সূর্য্যদেব অস্তাচলে মুখ লুকাইলেন; একটা বিরাট অন্ধকারে দেশ আচ্ছন্ন হইল।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### বিসর্জ্জন না বোধন?

যুদ্ধশেষে ক্লান্ত মোগল-সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাগমন করিল। কয়েকজন অনুচরের সহিত শঙ্কর যুদ্ধস্থলে আসিয়া শবরাশির মধ্যে কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর যাহাকে খুঁজিতে-ছিলেন, তাহাকে পাইলেন। তিনি স্বহস্তে শবরাশি সরাইয়া রূপনাথের দেহ বাহির করিলেন। তখনও সে দেহে প্রাণ আছে। ভৃত্যের নিকট জল ছিল; শঙ্কর রূপনাথের মস্তক আপনার অঙ্কে রাখিয়া সেই জল অল্পে অল্পে তাঁহার মুখে দিতে লাগিলেন। অনেক-ক্ষণ পরে রূপনাথ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন; ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"মা!"

রুদ্ধকণ্ঠে শঙ্কর ডাকিলেন,—"ঠাকুর!"

রূপনাথ চক্ষু মেলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে চাহি-লেন। শঙ্কর বলিলেন,—"এ কি হইল ঠাকুর?"

রূপনাথ ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"কি হইল শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিলেন,—"কিছুই যে হইল না ঠাকুর?"

ধীরে ধীরে রূপনাথ বলিলেন,—"এই কয়টি জীবনের বিনিময়ে যাহা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে। অত্যাচারের দমন হইয়াছে, অত্যাচারী শাস্তি পাই-য়াছে, সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে। তবে আর দুঃখ কি শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিলেন,—"কিন্তু ইহাই কি শেষ?"

রূপনাথ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"শেষ নহে, ইহাই আরম্ভ—ইহাই বোধন।"

শঙ্কর বলিলেন,—"কিন্তু প্রতিষ্ঠা কবে হইবে?"

রূপনাথ আবার একটু জলপান করিলেন; তার পর একটু বিশ্রাম করিয়া বলিলেন—"তাহার এখনও অনেক দিন বাকী। এখনও বাঙ্গালী অশিক্ষিত, এখনও তাহারা আপনাকে চেনে নাই, এখনও তাহারা প্রাণ দিয়া মাতৃপূজা করিতে শিখে নাই।"

শঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"সে শিক্ষা আর কে দিবে ঠাকুর? আপনি যে চলিলেন?"

রূপনাথের মৃত্যুচ্ছায়া-কবলিত মুখের উপর হাস্যের ক্ষীণ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। তিনি শান্তকণ্ঠে বলিলেন, —"আমি কোথায় যাইব শঙ্কর? এমন সোনার বাঙ্গালা ছাড়িয়া কোন্ বৈকুণ্ঠে গিয়া সুখী হইব? এক জীবনে তো সব শেষ হয় না। অনন্ত জীবন, অনন্ত সংকল্প, অনন্ত কার্য্য। ভয় কি শঙ্কর? আবার আমি আসিব, আবার বাঙ্গালী হইয়া জন্মিব, আবার বাঙ্গালীকে মাতৃপূজা শিখাইব, আবার এমনই করিয়া মরিব।"

ক্রমে কণ্ঠ ক্ষীণ হইল, স্বর জড়াইয়া আসিল। রূপনাথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলি-লেন,—"আগে—বোধন—পরে—মার পূজা—মা—মা—আমার—"

কথা শেষ না হইতেই রূপনাথ ধীরে ধীরে নয়ন নিমীলিত করিলেন। শঙ্কর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তার পর শঙ্কর, ব্রাহ্মণদম্পতীর সেই শবদেহ ব্রাহ্মণ দ্বারা বহন করাইয়া বিশাই দীঘির তীরে আনিলেন। তথায় চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর দেহদ্বয় স্থাপিত করিয়া ভস্মীভূত করিলেন। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে চিতানল নির্ব্বাপিত হইল। বিশাই দীঘির জলে পবিত্র চিতাভস্ম ধৌত করিয়া শঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিলেন।

## উপসংহার

যুদ্ধজয়ের পর মোগল-সেনাপতি কৃষ্ণকান্তকে কৃত-কার্য্যের পুরস্কার দিতে চাহিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন অন্তরে অন্তরে কৃতকার্য্যের পুরস্কার ভোগ করিতেছিলেন। তিনি পুরস্কারস্বরূপে শঙ্করকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত সেনাপতিকে অনুরোধ করিলেন। সেনাপতি প্রথমে সম্মত হইলেন না; কিন্তু শেষে তাঁহার প্রদত্ত বিবিধ উপহারে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্করকে ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক জমীদারীর অধিকারী স্থির করিয়া দেড় সহস্রমাত্র সৈন্যসহ রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ে তখন অনুতাপাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি সত্বর চন্দ্রার সহিত শঙ্করের পরি-ণয়-কার্য্য সম্পাদন করাইয়া, আপনার সমস্ত সম্পত্তি যৌতুকস্বরূপ কন্যা-জামাতাকে দান করিলেন। এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণচ্ছলে বহির্গত হইলেন। তদবধি তাঁহার আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

শঙ্কর বিপুল জমীদারীর অধীশ্বর হইয়া প্রথমেই বিশাই দীঘির তীরে—যেখানে বিপ্রদম্পতীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থানে সুবৃহৎ মন্দিরের সহিত অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই অতিথিশালার নাম হইল, "বোধনাবাস।" তৎপরে তিনি প্রতি বৎসরান্তে তথায় এক মেলা বসাইলেন। ইহার পর তিনি রূপনাথের উচ্চশিক্ষা হৃদয়ে জাগাইয়া জ্যেষ্ঠতাতের পদাঙ্কানুসরণে প্রজাপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

কীর্ত্তিবিনাশী কালের প্রবল স্রোতে সেই মন্দির, অতিথিশালা, রাজভবন প্রভৃতি বহুদিন বিধৌত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও তথায় সেই বিশাল দীর্ঘিকা বাঙ্গালার সেই অতীত কাহিনী হৃদয়ে লুকাইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর তথায় বৃহতী মেলা বসিয়া থাকে, এখনও বৎসরান্তে বহু দেশদেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া সেই বিপ্রদম্পতীর চিতাভস্মপূত দীর্ঘিকার সুপবিত্রবারিস্পর্শে আপনা-দিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

কিন্তু কৈ রূপনাথ! শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, তুমি তো আর আসিলে না? হতাশ হৃদয় বাঙ্গালীকে শুনাইয়া শুনাইয়া আর তো কাহাকেও তেমনই করিয়া সেই অতীত মহাগীতি গাহিতে শুনি-লাম না,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

সমাপ্ত

# কথা-কুঞ্জ

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় করকমলেষু।

প্রিয় শচীশ বাবু, ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ফুল কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া যে ক্ষুদ্র মালাটি গাঁথিয়াছি, তাহা আপনারই কণ্ঠে পরাইয়া দিলাম। এ গন্ধহীন ফুলের মালা অন্যের নিকট অকিঞ্চিৎকর হইলেও আপনি ইহা ফেলিতে পারিবেন না। কেন না, ইহার মালাকর—

আপনার

নারায়ণ।

# মহামায়া

( ১ )

সিদ্ধেশ্বর সংসারের উপর হাড়ে চটা। অনেক কষ্টে এফ্‌, এ পাশ করিয়া সে যখন দেশে আসিয়া বসিল, তখন দেশের অনেকগুলি লোক তাহাকে আশার কত উচ্চ সোপান দেখাইল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, সিদ্ধেশ্বর কালে একজন বড়লোক হইবেই হইবে। তাহাদের মধ্যে গ্রামের একজন মাতব্বর বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, এমন ছেলে বাঁচলে হয়। গ্রামবাসিগণের মুখে এই সকল ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরও আপনাকে সধারণের অপেক্ষা আরও অনেক উচ্চে তুলিল। তাহার সম্মুখে কল্পনার অনন্ত ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িল। সেই বিশাল ক্ষেত্রে কত সোনালী ছবি ফুটিয়া উঠিল; কত অপ্সরাকুল-পরিবৃত নন্দন-কানন একে একে ভাসিয়া গেল; কত আশার মোহিনী মূর্ত্তি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। সিদ্ধেশ্বর সেই সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, আশার চঞ্চলমূর্ত্তি লক্ষ্য করিতে করিতে দিন কাটাইতে লাগিল।

এক এক করিয়া অনেকগুলি দিন কাটিল, কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বড়লোক হইল না। সে যেমন, ঠিক তেমনই রহিল। বাড়িবার মধ্যে জঠরানলের প্রতাপটা কিছু বাড়িল এবং সেই বৃদ্ধিতে তাহাকে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। তখন সিদ্ধেশ্বর দেশের লোকের ভবিষ্যদ্‌বাণীর মুণ্ডপাত করিতে করিতে উদারন্ন-সংস্থানের চেষ্টায় বাহির হইল।

কিন্তু বাহির হইয়াও সিদ্ধেশ্বর গতিক বড় ভাল বুঝিল না। সে দেখিল, জগৎ কেবল স্বার্থপর। সকলেই আপন আপন স্বার্থের জন্য উন্নতির জন্য ব্যস্ত। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহে না, কেহ কাহারও দুঃখ বুঝে না বা বুঝিলেও সহানুভূতিসূচক একটু আহাও করে না। সে যে এত করিয়া এত লোকের সাধ্যসাধনা করিল, এত দুঃখের কাহিনী শুনাইল, তথাপি কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, তাহার অন্নের সংস্থানটুকু পর্য্যন্ত করিয়া দিল না। দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। পরিণামে তাহাদের কি হইবে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের মঙ্গল (!) কামনা করত সে আবার দেশে ফিরিল।

দেশে ফিরিয়া সিদ্ধেশ্বর একবার চাকরীর জন্য নারিকেল-বৃক্ষপত্র-সম্ভূত কোনও বস্তুবিশেষের আহারের ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিল। সে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিত, তখন হইতেই নাটক-নভেলের উপর তাহার প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছিল, স্বয়ংও মধ্যে মধ্যে দুই একটা শোকোচ্ছ্বাস, আনন্দোচ্ছ্বাস প্রভৃতি লিখিয়া ক্লাসের ছাত্রগণকে স্তম্ভিত করিত এবং চেষ্টা করিলে সে যে কালে মাইকেলের ন্যায় একজন উচ্চদরের প্রসিদ্ধ কবি হইতে পারিবে, তাহাদের মুখে এরূপ আশ্বাসও পাইত। এখন সময় বুঝিয়া সিদ্ধেশ্বর সেই সুপ্তপ্রতিভাকে জাগাইতে চেষ্টা করিল; সভক্তি অন্তরে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া প্রতিভাদেবীকে আহ্বান করিল। তাহার সেই সকাতর আহ্বানে প্রতিভা দেবী জাগিয়া উঠিয়া তাহার সম্মুখে সশরীরে বা অশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না, তাহার বিশেষ সংবাদ রাখি না. কি সে জন্য সিদ্ধেশ্বরের চঞ্চল লেখনী বিরত হইল না। তাহার অঙ্গুলিতাড়নায় ক্ষুদ্র লেখনী অনেকগুলি বাক্য-নাটক উদ্গীরণ করিল। তখন প্রফুল্লচিত্তে সিদ্ধেশ্বর তাহাদের সদ্গতির জন্য চেষ্টিত হইল। কিন্তু বলিতে বুক ফাটিয়া যায় রে! দুর্ভাগ্য দেশে কেহই সেই অমূল্য (!) পুস্তক-রাশির মর্ম্মগ্রহণে বা গুণগ্রহণে সমর্থ হইল না। হায়! সংসারের এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহারে—এইরূপ অনাদরের আওতায় পড়িয়া কত প্রতিভার কোমল অঙ্কুর একবার দেখা দিয়াই মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে! ধিক্ এ সংসারে! এবার সিদ্ধেশ্বর ক্রোধান্ধ লইয়া সংসারের উর্দ্ধ বায়ায় পুরুষের কোনও ভয়ঙ্কর স্থানে গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া লেখনী সহিত প্রতিভোত্থিত সেই অমূল্য পুস্তকরাশি দারকেশ্বর নদকে উৎসর্গ করিয়া দিল।

তা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, যদি জঠরাগ্নির কোনওরূপ পীড়ন না থাকিত, তাহা হইলে ক্রোধান্ধ সিদ্ধেশ্বর কখনই প্রতিবাসীদের দ্বারস্থ হইয়া, সেই অহরহঃ প্রজ্জলিত অনলের নির্ব্বাণোপায়ের পরামর্শ লইতে যাইত না এবং দুই বেলা তথায় যাতায়াত করিয়া, পরামর্শের পরিবর্ত্তে রামরাম বাবুর জমীদারীর আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত সমালোচনা শুনিয়া হতাশচিত্তে ফিরিয়া আসিত না।

কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে সিদ্ধেশ্বর বিধাতার শরণাপন্ন হইল। কিন্তু স্থবির

বিধাতা তখন উনপঞ্চাশৎ-মারুতান্দোলিত টলটলায়মান কমলটির উপর বসিয়া আপনার পরকালের আশ্রয়-চিন্তায় নিমগ্ন। কাজেই সিদ্ধেশ্বর তথা হইতে পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যাত হইল।

মনুষ্য-হৃদয় কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? সিদ্ধেশ্বর সংসারের উপর হাড়ে চটিয়া গেল।

( ২ )

তা সিদ্ধেশ্বরের অবস্থা যে চিরদিনই এইরূপ ছিল, তাহা নহে। তাহার পিতা নরহরি মুখোপাধ্যায় উদয়গঞ্জ গ্রামের মধ্যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত না, এমন লোক সে গ্রামে ছিল না বলিলেই হয়। গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রাভদ্র তাঁহার প্রতিপাল্য ছিল। অনেকেই কোন না কোন সময়ে তাঁহার নিকট অল্পাধিক সাহায্য পাইয়াছিল। তিনি জমীদার রামরাম বাবুর সরকারে নায়েবী করিতেন। এই আয়ে তিনি তাঁহার মাটীর গৃহখানিকে অট্টালিকায় পরিণত করিয়াছিলেন। দোলদুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপেও বেশ দশ টাকা খরচ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। কালক্রমে তিনি কাল বিসূচিকা-রোগে হঠাৎ পরলোকগত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলাও অন্তর্হিতা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরই জমীদার মহাশয় তাঁহার নামে চারি হাজার টাকার তহবিল তছরূপাতের দাবী করিলেন এবং আদালত হইতে ডিক্রী পাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি—মায় ভদ্রাসনখানি পর্য্যন্ত নীলামে চড়াইয়া ডাকিয়া লইলেন। যদি কেহ অভিভাবক থাকিত, তাহা হইলে জমীদার এই মিথ্যা মোকদ্দমায় ডিক্রী পাইত কি না সন্দেহ, ডিক্রী পাইলেও দাবীর চারি হাজার টাকা পরিশোধ করিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি থাকিত, কিন্তু তাঁহার নাবালক পুত্রের হইয়া কে দেখিবে? জমীদার দশ হাজার টাকার সম্পত্তি দুই হাজার টাকায় ডাকিয়া লইলেন। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই অল্পমূল্যে দুই একটা সম্পত্তি কিনিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা স্ত্রী নাবালক সিদ্ধেশ্বরের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বাহির হইলেন। আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীধন ও অলঙ্কার ছিল, তদ্দ্বারা একখানি খড়ুয়া গৃহ খরিদ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাইয়া সিদ্ধেশ্বরকে পড়াইতে থাকিলেন।

ক্রমে দুইবার ফেল হইয়া সিদ্ধেশ্বর এক এ পাশ করিল। বিধবার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি এইবার পুত্রকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রবধূ ও পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবার আশায় দিন গণিতে থাকিলেন।

তাঁহার আশা-পূরণের এমন কোন বাধাও ছিল না। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার দ্বারে আসিয়া অতিথি হইতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর ইহাতে বড়ই নারাজ। তাহার প্রতিজ্ঞা, সে দশজনের একজন না হইয়া বিবাহ করিবে না; অকস্মাৎ এতবড় একটা গুরুভার স্কন্ধে লওয়া সে সুবিধা বিবেচনা করিল না। অনেক পীড়াপীড়িতেও সে জননীর, সমাজের, আত্মীয়-স্বজনের সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিল।

এ দিকে জলের মত দিন যায়, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরের বড়লোক হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কাল কাহারও কথা শুনিয়া চলে না। সিদ্ধেশ্বরের জননী আশা পূর্ণ না হইতেই অকস্মাৎ একদিন ইহলোক হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। সিদ্ধেশ্বরও বিবাহের অনুরোধ হইতে বাঁচিল।

( ৩ )

উদয়গঞ্জ গ্রামের উত্তর প্রান্তে—যেখানে বক্রগতি দারকেশ্বর পূর্ব্বমুখ ত্যাগ করিয়া, গ্রামখানাকে বেড়িয়া দক্ষিণ-মুখে ছুটিয়াছে, ঠিক সেইখানে বাঁকের উপর নদের তীরে শ্মশানেশ্বরের মন্দির। মন্দিরমধ্যে অনাদি-লিঙ্গ শ্মশানেশ্বর বিরাজিত। তৎপার্শ্বেই অন্নপূর্ণার মন্দির। শ্মশানেশ্বর মন্দিরের পশ্চাতেই নদের উপর সুবৃহৎ শ্মশান। চতুর্দ্দিকে চারি পাঁচ ক্রোশমধ্যে এই শ্মশান প্রসিদ্ধ। অনেকেরই বিশ্বাস, এই স্থানে শবদেহ দাহ করিলে, মৃতব্যক্তি পরলোকে উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বাসে অনেকে বহুদূর হইতে শব আনিয়া এখানে দাহ করে। সকলে এই স্থানকে পীঠস্থান সদৃশ বলিয়া জানে। মধ্যে মধ্যে দুই এক জন সন্ন্যাসীও এখানে আসিয়া থাকেন।

বাস্তবিক স্থানটি অতি ভয়ঙ্কর, কিন্তু অতি মনোহর। ইহার চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত লোকের বসতি নাই। এখানে দারকেশ্বর-বক্রগতি, স্রোত ভয়ানক প্রখর। তাহাতে অহরহঃ একটা গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে। তীরে ঝাউ ও পলাশশ্রেণীর মধুর ঝঙ্কার। বৃক্ষাবলীমধ্যে একদিকে জগৎপিতা দেবাদিদেবের সুউচ্চ মন্দির, অন্যদিকে জগন্মাতা অন্নপ্রদান-নিরতা অন্নপূর্ণার আনন্দময়ী মূর্ত্তি। উভয় মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাট। দারকেশ্বর তাহার সোপানশ্রেণীতে মাতাপিতার উদ্দেশ্যে নিরন্তর প্রণত হইতেছে। সম্মুখেই ভীষণ শ্মশান। তাহাতে শত

শত চিতাচিহ্ন। কেহ বা সদ্য নির্ব্বাপিত, কেহ বা প্রজ্বলিত, কেহ বা পুরাতন। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি অঙ্গার, অস্থিখণ্ড, অর্দ্ধদগ্ধকাষ্ঠ, বংশদণ্ড, মৃৎকলস সকল অসংযতভাবে পড়িয়া যেন কৃতান্তের প্রত্যক্ষ ক্রীড়াভূমির ভীষণ লীলা করিতেছে। চতুর্দ্দিক নীরব, গম্ভীর, প্রশান্ত। এই ভীষণ গম্ভীরতার মধ্যে শ্মশানের অনন্তকাল হইতে বসিয়া অনস্তগতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এখানে আসিলেই মনে ভয়বিমিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার হয়। সংসারের কোলাহল ক্ষণেকের জন্য নিরস্ত করিয়া, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া কে যেন হৃদয়কে অন্তরের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

সম্প্রতি এই স্থানে একজন সন্ন্যাসী আসিলেন। সিদ্ধেশ্বর সংসারের উপর চটিয়া এই সংসারত্যাগীর নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। তার পর একদিন গভীর রজনীতে দ্বারে চাবি লাগাইয়া, লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় চলিয়া গেল।

( ৪ )

ইহার তিন বৎসর পরে একদিন ভোরের সময় সিদ্ধেশ্বরী একাকী পূর্ব্বোক্ত ঘাটের উপর বসিল। প্রভাত হইলে দুই একজন প্রাচীন ব্যক্তি সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া দেখিল যে, তথায় একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর পরিধান গৈরিক বস্ত্র, স্কন্ধে গৈরিক উত্তরীয়, মুখমণ্ডল অনতিদীর্ঘ সুকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজিতে আবৃত, মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটাজাল, হস্তে একটি কমণ্ডলু। দেখিতে দেখিতে ক্রমে সকলে চিনিল, এ সন্ন্যাসী আর কেহ নহে, তাহাদেরই সিদ্ধেশ্বর। তখন প্রাচীন রামহরি ঘোষ সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল। সিদ্ধেশ্বর অবাক্। যে ঘোবজা বুড়ো চিরকাল তাহাকে সিদ্ধ সিদ্ধ বলিয়া ডাকিয়াছে, সেই অতিবৃদ্ধ আজ ভক্তির সহিত তাহাকে প্রণাম করিল। তবে কি এই তিন বৎসরে তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, সে এখন সকলের প্রণম্য? সিদ্ধেশ্বর আপনাতে তেমন কোন পরিবর্ত্তনই খুঁজিয়া পাইল না। সিদ্ধেশ্বর জানে যে, সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া এই তিন বৎসরের মধ্যে দুইটি বৎসর সে কেবল তাঁহার মোট বহিয়া বেড়াইয়াছিল মাত্র। তার পর একদিন সন্ন্যাসী তাহাকে নির্জ্জনে বলিয়াছিলেন, বৎস! সন্ন্যাসধর্ম্ম বড় কঠিন। কেবল সংসার ছাড়িয়া, কর্ম্মত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"

"বৎস! কর্ম্ম কর, কিন্তু কামনার ছায়াকে হৃদয়ে স্থান দিও না। এতটুকুও স্বার্থের আশা না রাখিয়া, দেহের শেষ রক্তটুকু পর্য্যন্ত দিয়া পরোপকার করিও। কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন হইতে সতর্ক হইও। কামক্রোধাদি বর্জ্জন করিও। মহামায়াকে দূরে রাখিও।" সিদ্ধেশ্বর উপদেশ-পালনে স্বীকৃত হইয়াছিল।

কিন্তু সেই দিন হইতে সন্ন্যাসী নিরুদ্দেশ। সিদ্ধেশ্বর কি করিবে, কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, স্থির করিতে পারিল না। শেষে গুরুদেবের অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। নানাস্থানে ঘুরিয়াও এই এক বৎসরের মধ্যে সে গুরুর কোন সন্ধানই পাইল না। অবশেষে খুঁজিতে খুঁজিতে জন্মভূমি উদয়গঞ্জে উপস্থিত হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে যে সিদ্ধেশ্বর এই ঘাটে সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইয়াছিল, আজও সে সেই সিদ্ধেশ্বর। বেশীর ভাগ কেবল গৈরিক-রঞ্জিত বস্ত্রখানি, আর মাথায় ছোট ছোট জটাগুলি। তবে কোন্ গুণে সে আজ সকলের প্রণম্য হইবে?

সিদ্ধেশ্বর যদি মনস্তত্ত্ববিদ্ হইত, তবে সে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিতে পারিত যে, অন্তরের শোভা অপেক্ষা বাহিরের শোভাই জনমুগ্ধকর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সিদ্ধেশ্বর সে বিষয়ে পণ্ডিত নয়।

চিন্তিত অন্তঃকরণে সিদ্ধেশ্বর ঘাট হইতে উঠিয়া গ্রামের মধ্যে চলিল। পথে তাহাকে যে দেখিল, সেই প্রণাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। সিদ্ধেশ্বর আপন বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, গৃহটি ভগ্নপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঝড়ে খড় উড়িয়াছে, বাঁশ-বাখারী প্রতিবাসিগণের চুল্লীতে স্থান পাইয়াছে, চারিদিকে আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তালায় মরিচা ধরিয়াছে। বাটীটি এক প্রকার বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধেশ্বর বড়ই চিন্তিত হইল। কিন্তু এ জন্য তাহাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। তথায় তাহার বাসের অভিপ্রায় জানিয়া, গ্রামের চাষীবাষীরা আসিয়া এক দিনেই সেই পতনোন্মুখ গৃহখানিকে বাসযোগ্য করিয়া দিল। সিদ্ধেশ্বর মনে মনে হাসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

( ৫ )

সিদ্ধেশ্বর কিছু হউক বা না হউক, পাঁচ জনে তা শুনিবে কেন? তাহারা স্থির করিল, এই তিন বৎসর সন্ন্যাসীর সঙ্গে ফিরিয়া সিদ্ধেশ্বর একজন মহাপুরুষ হইয়া আসিয়াছেন। তিনি এখন আর সাধারণ মনুষ্য নহেন, দেবতা তুল্য। তিনি মনে করিলে যোগবলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন।

তিনি বন্ধ্যাকে পুত্রবতী করিতে পারেন; চির-রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারেন; অন্ধকে চক্ষু, খঞ্জকে পদ, বধিরকে শ্রবণ, বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করিতে পারেন। তিনি আদেশ করিলে দেবতা বর্ষণ করেন, চন্দ্র-সূর্য্য আকাশ ছাড়িয়া পৃথিবীতে আগমন করেন। এমন কি, তিনি ইচ্ছা করিলে এক দিনে—এক মুহূর্ত্তে উদয়গঞ্জ গ্রামখানিকে ভস্মীভূত করিতে অথবা দারকেশ্বরের জলে ডুবাইয়া দিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে আর কিছু না হইলেও সিদ্ধেশ্বর একটা দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। প্রভাত হইলেই সে দেখিত, কেহ বা চাউল, কেহ বা ডাল, কেহ বা তরকারী, পয়সা প্রভৃতি আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিতেছে এবং মহাপুরুষ কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইলেই তাহারা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া হৃষ্টমনে ফিরিতেছে।

ক্রমে সিদ্ধেশ্বরের মহিমা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিল। প্রত্যহ কত নরনারী, বৃদ্ধা, যুবতী, রোগী প্রভৃতি তাহার দ্বারে আসিয়া যোড়করে দণ্ডায়মান থাকিত। সিদ্ধেশ্বর মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, এ এক রকম মন্দ নয়, বুঝি বা পড়্‌তা ফিরিল।

বাস্তবিক অল্পদিনের মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরের পড়্‌তা ফিরিল; বেশ দু-পয়সা সঞ্চয় হইতে থাকিল। তাহার নিরানন্দময় জীবন-স্রোতে বেশ একটু একটু করিয়া আনন্দের জোয়ার বহিতে লাগিল। কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে এক একবার তাহার মনে জাগিত, সন্ন্যাসীর সেই মহান্ উপদেশ—গুরুদেবের সেই গুরু-গম্ভীর বাক্য, —"কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন হইতে সতর্ক থাকিও।"

এইরূপে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় সিদ্ধেশ্বরের মহিমা যখন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তখন তাহার হৃদয়ের সুপ্তপ্রায় অহঙ্কারটিও ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। ক্রমে সে আপন মাহাত্ম্য দেখাইতে চেষ্টিত হইল। অন্যান্য প্রভাব দেখান অপেক্ষা গণনা-বিদ্যার প্রভাবটা দেখান বড়ই সহজ। সিদ্ধেশ্বর সেই সহজ বিদ্যারই অনুসরণ করিল। ব্যবসায় চলিল ভাল; কিন্তু এমন এক দিন আসিল, যখন এ জন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হইল এবং সেই অনুতাপাগ্নিতে আজীবন তাহাকে পুড়িয়া মরিতে হইল। কিন্তু মানব ভবিষ্যৎ অন্ধ।

( ৬ )

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নটা বড়ই প্রখর হইয়াছিল। রৌদ্রটা যেন আগুনের শিখার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই প্রখর তাপে ভীত হইয়া পবনদেবও বুঝি গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার নিস্রোখিত দীর্ঘশ্বাসগুলা এক একটা আগুনের হল্‌কার মত ছুটিয়া আসিতেছিল। গৃহস্থগণ দ্বার, গবাক্ষ বন্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল। পথে একটিও জন-প্রাণী নাই। আকাশ, প্রান্তর, গ্রাম সমস্তই যেন ভীষণ নীরবতায় পূর্ণ। ঠিক সেই সময়ে এই নীরব রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনটি পথিক আসিয়া সিদ্ধেশ্বরের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। পথিকদিগের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক, একটি পুরুষ। স্ত্রীলোক দুইটি নিরাভরণা হইলেও আকৃতি দেখিয়া কোনও ভদ্রকুলোদ্ভবা বলিয়া বোধ হয়, এবং পুরুষটিকে ভৃত্য বলিয়া অনুমান হয়। স্ত্রীলোক দুইটি বিধবা। একটি যুবতী, অপরটি প্রৌঢ়া।

কিছুক্ষণের ডাকাডাকির পর সিদ্ধেশ্বর দরজা খুলিয়া দিলে স্ত্রীলোক দুইটি বাটীতে প্রবেশ করিল। ভৃত্য বাহিরে বসিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বর স্ত্রীলোক দুইটিকে বসাইয়া, পাঁজি পুঁথি বাহির করিয়া গণনা করিতে বসিল। প্রথমেই যুবতীর গণনা আরম্ভ হইল। অনেকেই মনে করিতে পারেন, হিন্দুর গৃহে বিধবা, তাহার আবার গণনা করিতে আছে কি? তাহার অদৃষ্টের সমস্ত অক্ষরগুলিই তো সে এক দিনে একটি ঘটনায় পাঠ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার চক্ষে তাহার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল। সত্য কথা। কিন্তু হিন্দুবিধবার নিজের ছাড়া আরও একটা কাজ আছে। সে নিজের ভবিষ্যৎ অক্ষরগুলি এককালে পাঠ করিয়া এক্ষণে পরের ভবিষ্যৎ দেখিবার জন্য ব্যস্ত। নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সে এখন পরের সুখ দেখিবার জন্য লালায়িত। তাহার একদিকে একটা দ্বার রুদ্ধ হইয়া অন্যদিকে শতদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। তাহার স্নেহ-মন্দাকিনী একদিকে বাধা পাইয়া অন্যদিকে শতধারে ছুটিয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র জীবনখানি এখন পরের দ্বারে উৎসৃষ্ট। যদি এ সংসারে পরের সুখে সুখী কাহাকেও দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। যদি পরের মঙ্গলদ্বারে আত্মসুখ বলিদান দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দু-বিধবার পানে। যদি জগতে নির্লিপ্ত ভোগ, নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। যদি নিরাশ প্রতিমার হৃদয়ে স্বার্থশূন্য আশার আলোক দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। যদি সংসার-কাননে যথার্থ ব্রহ্মচারিণী

দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। হিন্দুর গৃহে যদি মূর্ত্তিমতী দেবতা দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। হিন্দু-বিধবার উপমা হিন্দুবিধবা।

বিধবার মামাত ভগ্নীপতির ইদানীং ডাক্তার কবি-রাজের চিকিৎসার অতীত কি একটা রোগ হইয়াছে। সে আর বড় একটা ঘরমুখো হয় না। দৈবাৎ বাটীতে আসিলেও স্ত্রীর সহিত আর তেমন ব্যবহার করে না। কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব দেখায়। সংসার-খরচের টাকা-কড়িও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইতেছে। তাহার কি হইল? কি উপায়েই বা এ রোগের শান্তি হয়? তাই বিধবা, ভগিনীপতির মঙ্গলের জন্য লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিয়া, এই দারুণ রৌদ্রে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গণাইতে আসিয়াছে।

গণনা করিতে করিতে সিদ্ধেশ্বর একটি একটি প্রশ্ন করিতে লাগিল, বিধবা ধীরে ধীরে তাহার উত্তর দিতে থাকিল। স্বরগুলা সিদ্ধেশ্বরের কানে বড়ই মিঠা বাজিতে লাগিল। এই কয় মাস যাবৎ তাহার কানে অনেক রকম মিঠা কড়া স্বর বাজিয়াছে, কিন্তু এ রকম মিঠা একটাও বাজে নাই। অনেকেই জানেন, গণনা-কালে উত্তরদাতার মুখের ভাব দেখিবার বড়ই প্রয়ো-জন হয়। সিদ্ধেশ্বর সেই ভাব দেখিবার জন্য উত্তর-দাত্রীর মুখের দিকে চাহিল। আ মরি মরি! কি মুখ রে! মধ্যাহ্ন-রবিকর-প্রভাসিত তরঙ্গহীন স্থির সরসীবক্ষে পূর্ণ-বিকশিত অচঞ্চল পদ্মের ন্যায় কি সুন্দর মুখখানি! কি গঠন! কি লালিত্য! কি সৌন্দর্য্য! সুখদুঃখহীন হর্ষবিষাদচ্ছায়াবর্জ্জিত বালবিধবার সেই যৌবনোদ্দীপ্ত মুখশ্রী দেখিয়া দেখিয়া সিদ্ধেশ্বর আপনা হারাইল, সংযম ভুলিল, মজিল, সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিল। প্রাবৃট্‌সম্ভূতা কূলপ্লাবিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় যৌবনপ্লাবিতা পূর্ণায়তনা অঙ্গযষ্টি, তাহাতে স্বর্গীয় সুষমাপূর্ণ পবিত্রতার আধার অনাঘ্রাতপুষ্পবৎ সুন্দর মুখখানি, তদুপরি স্থির, ধীর, সমুজ্জ্বল, ভাসা ভাসা চোখদুটির সরলদৃষ্টি! মজিল রে হতভাগা সিদ্ধেশ্বর মজিল! উন্মত্ত পতঙ্গ প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিল।

গণনায় বড় ভুল হইতে লাগিল। ভুল হইল কি ঠিক হইল, সে জ্ঞান সিদ্ধেশ্বরের নাই। যেমন তেমন করিয়া গণনা শেষ হইল। যাইবার সময় সিদ্ধেশ্বর তাহাদের পরিচয় লইয়া বিদায় দিল। পরিচয়ে জানিল, যুবতীর পিতার নাম ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী। নিবাস গোপালনগর; যুবতীর নাম মহামায়া। নাম শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর একবার কাঁপিয়া উঠিল।

(৭)

সিদ্ধেশ্বর এবার বড়ই গোলে পড়িল। জীবন-ব্যাপী অশান্তির মধ্যে সে একটু শান্তি পাইয়াছিল। প্রকৃত শান্তি না হইলেও এক রকম গোলেমালে কাটিতেছিল ভাল। কিন্তু এবার সে সেটুকুও হারা-ইল। ঘোর জীবন-সংগ্রামে যে একটুমাত্র রত্ন লাভ করিয়াছিল, না বুঝিয়া তাহা কোথায় ফেলিয়া দিল, আর খুঁজিয়া পাইল না। হতভাগ্য সিদ্ধেশ্বর ইহজীব-নের সমস্ত সুখ-শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল অনন্ত দুঃখ—অনন্ত অশান্তির সহিত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল।

এখন আর বড় কেহ সিদ্ধেশ্বরের নিকট গণাইতে আসে না। যদি কেহ কখন আসে, সে তাহার গম্ভীর মূর্ত্তি, উদাস দৃষ্টি দেখিয়াই সরিয়া যায়। গণনা করি-লেও এখন আর গণনা ঠিক হয় না, সকলই বিপরীত হইয়া যায়। সিদ্ধেশ্বরের গৃহ এক্ষণে নির্জ্জন, নীরব। সে সেই নীরবতার মধ্যে বসিয়া বসিয়া একটা অতৃপ্ত কামনার চিন্তা করে। সেই চিন্তাতেই হতভাগা একটু একটু সুখ পায়। ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া, তপ-জপ ছাড়িয়া, সেই অদম্য লালসার পূজা করিতেই সে এখন ভালবাসে এবং সেই পূজাই তাহার অভীষ্ট বরদাত্রী ভাবিয়া দিন কাটায়। কিন্তু এ ভাবে অধিক দিন কাটিল না। রুদ্ধ প্রাণের নীরব হাহাকার ক্রমেই তাহার অসহ্য হইল; কামনার করাল ছায়া সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অতৃপ্ত জীবনে একটা সুখের আশা জাগিল। নির্ব্বোধ সিদ্ধেশ্বর সেই পাপ আশার অনুসরণ করিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় আকাশে বড় মেঘ উঠিয়া-ছিল। প্রবল বাতাসও বহিতেছিল। শীঘ্রই বৃষ্টি আসিবে বলিয়া সকলে অনুমান করিতেছিল। এমন সময়ে এই ভীষণ দুর্য্যোগে এক সন্ন্যাসী গোপালনগরে ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে আশ্রয় লইল। একে অতিথি, তাহাতে সন্ন্যাসী,—চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরম সমাদরে অতিথিকে গৃহে স্থান দিলেন এবং যথোচিত অতিথি-সৎকার করিয়া বৈঠকখানায় তাঁহার শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এ অতিথি আর কেহ নহে, সিদ্ধেশ্বর।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর যাহাকে দেখিবার জন্য আসিল, হৃদয়ের উদ্দাম কামনা-প্রবাহ একবার—কেবল একবার মাত্র যাহার চরণে ঢালিয়া দিয়া আপনাকে চিরতৃপ্ত করিবার আশায় এখানে আসিল, তাহাকে তো দেখিতে পাইল না? মহামায়া তো দেখা দিল না। সিদ্ধেশ্বর সমস্ত রাত্রি এক প্রকার জাগিয়া

কাটাইল। প্রভাত না হইতেই শয্যাত্যাগ করিয়া পাশের পুষ্করিণীতে হাত-মুখ ধুইতে গেল। মুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ হইলে ঘাটের উপর উঠিয়া দেখিল, উচ্ছিষ্ট পাত্রহস্তে দাঁড়াইয়া শুভ্র-বসনাবৃতা এক রমণীমূর্ত্তি। তখনও কৃষ্ণাষ্টমীর শ্বেতকান্তি ক্ষীণ চন্দ্র মধ্যাকাশে জাগিয়া বসিয়াছিল। পুষ্করিণীর জলে তাহার নিষ্প্রভ প্রতিবিম্ব হিল্লোলে নাচিতেছিল। পূর্ব্বাকাশে একটা লাল আভা উঠিয়াছিল। সেই ক্ষীণালোকে সিদ্ধেশ্বর চমকিয়া দেখিল, সেই মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি কয়দিন হইতে তাহার হৃদয়ে অহরহঃ জাগিতেছে, এ সেই মূর্ত্তি। যে রূপের তীব্রজ্বালায় নিরন্তর তাহার অন্তস্তল পুড়িতেছে, ঐ সম্মুখে সেই প্রদীপ্ত পাবকশিখা। যে ধ্যানের ছবিখানিকে আর একবার দেখিবার জন্য হৃদয় অস্থির হইয়াছিল, ছল করিয়া অতিথি সাজিয়াছিল, ঐ সেই মোহিনী প্রতিমা। দেখিয়া লও সিদ্ধেশ্বর, চক্ষু ভরিয়া, প্রাণ পুরিয়া ঐ রূপ-গরল পান কর। মরিবার ভয় করিও না। তুমি তো একদিন মরিয়াছ। মানুষ কয়বার মরে?

কিন্তু আশ মিটাইয়া সিদ্ধেশ্বরের দেখা হইল না। সতীত্ব-তেজঃ-প্রদীপ্ত রূপবহ্নিজ্বালায় তাহার নয়ন ঝলসিয়া গেল; সেই ধর্ম্মভাবপূর্ণ মুখজ্যোতিতে তাহার কলুষিত হৃদয় ভীত হইয়া পড়িল; কিন্তু কামনার ছায়া আরও ঘনীভূত হইল। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, দুই একবার ঢোক গিলিয়া কম্পিত-কণ্ঠে সিদ্ধেশ্বর ডাকিল, "মহামায়া!"

সে স্বরে মহামায়া চমকিয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বর আবার ডাকিল, "মহামায়া!"

মহামায়া অকম্পিত-স্বরে বলিল, "কেন ঠাকুর!"

সিদ্ধেশ্বর উন্মত্তের ন্যায় কহিল, "মহামায়া! তুমি কে? তোমার এত রূপ কেন?"

শিহরিয়া মহামায়া কহিল, "আপনি সন্ন্যাসী, কি বলিতেছেন?"

বিকৃতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বর কহিল, "না মহামায়া! এখন আর আমি সন্ন্যাসী নই। আমি উন্মাদ—তোমার রূপে উন্মাদ! প্রাণ যায় মহামায়া, আমাকে রক্ষা কর।"

ধীর-গম্ভীর-স্বরে মহামায়া কহিল, "ঠাকুর! আপনি সন্ন্যাসী। নতুবা ইহার উত্তরে—থাক্, আপনি সরিয়া যান।"

সেই কুলিশ-কঠোর স্বরে সিদ্ধেশ্বরের চমক হইল। চাহিয়া দেখিল, মহামায়ার মুখে কি অদ্ভুত বিক্রমচিহ্ন! কি অপূর্ব্ব জ্যোতি! নয়নে কি করাল অগ্নিশিখা! ভয়ে তাহার হৃদয় জড়ীভূত হইল। মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না! সে দ্রুতগতিতে তথা হইতে পলায়ন করিল।

(৮)

সিদ্ধেশ্বর মহামায়ার নিকট হইতে পলাইল বটে, কিন্তু মহামায়ার সঙ্গ ছাড়িতে পারিল না। মহামায়ার মোহিনী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়পটে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, পট না ভাঙ্গিলে সে চিত্র বুঝি মুছিবে না। মহামায়ার নিকট হইতে পলাইয়া সিদ্ধেশ্বর আর গৃহে গেল না, বরাবর কাশী অভিমুখে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া লোকারণ্যমধ্যে আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। গুরুকে খুঁজিল, পাইল না, অবশেষে বিরক্ত হইয়া, ভাগীরথীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সব শেষ করিতে ইচ্ছা করিল, সাহসে কুলাইল না। কাশী ত্যাগ করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি কত তীর্থে ভ্রমণ করিল, কিন্তু মহামায়া সঙ্গে। হিমালয়ের নির্জ্জন ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল, মহামায়ার স্মৃতি তাহাকে সেখান হইতেও টানিয়া আনিল। এইরূপে সে নানা স্থানে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে, প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্য-সাগরের অভ্যন্তরে হৃদয়কে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই উষার অস্ফুটালোকে শুভ্রবসনা কোপ-স্ফুরিতাধরার ভ্রূকুটীকুটিল কটাক্ষ-শোভিত মুখখানি মনে পড়ে, আর সব গোলমাল হইয়া যায়। অবশেষে সিদ্ধেশ্বর প্রকৃতির তাড়না—স্মৃতির দারুণ কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আবার দেশে ফিরিল।

নীরব মধ্যাহ্নে নদীঘাটে মহামায়া একাকিনী স্নান সমাপ্ত করিয়া উঠিতেছিল, সহসা দেখিল, সম্মুখে সিদ্ধেশ্বর। মহামায়া একটু ভীতা, একটু চমকিতা হইল; পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিল। সিদ্ধেশ্বর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধিমতী মহামায়া মনে মনে ভীতা হইলেও বাহিরে সাহস দেখাইবার জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সিদ্ধেশ্বর চাহিয়া দেখিল, কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য! বর্ষণবিধৌত চম্পকগুচ্ছবৎ বারি-সম্মার্জ্জিত রূপরাশি আর্দ্রবস্ত্র ফুটিয়া বাহির হইতেছে; আলুলায়িত ঘন সুচিক্কণ কেশভার পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, কতক বা বিক্ষিপ্তভাবে অংশে বাহুমূলে লুটাইতেছে। তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাবণ্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। ললাটপতিত কুঞ্চিতালকচ্যুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু গণ্ড বহিয়া মুক্তাফলের সৌভাগ্য লাভ করিতেছে। কে যেন সিদ্ধেশ্বরের সম্মুখে সৌন্দর্য্যের রুদ্ধ শতদ্বার এককালে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সিদ্ধেশ্বর আত্মহারা হইয়া পড়িল, তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

মহামায়া সাহসে ভর করিয়া বলিল, "ঠাকুর! পথ ছাড়িয়া দিন।"

সিদ্ধেশ্বরের কথা ফুটিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মহামায়া! ভাল আছ?"

মহামায়া বলিল, হাঁ, আপনি সরিয়া দাঁড়ান!"

সিদ্ধেশ্বর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সরিব, কিন্তু—কিন্তু একটা কথা শুনিবে কি?"

মহামায়া। কি?

সিদ্ধেশ্বর মহামায়ার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল। মহামায়া পশ্চাতে সরিয়া গেল। সেইখানে বসিয়া বসিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধেশ্বর বলিল,—"প্রাণ যায় মহামায়া! আমাকে বাঁচাও। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারিলাম না। কেন মহামায়া! এত রূপ লইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলে? দাঁড়াইলে তো এখন বাঁচাইবে না কেন?"

মহামায়া সভয় দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিল। দেখিল, নির্জ্জন নদীতীর, কেহ কোথাও নাই। বুঝিল যে, এক্ষণে সাহস ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই। সে স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"ঠাকুর! এখনো পথ ছাড়, নতুবা চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব!"

সিদ্ধেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থির-কণ্ঠে বলিল,—"ডাক, কিন্তু মহামায়া! আর না, জীবনের আশা, লজ্জা, ভয় সব ত্যাগ করিয়াছি। বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এখন কেবল এক বিন্দু—একবিন্দুমাত্র জল! আজ আর ছাড়িব না মহামায়া—"

উন্মত্তবৎ অস্থিরপদে সিদ্ধেশ্বর মহামায়ার দিকে অগ্রসর হইল। মহামায়া মনে মনে ডাকিল,—"কোথায় হে অনাথনাথ! অসহায়ের সহায়! আমার যে সর্ব্বস্ব যায় প্রভু!"

সহসা সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি নদীর পরপারে পড়িল। কে ও নদীতীরে অশ্বত্থমূলে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী? গুরুদেব না? সিদ্ধেশ্বর ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সেই দিন রজনীতে সিদ্ধেশ্বর গুরুদেবের দর্শন পাইল। গম্ভীর-স্বরে গুরুদেব ডাকিলেন—"সিদ্ধেশ্বর!"

সিদ্ধেশ্বর উত্তর করিল,—"প্রভু।"

গুরু। প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছ?

নতমুখে সিদ্ধেশ্বর বলিল,—"না।"

গুরুদেব বলিলেন,—"প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কি প্রায়শ্চিত্ত জান?"

উদ্বেগ-বিকম্পিত হৃদয়ে গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল,—"কি প্রায়শ্চিত্ত প্রভু?"

রুদ্রকণ্ঠে গুরুদেব বলিলেন,—"এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিখ্যাত। পারিবে?"

সিদ্ধেশ্বর বলিল,—"না।"

গুরুদেব বলিলেন,—"তবে তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু!"

সিদ্ধেশ্বরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "অন্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

সিদ্ধেশ্বর চাহিয়া দেখিল, গুরুদেব অন্তর্হিত। কেবল দিগন্ত তাহার প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলিয়া উত্তর করিতেছে, 'নাই', গর্জ্জন করিয়া দারকেশ্বর বলিতেছে,—'নাই, নাই'; সেই সমবেত প্রতিধ্বনি ব্যোমপ্রান্তে প্রহত হইয়া যেন অনন্ত কণ্ঠে ভৈরব-নিনাদে বলিয়া দিতেছে,—'নাই, নাই, নাই!'

সিদ্ধেশ্বর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এখনও যেন তাহার কর্ণে গুরুদেবের শেষবাক্য ধ্বনিত হইতেছিল, 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।' তাহার চারিদিকে নিরন্তর মেঘমন্দ্রে শব্দিত হইতেছে—মৃত্যু! মৃত্যু!! যে দিকে যায়, সেই দিক্ হইতেই যেন শুনিতে পায়, কে বিকট-স্বরে ডাকিয়া বলিতেছে, মৃত্যু! মৃত্যু!! মৃত্যু!!! সে ধ্বনিতে সিদ্ধেশ্বর অস্থির হইয়া উঠিল।

ক্রমে সিদ্ধেশ্বর উন্মাদপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত জীবনব্যাপী বৈফল্য, উৎসাহে অবসাদ, আশায় নিরাশা, কার্য্যে অসিদ্ধি, তাহার উপর গুরুদেবের সেই মহাপ্রায়শ্চিত্তের অনুজ্ঞা হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত করিল। সে আলোড়নের পরিণাম যাহা হইল, তাহা অতি শোচনীয় - বিষাদময়। সিদ্ধেশ্বর এখন আর গৃহে থাকে না। কখনও বৃক্ষতলে, কখনও নদীতীরে, কখনও শ্মশানেশ্বরের মন্দির বাহিরে পড়িয়া দিন কাটায়। সময়ে সময়ে গোপালনগরে দ্বারকেশ্বরের ঘাটেও দুই একদিন পড়িয়া থাকে। আহারের চেষ্টা নাই। দয়া করিয়া কেহ কিছু খাইতে দিলে কখন খায়, কখন বা সম্মুখস্থ কুকুরদলকে বিতরণ করিয়া চলিয়া যায়; তাহার আর সে কান্তিপূর্ণ দেহ নাই, তাহা এক্ষণে শীর্ণ; মলিন কেশজাল ধূলি-ধূসরিত; চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট; দৃষ্টি নিরাশপূর্ণ, কঠোর, শূন্যে নিবদ্ধ। সে এখন সর্ব্বদা একা বসিয়া কি ভাবে; ভাবিতে ভাবিতে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে; ডাকিলে উত্তর দেয় না। অনেক চেষ্টা করিলেও একটিও কথা কহে না। কেবল গভীর নিশীথে—যখন জগৎ নীরব, সুষুপ্ত, তখন কেহ কদাচিৎ শুনিত, নির্জ্জন নদীতীর, নীরব শ্মশান প্রতিধ্বনিত করিয়া কে বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, 'মহামায়া! মহামায়া!' সেই হৃদয়ভেদী করুণ চীৎকার নৈশ বায়ুতরঙ্গে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।

এই ভাবে কিছুদিন কাটিল।

( ৮ )

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। নির্ম্মেঘ আকাশের চাঁদ বড়ই হাসিতেছিল। সুপ্তা প্রকৃতির গাত্রে শুভ্র জ্যোৎস্নার আবরণখানি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দারকেশ্বর ছোট ছোট তরঙ্গগুলিকে ঘুম পাড়াইয়া একটা মধুর ভাষায় গাহিয়া গাহিয়া কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতেছিল। তীরের গাছগুলা অনেকক্ষণ হইতে প্রকৃতির মাতার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছেলের মত এক একবার জাগিয়া মাথা নাড়া দিয়া আবার চুপ করিতেছিল। শব্দহীন সুষুপ্ত পৃথিবী, প্রান্তর, নদী, আকাশ সমস্তই কৌমুদীসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। সেই শুভ্র কৌমুদীস্নাত নদীপ্রবাহ-চুম্বিত সোপানের উপর বসিয়া একা সিদ্ধেশ্বর।

দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইতে লাগিল। সেই নীরব রাজ্যে—সেই ভীষণ শ্মশানে ক্ষণে ক্ষণে কত বিভীষিকার চিত্র জাগিয়া উঠিতেছিল। নৈশ বায়ু-প্রবাহে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পলাশগাছগুলা বিকটাকার প্রেতমূর্ত্তির অনুকরণ করিতেছিল। সেই সময় সেই স্থানে আসিলে অতিসাহসিকের হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর স্থির, ধীর, নীরব। ঘাটের উপর বৃহৎ অশ্বত্থগাছ হইতে একটা পেচক বিকট স্বরে রাত্রির পরিমাণ ঘোষণা করিল। সিদ্ধেশ্বর একটা বুকভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের দিকে চাহিল, একবার জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত নক্ষত্রখচিত উদার অনন্ত আকাশের দিকে চাহিল, একবার অনন্তপথযাত্রী দারকেশ্বরের দিকে চাহিল। তার পর বিকৃত-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "মহামায়া! মহামায়া!" উন্মাদ কণ্ঠের উচ্চ হাহাকার জ্যোৎস্নাতরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া দারকেশ্বরের খর প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য নদীবক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল। কয়েকটা তরঙ্গ আসিয়া সোপান প্রান্তে আছাড়িয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত পরেই সব স্থির। সংসারপথের পথভ্রান্ত পথিক সিদ্ধেশ্বরকে বক্ষে লইয়া দারকেশ্বর অনন্তের পথে ছুটিল।

যাও সিদ্ধেশ্বর! পার যদি, পরজন্মে মহামায়াকে দূরে রাখিও।

# দুই ভাই

ছোট ভাই হরিশ যখন সীতানাথ বাবুর জমীদারী সোনাগঞ্জে সাত টাকা বেতনে তহশীলদার-পদে নিযুক্ত হইল, তখন বড় ভাই কেনারামের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আশার সাফল্যজনিত গর্ব্বে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যৌবনারম্ভেই কেনারাম মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া সংসারের বহু কষ্ট—অশেষ তাড়না মধ্যেও ভাইটিকে মানুষ করিয়াছে, লেখাপড়াও কিছু শিখাইয়াছে। আজি সেই ভাই—সেই দাদাগত প্রাণ হরিশের উন্নতিতে তাহার গর্ব্ব না হইবে কেন? যে একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুরের মূলে সে এতদিন প্রাণপণে জল-সেচন করিতে করিতে আপনার বুক দিয়া তাহাকে সংসারের খরতাপ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, আজি সেই সযত্নপালিত ক্ষুদ্র তরুটির নবপল্লবিত শাখায় একটি প্রথমোদ্গত মুকুল দেখিয়া তাহার আনন্দ না হইবে কেন? সম্মুখে আশার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া কেনারামের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নাচিয়া উঠিল।

কেনারাম লোকটি ভাল; তাহার প্রাণটি বড় সাদা। মাতা-পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই। এই জন্যই বোধ হয়, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটা হরিশের উপরই পড়িয়াছিল; কিন্তু এ জন্য শেষে লোকে তাহাকে নির্ব্বোধ, গোবেচারা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিলেও কেনারামের তাহাতে একটুকুও দুঃখ বা অনুতাপ হয় নাই। সে যেমন হৃদয়খানি লইয়া সংসারে আসিয়াছিল, তেমনই কাজ করিয়া যাইতেছিল; সংসারের কুটিল সমালোচনার দিকে একটুও লক্ষ্য করিবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

কেনারাম জাতিতে কৈবর্ত্ত; চাষই জীবিকা। তাহার ষোলো বিঘা সাড়ে তের কাঠা জমী চাষ, দুইটি বলদ, একখানি হাল। নিজের হাতেই চাষ করিত, এ জন্য কখনও সে হরিশের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিত না। তাহার সেই অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে জমীতে সোনা ফলিত, লোকে বলিত, কেনারাম কি জানে। সংসারে বড়বৌ-ই একা কর্ত্রী, গৃহিণী, দাসী সকলই। তাহার ক্লান্তিহীন বিরাগহীন নীরব পরিশ্রমে কেনারামের ক্ষুদ্র সংসারটি সুখের—শান্তির আশ্রয় হইয়াছিল। এই সুখের সংসারের মধ্যে সন্তান-হীন দম্পতীর দুইটি হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীমান্ হরিশ্চন্দ্র মাইতি সোনাগঞ্জের গোমস্তা বা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিল।

বেতনের পরিমাণ সাত টাকা হইলেও বৎসরান্তে হরিশের আয়ের পরিমাণটা যখন তিন শত হইল এবং সেই টাকাগুলা আনিয়া হরিশ যখন দাদার হাতে দিতে লাগিল, তখন কেনারাম ভগ্নপ্রায় পুরাতন ঘর দুইখানা ভাঙ্গিয়া দুইখানা নূতন মেটে ঘরের পত্তন করিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরই মহেশ বেরার কন্যার সহিত ভ্রাতার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিল। মেয়েটির বিধবা মাতা ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। মেয়েটি বড়, দেখিতেও ভাল। সাড়ে পাঁচগণ্ডা টাকা কন্যাপণ দিয়া কেনারাম মাঘমাসের মধ্যেই তাহাকে ভ্রাতৃবধূরূপে ঘরে আনিল। মেয়েটি আসিয়াই বড়-বোয়ের হৃদয় হইতে হরিশের চিরপ্রাপ্য ভালবাসাটুকু কাড়িয়া লইল। এ জন্য কখনও কখনও হরিশ দাবী করিত বটে, কিন্তু তাহার সে দাবী টিকিত না। বড়-বোয়ের মুখ-নিঃসৃত কতকগুলা শ্লেষপূর্ণ উপহাস শুনিয়াই তাহাকে ভয়ে ভয়ে দাবী উঠাইয়া লইতে হইত।

কন্যাকে শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া ছোটবোয়ের মা একা থাকিতে পারিতেন না। প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে আসিতেন, মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন থাকিয়াও যাই-তেন। ইহাতে কেনারাম বা বড়বৌ অসন্তুষ্ট ছিল না, বরং আনন্দিত হইত। কিন্তু একদিন কেনারামের জ্ঞাতি বৃদ্ধ মাধব খুড়া, কেনারামকে বলিয়াছিল, "বাবাজি! বেয়ান মাগীর জামাইবাড়ীতে এত ঘন ঘন যাতায়াত কেন?"

কেনারাম বলিয়াছিল, "তা খুড়া, গ্রামে ঘরে দোষ কি? উনি মেয়েকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।"

বৃদ্ধ বলিয়াছিল, "কিন্তু কিনু! শেষে মাগী পাছে জামাইকেও না ছাড়িতে পারে, তাই ভাবনা। মাগীরা জামাইয়ের জন্য চোখে লঙ্কা দিয়া যত কাঁদে, তোমার জন্য তো তত কাঁদিবে না। ঘর সামালো।"

কেনারাম বৃদ্ধের কথাটা বুঝিল, কিন্তু তাহা তাহার ভাল লাগিল না। হরিশ তাহাকে পর করিবে, এ কথাটা যে মনেও করে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই।

বড়ই সুখে—বড়ই শান্তিতে কেনারামের ক্ষুদ্র সংসারটি চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনটি বৎসর জলের মত চলিয়া গেল।

( ২ )

তিন বৎসর পরে হরিশের একটি পুত্র হইল। বড়বৌ সগর্ব্বে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। অল্পদিনের মধ্যেই সেই শিশুটি হরিশ, ছোটবৌ উভয়কেই নির্ব্বাসিত করিয়া বড়বোয়ের হৃদয়রাজ্যে আপনার ভালবাসার সুদৃঢ় সিংহাসন স্থাপিত করিল। বড়বৌ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিল গোপাল।

ইহার পর হইতে হরিশের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আগমনের এবং অবস্থিতির মাত্রাটা কিছু বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দুই একটা কাজে কর্ত্রীপদ গ্রহণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। কেনারাম বা বড়বৌ ইহাতে কোন আপত্তি করিল না, আপত্তির কোন কারণও দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহারা না দেখিলেও তাহাদের অগোচরে এই সময় হইতেই সেই সুখের সংসারটির উপর দিয়া কোন চিরনির্ব্বাসিত হতভাগ্যের দগ্ধ নিশ্বাসের মত যেন একটু একটু অশান্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। মা ও মেয়ের সতর্ক দৃষ্টির সহিত গুপ্ত পরামর্শটাও চলিতে লাগিল; সংসারের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিল; কেনারামও আর পূর্ব্বের মত হরিশের নিকট হইতে যথাসময়ে টাকা পাইল না। হঠাৎ যেন কোন অজ্ঞাত প্রেতরাজ্য হইতে উদাসীনতার—অশান্তির একটা কাল ছায়া আসিয়া সকলেরই হৃদয়ে চাপিয়া বসিল; কেনারামের সুখময়, শান্তিময়, আশাপূর্ণ সংসার-স্রোতটি নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার অলক্ষ্য অভিশাপে সহসা বিপথগামী হইল।

সেই ঘোর বিপ্লবের উদ্যোগপর্ব্বের সময় মধু স্বর্ণকার একজোড়া পুরাতন তাবিজ বিক্রয়ের জন্য আনিল; ছোটবৌ এবং তাহার মাতা তাহা লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। এমন কি, মাতা কন্যার হস্তে তাবিজ জোড়াটা পরাইয়া দিলেন। বড়বৌও আসিয়া কেনারামকে ধরিল। কিন্তু কেনারাম বলিল, এখন চাষের সময় একশত টাকা দিয়া গহনা কেনা হইবে না। চাষ ফুরাইলে নিশ্চয়ই কিনিয়া দিব।"

বড়বোয়ের মুখে সে কথা শুনিয়া ছোটবোয়ের মাতা বলিলেন, "তা হোক্ না মা, রাণী তো তোমার ছোট বোন। তা তোমার না হয় দুদিন পরেই হ'তো। এ জিনিসটা ভাল ছিল, তুমিই বা না নিলে কেন?"

সহসা কে যেন বড়বোয়ের বুকে একটা নিষ্ঠুর কশাঘাত করিল; সে আঘাতে তাহার পাঁজরের একখানা হাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ইহার একমাস পরে হরিশ যখন দেড়শত টাকা দিয়া ছোটবোয়ের জন্য এক জোড়া নূতন তাবিজ আনিল, তখন কেনারাম বড়বৌকে বলিল, "কেন বড়বৌ! আমি কি ছোটবৌমাকে তাবিজ কিনিয়া দিতাম না?"

কেনারাম অভিমানে মগ্ন। বড়বৌ বলিল, "তা হোক্, তুমি ঠাকুরপোর উপর রাগ করিও না। ও ছেলেমানুষ, কি জানে?"

কেনারাম বলিল, "সত্য বড়বৌ! হরিশ কি জানে, ও এখনও ছেলেমানুষ।"

উভয়েই আপনাদের চিরপরিচিত স্নেহের আবরণ দিয়া বুকের ব্যথাটাকে চাপিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু এরূপ চাপিয়া আর কতদিন চলে। ক্রমেই অশান্তি বাড়িতে লাগিল। এখন কারণে অকারণে কলহ ভিন্ন দিন যায় না। সে কলহ ক্রমে হরিশের বা ছোটবোয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। ছোটবোয়ের মাতা তো কুটুম্বের মেয়ে, তিনি এত সহিবেন কেন? অগত্যা প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণেই তাঁহাকে কাপড় বগলে করিয়া আপনার ভগ্নকুটীরে পলায়ন করিতে হইত; আবার পোড়া মায়ের মন বুঝিত না বলিয়াই প্রাতঃকালেই দর্শন দিতেন। যখন বেশী অসহ্য হইত, তখন অসাবধানে বলিয়া ফেলিতেন, "যে ভায়ের রোজগারের মুঠো মুঠো টাকা খায়, সে চাষার রাগের এত তেজ কেন?"

কথাটা শুনিয়া বড়বৌ সবলে গোপালকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

শেষে একদিন সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া বৃদ্ধ মাধব খুড়া বলিল, "কিনু! জামাই-ই বেয়ানের আপনার; তাই বলিয়া তুমিও মাগীকে আপনার করিতে গেলে চলিবে কেন বল?"

কেনারাম কিছু বলিতে পারিল না, কেবল দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু হাতের উপর পড়িল।

( ৩ )

কয়েকদিনের মধ্যেই কেনারামের চিরপ্রবাহিত স্নেহ-স্রোতটাকে রুদ্ধ করিবার জন্যই যেন তাহার বুকটাকে চাপিয়া উঠানের মাঝখানে একটা প্রাচীর উঠিল। তবে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অনুরোধেই মধ্যে একটা দ্বার রহিল। সেটা কেবল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া জ্ঞাতির হিংসাপূর্ণ

হৃদয়ে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বালাইবার জন্য। কিন্তু এই প্রাচীরের ক্ষুদ্র ব্যবধানটা, বড়মার প্রবল স্নেহাকর্ষণে আকৃষ্ট, গোপালের ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বড়মা যে হিংস্রস্বভাবা জ্ঞাতিরমণী ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহার নিকট জ্বলন্ত বিদ্বেষ ভিন্ন স্নেহ বা আদর-যত্ন পাওয়া যে অসম্ভব, এ কথাটুকু সে নির্ব্বোধ শিশু কিছুতেই বুঝিল না। বড়মার কাছে না থাকিলে তাহার স্বস্তি হয় না, বড়মার হাতে না হইলে খাইতে পারে না, বড়মার কোল না পাইলে ঘুমায় না। অনেক সান্ত্বনা, অনেক শাসন, অনেক তাড়নার পর সকলেই হাল ছাড়িয়া দিল। বুঝিল যে, মাগী ডান, ছেলেকে ওষুধ করিয়াছে।

এতদূর হইলেও হরিশ কিন্তু এখনও দাদার সহিত প্রত্যক্ষ বিবাদ করিতে সাহস করে নাই। অবশেষে তাহাও ঘটিল। বাড়ীর মধ্যে একটি প্রাচীন পেয়ারা গাছ ছিল। গাছটি কেনারামের উঠানে ছিল। সেটি কেনারামের পিতার স্বহস্ত-রোপিত এবং সযত্নবর্দ্ধিত। আগে সেটিতে ভাল পেয়ারা হইত, কিন্তু এখন আর তেমন ভাল ফল হয় না। তথাপি পিতার শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কেনারাম এতদিন তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তাহার একটা ডাল বাড়িয়া হরিশের চালের উপর পড়িয়াছিল। একটু ঝড় হইলেই সেটা চালের উপর লুটোপুটি খাইত, তাহাতে চালের খড়গুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইত।

ইহা দেখিয়া একদিন হরিশ কেনারামকে বলিল, "পেয়ারাগাছটা কাটিতে হইবে।"

কেনারাম বলিল, "কেন?"

হরিশ। আমার চাল নষ্ট করিতেছে।

কেনা। ঐ ডালের খানিকটা কাটিলেই হইবে।

কথাটা ঠিক, কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিয়াছেন যে, ওর উঠানে গাছ, ও একাই ফলভোগ করিবে। ওটাকে না রাখাই উচিত। হরিশও কথাটা ঠিক বুঝিয়াছিল। তাই সে বলিল, "না, গাছটাই কাটিতে হইবে, ডাল আবার বাড়িতে পারে।"

কেনা। তাহা হইবে না।

হরিশ। হইতেই হইবে।

কেনা। না হরিশ। বাবার শেষ চিহ্নটুকু মুছিতে পারিব না। আমি থাকতে হইবে না।

কি, সে থাকিতে গাছ কাটা হইবে না? হরিশ কি এতই দুর্ব্বল? সোনাগঞ্জের গোমস্তা বা সর্ব্বেসর্ব্বা হরিশ বাবু চাষা কেনারামের হুকুমে নিরস্ত হইবে? এতটা অপমান স্বীকার করিয়া স্ত্রী ও শাশুড়ীর নিকট আপনাকে দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করিতে হরিশের গর্ব্বিত হৃদয় কিছুতেই সম্মত হইল না। সে ছুটিয়া বাটী হইতে কুঠার আনিল এবং আপনি গাছ কাটিতে উদ্যত হইল। কেনারাম কিছুই না বলিয়া তাহার হাত হইতে কুঠার কাড়িয়া লইল এবং তাহার হাত ধরিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। হরিশের অপেক্ষা কেনারামের শক্তি অধিক, অগত্যা সে রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

এই দিন হইতে হরিশ, দাদাকে আপনার প্রবল শত্রু জ্ঞান করিল এবং প্রকাশ্যে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

( ৪ )

ইহার পরদিন গোপাল তাহার বড়মার বাড়ীতে কি খাইয়া আসিয়া কেবল বমন করিতে লাগিল। সে দিন হরিশ বাড়ীতে ছিল না। ছোটবৌ অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার মাতা চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক জড় করিলেন। ডাক্তার আসিল। ঔষধের দ্বারা বমন বন্ধ হইল। ডাক্তার বলিলেন, কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণেই এরূপ হইয়াছিল, তবে বমন হইয়াছে, এই রক্ষা, নতুবা প্রাণরক্ষা কঠিন হইত। প্রবাদ, ডাক্তার বাবু প্রাইমারী পরীক্ষার শেষদিনে পাঠ্য পুস্তকের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া পৈতৃক থার্ম্মোমিটার ও ষ্টেথিস্কোপ পকেটে গুঁজিয়াছেন। যাহা হউক, ডাক্তারের কথা শুনিয়া সকলেই বলিল, হায় হায়, এমন শত্রুতাও করে! থানায় খবর দিয়া মাগীর হাতে দড়ি দেওয়া উচিত।

আসল কথাটা,—গোপাল বড়মার ঘরে গিয়া তাহার অগোচরে মিছরি বোধে এক টুকরা ফট্‌কিরি খাইয়া আসিয়াছিল।

ক্রমে গোপালের অসুখের কথাটা বড়বায়ের কানে গেল! সে আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া সেখানে আসিল। গোপাল তখন ক্লান্ত হইয়া শুইয়াছিল। বড়বৌ আসিয়াই তাহাকে কোলে টানিয়া তুলিল। অমনই ছোট বউয়ের মাতা "রাক্ষসী" বলিয়া তাহার কোল হইতে গোপালকে কাড়িয়া লইলেন। বড়বৌয়ের হৃৎপিণ্ডটা যেন কে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইল। সকলেই তাহার দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। বড়বৌ ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার সন্তানহীন শূন্য হৃদয়টা 'হায় হায়' করিয়া উঠিল।

পরদিন হরিশ বাটী আসিয়া সমস্ত শুনিল। শুনিয়াই প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইয়া বড়দাদা ও বড়বৌকে শুনাইয়া অনেক গালাগালি করিল। অসহ্য হইলে কেনারামও তাহার দুই একটা কড়া উত্তর দিল। রাগে

হরিশ সন্ধ্যার পর কেনারামের তিন বিঘা জমীর মেঘের মত শ্যামল, জমীভরা ধান্তগুলাকে একেবারে ঘাঁটিয়া দিয়া আসিল। পরদিন জমী দেখিয়া কেনারামের বুক ফাটিয়া গেল। কে যেন তাহার হাড়-গুলাকে কঠোর পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল, নিশ্বাস রোধ করিয়া জমীর দিকে চাহিয়া রহিল। পাছে হরিশের উদ্দেশে তাহার একটা বুকভাঙ্গা তপ্ত নিশ্বাস পড়ে। জমীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল। সযত্নে তাহা রোধ করিয়া কেনারাম দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। ভয়, পাছে তাহার একবিন্দু অশ্রুতে হরিশের কোন অমঙ্গল হয়।

অনেকে কেনারামকে হরিশের নামে নালিশ করিতে পরামর্শ দিল, কিন্তু কেনারাম তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। মনে মনে বলিল, 'সকলে পাগল না কি! ভাইয়ের নামে আবার নালিস!' এমনই ভ্রাতৃস্নেহ!

কিন্তু কেনারাম কিছু না বলিলেও অনেকেই হরিশকে ছিছি করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কেনারামেরও প্রশংসা করিল। তাহা শুনিয়া হরিশ আরও জ্বলিয়া উঠিল।

ইহার কয়েক দিন পরে একদিন কেনারাম তাহার জমীতে কাজ করিতেছিল। পাশেই হরিশের জমী। সেই জমী হইতে অন্য এক ব্যক্তি খানিকটা জল কাটাইয়া লইয়াছিল। হরিশ জমীর নিকট দাঁড়াইয়া তাহাকে গালাগালি করিতেছিল। সে ব্যক্তিও তখন তথায় উপস্থিত। সেও প্রত্যুত্তরস্বরূপে হরিশকে গালাগালি করিল। ক্রমে গালাগালি মারামারিতে পরিণত হইল। দূর হইতে দেখিয়া কেনারাম ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তাহার আসিবার পূর্ব্বেই হরিশ সে ব্যক্তিকে রীতিমত প্রহার করিয়া এবং তাহার জমীর খানিকটা ধান ঘাঁটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, কেনারাম সেই প্রহৃত ব্যক্তির নিকট বসিয়া তাহাকে কি বলিতেছে।

প্রহৃত ব্যক্তি এ অপমান সহ্য করিল না, সে আদালতে হরিশের নামে নালিশ করিল। কেনারামের নামে সাক্ষীর শমন আসিল। কিন্তু প্রথমে সে ভ্রাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে কিছুতেই স্বীকার করিল না। শেষে সকলেই যখন বলিল, সাক্ষ্য না দিলে আদালতের অবমাননা করা হইবে এবং তাহাতে তাহার জেল পর্য্যন্ত হইতে পারে, তখন অগত্যা তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হইল। হরিশের বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা না করিলেও উকীলের জেরায় তাহার মুখ দিয়া সমস্ত কথাই বাহির হইয়া পড়িল। বিচারে হরিশের পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইল। কেনারাম মনে মনে বলিল, হায়, আমিই জেলে গেলাম না কেন? কিন্তু হরিশ ভাবিল, এ সকলই কেনারামের চক্রান্ত। তাহারই মন্ত্রণায় এবং তাহারই সাক্ষ্যে এই দণ্ড হইল। ক্রুদ্ধ হরিশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, ইহার শোধ যদি না লইতে পারি, তবে আমার পাটোয়ারি বুদ্ধিতেই দিক্!

৫

একদিন রাত্রিতে হরিশের গৃহে চোর চোর শব্দ শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আসিয়া দেখিল, চোর তখন পলায়ন করিয়াছে, উঠানের একপাশে একটা ভাঙ্গা বাক্স পড়িয়া রহিয়াছে। হরিশ আলোক লইয়া কয়েকজন লোকের সহিত বাটীর চারিদিক্ অন্বেষণ করিল, কিন্তু চোর তখন সেখানে ধরা দিবার জন্য বসিয়া ছিল না, কেবল উঠানের প্রাচীরের মধ্য দিয়া যে দ্বার দিয়া কেনারামের বাটীতে যাওয়া যায়, সেই দ্বারটা খোলা ছিল।

সকালে থানায় খবর গেল। মধ্যাহ্নকালে দারোগা বাবু ঘোড়ায় চড়িয়া দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে মহেশপুর গ্রামখানা তোলপাড় হইয়া উঠিল। গয়লা-বৌ দুধের কেঁড়ে লুকাইল, মুদী দোকানের ঝাপ বন্ধ করিল, মাছগুলা পুষ্করিণীর গভীর জলে আশ্রয় লইল। দারোগা বাবু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হরিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার উপর তাহার সন্দেহ হয়।

হরিশ বলিল, চোরকে সে এক প্রকার চিনিয়াছিল। কিন্তু তাহার নাম করিতে সে এখন রাজী নহে। যাহা হইবার হইয়াছে, আর কেলেঙ্কারীতে কাজ নাই। তবে কেবল আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কর্ত্তব্যবোধে সে থানায় খবর দিয়াছিল।

কিন্তু হরিশ রাজী না হইলেও দারোগা বাবু ছাড়িবেন কেন? অনেক জেদাজেদির পর ভয়ে হরিশকে চোরের নাম করিতে হইল। চোর আর কেহ নহে, তাহারই দাদা কেনারাম। হরিশের কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই শিহরিয়া উঠিল। সকলে মনে করিল, এ সন্দেহটা কেবল কেনারামকে অপমানিত করিয়া প্রতিশোধ লওয়া। কিন্তু খানাতল্লাসীর সময় যখন কেনারামের উঠানে পেয়ারা-তলায় খানিকটা সদ্য-উত্তোলিত মৃত্তিকা প্রথমেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং যখন তাহার ভিতর হইতে এক ছড়া তাবিজ বাহির হইল, তখন সকলেই অবাক্, পরস্পর বলাবলি করিল, লোককে চেনা দায়। কেনারামের হাতে

হাতকড়ি পড়িল। যথোচিত নিগ্রহের পর দারোগা বাবু তাহাকে চালান দিলেন। চৌকীদার-কনষ্টেবল-বেষ্টিত হইয়া কেনারাম হাজতে ঢুকিল। বড়বৌকে শুনাইয়া শুনাইয়া হরিশের শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিতে লাগিলেন, "এখনও ধর্ম্ম আছে, রাতদিন হচ্ছে, যিনি আমাদের হিংসা কর্‌বেন, আমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা কর্‌বেন, হে বাবা হরি! তার বিচার তুমি কোরো।"

হরি তাঁহার এই অভিযোগ শুনিয়াছিলেন কি না এবং শুনিয়া তাহার কোন বিচার করিয়াছিলেন কি না, তাহা হরিই জানেন; কিন্তু ইহাই শু'নয়া বড়বৌ তুলসীতলায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, "হে ঠাকুর! কোন্ পাপে আমার সদাশিব স্বামীর এই শাস্তি?"

যথাসময়ে আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। হরিশের পক্ষে দুইজন বড় বড় উকীল নিযুক্ত হইল; কেনারামও একজন উকীল নিযুক্ত করিল। হরিশের পক্ষ হইয়া অনেক সাক্ষী উপস্থিত হইল। দুই এক জন ভদ্রলোক বড়বৌয়ের কাঁদাকাটায় দয়াপরবশ হইয়া আসামীর চরিত্র-বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সকলের সাক্ষ্যেই ভ্রাতৃদ্বয়ের সাংসারিক বিরোধের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আসামীকে দেখিয়া অবধি হাকিমের মনে মোকদ্দমা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে হরিশের পক্ষীয় সাক্ষিগণের কথার অনৈক্য এবং কেনারামের প্রতি হরিশের ঘোর বিদ্বেষের কথা শুনিয়া তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। আরও বুঝিলেন যে, যে চোর, সে যে অপহৃত জিনিস উঠানের মাঝখানে —যেখানে প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে— এমন জায়গায় পুঁতিয়া রাখিয়া আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক ধরা দিবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব। হাকিম মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন এবং মিথ্যা অভিযোগের জন্ম হরিশকে ২১১ ধারায় অভিযুক্ত না হইবার কারণ প্রদর্শন করিতে বলিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে হরিশ উন্মাদ হইয়া উঠিল। তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

(৬)

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু গোপালকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। সে সমভাবে বড়মার স্নেহধারাটুকু পাইবার জন্ত নিয়ত ছুটিয়া আসিত। বড়মাও এই ক্ষুদ্র ভিখারীটিকে কোন দিনই তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেন না। যে দিন কেনারাম পুলিশে চালান গেল, সে দিন গোপাল বড়মার চক্ষুজলের সহিত আপনার ক্ষুদ্র ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটির জল মিশাইয়া বড় কান্নাই কাঁদিল। তাহার কান্না দেখিয়া বড়বৌ আপনার চক্ষুজল মুছিল, শেষে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোলে শত চুম্বন করিল। সে স্নেহচুম্বনে গোপাল হাসিল, বড়বৌ মুহূর্ত্তে ঠাকুরপোর উপর, ছোট যায়ের উপর সমস্ত রাগ ভুলিয়া গেল।

তার পর মোকদ্দমায় অব্যাহতি পাইয়া কেনারাম যখন বাড়ী আসিল, তখন গোপাল ছুটিয়া আসিয়া দুইটি কচি হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, মুখের উপর মুখ দিয়া ডাকিল, "জেথা।" কেনারাম রাগ তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া গোপালের মুখ-চুম্বন করিল।

গভীর রাত্রিকালে বাটীর দ্বার খুলিয়া হরিশ বাহিরে আসিল। তাহার বুকের ভিতর ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল, প্রতিশোধ-পিপাসায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। সে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া ধীরে ধীরে কেনারামের শয়নকক্ষের পশ্চাতে দাঁড়াইল। তার পর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দেশালাই বাহির করিয়া জ্বালিল, কম্পিত হস্তে সেই জ্বলন্ত দেশালাই ঘরের চালের নিকট ধরিল। খড়ের চাল ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হরিশ একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে আপনার বাটীতে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত চালটা ধরিয়া উঠিল। অন্ধকার গগনে অগ্নির করাল শিখা উঠিয়া গ্রামখানাকে সহসা আলোকিত করিল। সে আলোকে সুখ-সুপ্ত গ্রামবাসিগণ চমকিত হইল, চারিদিকে একটা 'গেল গেল' শব্দ উঠিল। অনেক লোক আসিয়া কেনারামের বাটীর নিকট সমবেত হইল। কেনারাম বড়বৌকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল; সমস্ত জিনিসপত্রের সহিত ঘরখানা পুড়িতে লাগিল। অনেকে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তখন বাড়ীর চারিদিক্ ধরিয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রবল বায়ু বহিল। অগ্নির একটা শিখা ছুটিয়া গিয়া হরিশের গৃহের চালের উপর পড়িল। সে গৃহখানাও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই সেই দিকে ছুটিল।

হরিশ পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে পারিত। কিন্তু পাপীর মনে অনেক ভয়। কোথা হইতে একটা অজ্ঞাত ভীতি আসিয়া তাহার হৃদয় চাপিয়া ধরিল, সে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই ভয়ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। তার পর মুহূর্ত্ত পরেই মাথার উপর অগ্নির করাল শিখা দেখিয়া সে আপনার রাগের পরিণাম বুঝিতে পারিল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। পত্নী, পুত্র, সম্পত্তি সমস্তই জ্বলন্ত বহ্নির করাল গ্রাসমধ্যে পড়িয়া রহিল। ক্ষণমধ্যেই সমস্ত বাড়ীখানা বেড়িয়া ভীম-গর্জ্জনে অগ্নির

রক্তশিখা নাচিতে লাগিল। গৃহমধ্যে হইতে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কেহই সেই অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না, সকলেই হতবুদ্ধিভাবে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ অগ্নিক্রীড়া দেখিতে লাগিল। দুইটি রমণী একটি শিশুর সহিত জীবন্ত দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। হরিশ স্তম্ভিত-হৃদয়ে দাঁড়াইয়া এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

সহসা কে ও ছুটিয়া আসিয়া ঐ প্রজ্বলিত অগ্নি-স্তূপের মধ্যে প্রবেশ করে? সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, সে কেনারাম। কেনারাম বেগে সেই অনলরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নির লোল জিহ্বা নাচিতে লাগিল। সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিল। নিমেষমধ্যেই গোপালকে বক্ষে চাপিয়া ছোটবোয়ের অর্দ্ধদগ্ধ অচেতন দেহ কক্ষে লইয়া অগ্নি-রাশির মধ্য হইতে কেনারাম বাহিরে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের জ্বলন্ত চালটা ভাঙ্গিয়া ঘরের উপর পড়িল। কেনারামের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া সকলে আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিল। কেনারাম বাহিরে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

(৭)

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভস্মে পরিণত করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। তখন কেনারামের চৈতন্য হইয়াছে, সে গোপালকে বুকে লইয়া বসিয়াছে। পার্শ্বে ছোটবোয়ের অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার শিয়রে বসিয়া বড়বৌ কাঁদিতেছে। সমবেত জনমণ্ডলী নীরবে দাঁড়াইয়া এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছে। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শব্দ উঠিল, "দাদা!" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হরিশ আসিয়া কেনারামের পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িল। কেনারাম এক হস্তে গোপালকে ধরিয়া, অন্য হস্তে হরিশকে টানিয়া বুকের উপর তুলিল। বহুদিনের পর দাদার স্নেহপূর্ণ বুকে মাথা রাখিয়া হরিশ কাঁদিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কেনারামও বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হইল।

তার পর সেই ভস্মস্তূপ পরিষ্কার করিবার সময় একটি দগ্ধপ্রায় কঙ্কাল বাহির হইল। সকলেই চিনিল, সে কঙ্কাল হরিশের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর।

* * * * *

দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রত লোকের মনে যেমন দুষ্ট স্বপ্নের একটি ছায়ামাত্র থাকে, তেমনই কেনারামের, বড়বোয়ের এবং হরিশের হৃদয়ে একটি ক্ষীণ ছায়ামাত্র রাখিয়া অতীতের ঘটনানিচয় একে একে মুছিয়া গেল হরিশ আবার দাদার, বড়বোয়ের স্নেহ-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। যে একটি ক্ষুদ্র বালির বাঁধ সেই স্রোতোবেগকে এতদিন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভগ্ন হওয়ার অবরুদ্ধ স্রোত আবার প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। কেবল সেই বালির বাঁধের একটি ক্ষুদ্র দাগ রহিল—গোপাল।

# মধুসূদনের দুর্গোৎসব

( ১ )

মহালয়া অমাবস্যার শেষ রাত্রিতে মধুসূদন স্বপ্ন দেখিলেন, যেন স্বয়ং ভগবতী আসিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "মধু! আমি তোর ঘরে আসিব।" মধুসূদনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত—ঘর্ম্মাপ্লুত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘরের চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, শারদীয় উষার শান্ত আলোকরাশি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। রায় বাবুদিগের বাটী হইতে নহবতের ললিতসুর উঠিতেছে, শানাইটা গলা ছাড়িয়া বিভাষে গাহিতেছে—

"গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।"

মধুসূদন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। আজি প্রতিপদের শান্ত প্রভাতটা তাঁহার দৃষ্টিতে বড়ই সুন্দর—বড়ই মনোহর বোধ হইল। কিন্তু তাড়াতাড় মুখহাত ধুইয়া, গামছাখানি কাঁদে ফেলিয়া নবীন ছুতারের * বাটীতে গেলেন। অবিলম্বে নবীন আসিয়া কাঠাম বাঁধিতে বসিল। মধুসূদনের গৃহিণী দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, ব্যাপার কি?"

মধুসূদন একগাল হাসিয়া বলিলেন, "ছোটবৌ! মা আসিবেন।"

ছোটবৌ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ নাকি?"

মধুসূদন বলিলেন, "না ছোটবৌ! ক্ষেপী আপনিই আসিতেছেন।"

মধুসূদন চুপি চুপি স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া ছোটবৌয়ের রোমাঞ্চ হইল। বলিল, "কিন্তু কিসে কি হইবে?"

মধুসূদন বলিলেন, "সে কথা মা-ই জানেন।"

ছোটবৌ বলিল, "তবু পাঁচ জনের পাতেও তো ভাত দিতে হবে?"

মধুসূদন বলিলেন, "তা হবে বৈ কি। ঘরে কতগুলি ধান আছে?"

ছোটবৌ বলিল, "কুড়ি সাতেক (প্রায় দুই মণ) হবে।"

মধুসূদন বলিলেন, "তারই কিছু পূজার আলো চালের জন্য, বাকী সিদ্ধচালের জন্য দাও।"

গৃহিণী চলিয়া গেল। মধুসূদন চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া যজমান-বাড়ীর অভিমুখে চলিলেন।

( ২ )

মধুসূদন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গ্রামের মধ্যে পাঁচ ছয় ঘর যজমান আছে, তাহার আয়েই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলে। ইহা ব্যতীত পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর পাঁচ বিঘা সাড়ে সাত কাঠা ধান-জমী আছে। কিন্তু গত বৎসর নূতন জরীপের সময় তাহার দুই বিঘা জমী নায়েব মহাশয় মালভুক্ত করিয়াছেন। অবশিষ্ট জমী ভাগে প্রজাবিলি আছে। মধুসূদনের বিদ্যাশিক্ষা ভাল হয় নাই। তিনি এক বৎসর মাত্র বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে সংক্ষিপ্তসারের কয়েক পাতা উল্‌টাইয়াছিলেন। তবে তাঁহার স্বভাবটি বড় নম্র, বড় উদার ছিল। এ জন্য গ্রামের অনেকেই এই বিদ্যাশূন্য আড়ম্বরহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভক্তি ও ভালবাসার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। মধুসূদনের সন্তানসন্ততির মধ্যে একমাত্র কন্যা উমা। ঘোষপুরের বনিয়াদী বড়লোক শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত উমার বিবাহ হইয়াছে। উমা যেমন সুন্দরী, তেমনই ভাল ঘরে পড়িয়াছে। এখন সংসারে কেবল মধুসূদন এবং তাঁহার গৃহিণী।

মধুসূদন যজমান-বাড়ীতে গিয়া সকলকে মার আগমনের শুভ সংবাদ জানাইলেন। এ সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধগণ আনন্দিত হইল, যুবকদল মুখ বাঁকাইল। কারণ, তাঁহারা শিক্ষিত, সুতরাং এরূপ স্থলে সাহায্যার্থ বাজে খরচের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে মধুসূদনের ভাগ্যক্রমে গ্রামে এরূপ যুবকের সংখ্যা অল্পই ছিল! কারণ, তাঁহারা প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়াপীড়িত জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া সস্ত্রীক কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। কেবল মৃত্যুভয়রহিত বৃদ্ধেরাই তখনও বাস্তুভিটা আগাইয়া বসিয়াছিল। যাহাই হউক, মধুসূদনের একেবারে

* মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি জেলার অনেক স্থানে সূত্রধর জাতিই প্রতিমা নির্ম্মাণ করে।

বিফল-মনোরথ হইতে হইল না; প্রায় সকলের নিকটই অল্প-বিস্তর সাহায্যের আশা পাইলেন।

ঘুরিয়া ফিরিয়া মধ্যাহ্নকালে মধুসূদন বাড়ী আসিলেন। আহারান্তে গৃহিণীকে বলিলেন, "উমিকে আনতে হবে কি?"

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ও মা, বল কি গো, মেয়েকে আনবে না? পুজো-বাড়ী সাজবে কেন? আর এত কাজই বা করবে কে? আমি একা কি সব পেরে উঠবো?"

মধুসূদন বলিলেন, "তা তো বটেই, তবে এখন তারা পাঠালে হয়।"

গৃহিণী বলিল, "ঘরে মা আসছেন, আর মেয়ে পাঠাবে না, তাও কি হয়?"

মধুসূদন সেই দিনই ঘোষপুর যাত্রা করিলেন এবং বেহাই ও বেহানকে অনেক বলিয়া কহিয়া, পরদিন উমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। কথা রহিল, বিজয়ার পরদিনই উমাকে রাখিয়া আসিতে হইবে। কারণ, পূজার ছুটীতে জামাই বাড়ীতে আসিতেছেন।

(৩)

মধুসূদনের পূজার কথাটা ক্রমে পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রথমে কেহই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তার পর যখন মধুসূদনের ছোট চণ্ডীমণ্ডপটিতে নবীনকে প্রতিমার গায়ে কাদা মাখাইতে দেখিল, তখন অগত্যা সকলকে এমন অসম্ভব কথাটার উপরও জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে হইল। তবে তাহারা স্থির করিল যে, নিশ্চয়ই মধুসূদনের মাথাটা রায়বাবুদের বাটীর বাজনার শব্দে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, বড় পুকুরের যে যক (যক্ষ) আছে, মধুসূদন রাতারাতি তাহার সব টাকার ঘড়াগুলা পাইয়াছে। সকলেই ব্যগ্রচিত্তে এই পূজার পরিণাম দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিল। এ জন্য যে অনেকেই অনিদ্রা ও অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, এরূপও শুনা যায়। পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া ছোটবৌকে নানাবিধ প্রশ্ন করিত; কত লোক খাইবে, কতগুলি চাল তৈয়ারী হইল, দধি-সন্দেশের কিরূপ বায়না দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি শ্লেষপূর্ণ বিবিধ প্রশ্ন তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিত। ছোটবৌ যথাসম্ভব বিনয় সহকারে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিত। সকলেই ক্ষুণ্ণমনে বাটী প্রত্যাগমন করিত।

মধুসূদন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যজমানেরা যে যেরূপ পারিল, অর্থ-সাহায্য করিল; যে না পারিল, সে অন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। ইহা ব্যতীত রায়বাবুরা বড়পুকুর হইতে মাছ ধরাইয়া লইতে আদেশ করিলেন, ধানের মহাজন পাল বুড়ো কিছু ধান দিল, হারু মাঝি গাছের এক কাঁদি কলা কাটিয়া দিল, ধনী গোয়ালিনী দশসের দধি দিবে বলিল, বেণী ময়রা পাঁচসের সন্দেশ দিতে স্বীকার করিল। এইরূপে মধুসূদন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত এক প্রকার ঠিক করিয়া ফেলিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন, কোন স্থানে বিফল-মনোরথ হইলে হৃদয়টা যখন ভাঙ্গিয়া পড়িত, তখন আসিয়া একবার সেই অসজ্জিত প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইতেন। অমনই তাঁহার ক্লান্ত হৃদয়ে আনন্দের একটি মধুর হিল্লোল বহিয়া যাইত; দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বুক বাঁধিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আবার মাতৃপূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

এ দিকে পাড়ার যত ছেলে আসিয়া মধুসূদনের বাটীতে আড্ডা করিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষুদ্র বাটীটি বালকগণের হর্ষকল্লোলে মুখরিত হইতে লাগিল। পাঠশালার ছুটী হইলেই দলে দলে বালকগণ বই বগলে করিয়া ঠাকুর দেখিতে ছুটিত। কখনও বা তাহাদের মধ্যে দুইটা দল হইত। এক দল বলিত, রায়েদের ঠাকুর ভাল, অপর দল বলিত, চক্রবর্ত্তীর ঠাকুর ভাল। শেষে তাহাদের এই সমালোচনার পরিণামে গালাগালি, মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। কেহ বা নবীনকে তামাক সাজিয়া দিয়া তাহার রঙের চুপড়ী হইতে একটু রঙ সরাইবার অবসর খুঁজিত। তাহাদের বালক-সুলভ হাস্য-চীৎকারে বাড়ীখানির মধ্যে যেন একটি মহোৎসবের আনন্দ-কল্লোল ছড়াইয়া পড়িত। ছোটবৌ এক একবার বাহিরে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিত, আর আনন্দে তাহার হৃদয়খানি ফুলিয়া উঠিত।

দেখিতে দেখিতে পঞ্চমীর রাত্রি কাটিয়া গেল। মধুসূদন চারিদিক্ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনমত জিনিসপত্র আনিতে লাগিলেন, ছোটবৌ ও উমা উভয়ে মিলিয়া তাহা গুছাইতে ব্যস্ত হইল। যথাসম্ভব লোকজন নিমন্ত্রিত হইল। দেখিয়া শুনিয়া পাড়ার সকলে অবাক্ হইল। তবে মধুসূদনের বড় ভাই যদুনাথ বহু গবেষণার পর অনেকের নিকট, বিশেষতঃ বড়বৌয়ের কাছে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এ "কাঠবিড়ালীর সাগর-বন্ধন। পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।" তাঁহার এই মন্তব্য প্রকাশের যে কোন বিশেষ কারণ ছিল না, তাহা নহে। বড়বৌ অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিল যে, "ঠাকুরপো খেতে পায় না, সে পুজো আনলে, আর তুমি এতদিনে বাবুদের

বাড়ী চাকরী ক'রেও কিছু কর্‌তে পার্‌লে না?" অবশ্য যদুনাথ পৃথগন্ন। ইহার উপর ছোটবৌ মাঝে মাঝে আসিয়া যখন বড়বৌকে পূজা-বাড়ীতে পদার্পণ করিতে এবং কাজকর্ম্ম দেখিতে শুনিতে অনুরোধ করিল, তখন মুখে কিছু না বলিলেও বড়বৌয়ের অন্তরটা গুমরিয়া উঠিত, ক্রোধে, ক্ষোভে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইত। সে ভাবিত, ছোটবৌয়ের এই হাসি-মাখা আহ্বান ও অনুরোধের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অহঙ্কার ও শ্লেষ লুক্কায়িত আছে। এই জন্যই বড়বৌ স্বামীকে বলিয়াছিল, "তুমি পাত পাড়তে যাও যাবে, আমি তো ও ভিটায় পা দেব না। উমির যে অহঙ্কার, হ'লেই বা বড়লোকের বউ।"

পত্নীর কথার উত্তরে যদুনাথ কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই, তবে তাহা যে পত্নীর মতের প্রতিকূল নহে, ইহা নিশ্চয়। কেন না, পূজার তিনদিন যদুনাথকে বাড়ীতে দেখা যায় নাই। শুনা যায়, তিনি নাকি এ কয় দিন রায়বাবুদের পূজা-বাটীতে দিন-রাত খাটিয়া আপনার সহৃদয়তা ও পরো-পকারপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। আর বড়বৌ পেটের বেদনায় শয্যা ত্যাগ করিতে পারে নাই; সে এ কয়দিন কেবল রাত্রিকালে হরিশের আনীত খাদ্যগুলি খাইয়াই অতি কষ্টে দিন কাটাইয়াছিল।

( ৪ )

ষষ্ঠীর প্রভাতে মধুসূদন কল্পারম্ভ করিলেন। সন্ধ্যা-কালে একটা ঢাক আসিয়া বাড়ীখানাকে সরগরম করিয়া তুলিল। নূতন কাপড় পরিয়া ছেলের দল ঠাকুর সাজান দেখিতে ছুটিল। সন্ধ্যার পর মধুসূদন বিল্বমূলে দেবীর বোধন করিলেন। আবাহনের মন্ত্র-গুলি পাঠ করিতে করিতে মধুসূদন আত্মহারা হই-লেন। সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য না হইলেও তাহাই যেন তাঁহার তৃষিত হৃদয়ে কোন্ স্বর্গের অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল, আনন্দ-মিশ্রিত ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিল —চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

অনেক রাত্রিতে ঠাকুর সাজান শেষ হইল। মধু-সূদন চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে প্রতিমার সম্মুখে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখি-লেন, যেন সেই সদ্যঃ-সজ্জিতা দেবী-প্রতিমা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "মধু! বলি চাই।"

স্বপ্নঘোরেই মধুসূদন বলিলেন, "আমি যে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত মা!"

দেবী বলিলেন, "আমিও যে বৈষ্ণবী।"

মধুসূদন বলিলেন, "কিন্তু মা, বলিদান যে আমার কুল-প্রথা নয়?"

দেবী বলিলেন, "তা হইবে না মধু। বলি চাই। শীঘ্র বলির চেষ্টা কর, বেলা হইল, উঠ।"

মধুসূদন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কাহার অঙ্গস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, ছোট-বৌ তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিতেছে, "বেলা হ'লো উঠ, উঠ।"

মধুসূদন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে শান্তোজ্জ্বলরূপিণী সজ্জিতা দেবী-প্রতিমা। দেবীর অলক্তক রঞ্জিত ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে স্নিগ্ধ হাস্যরশ্মি ক্ষরিত হইতেছে। দেবীকে প্রণাম করিয়া মধুসূদন বাহিরে আসিলেন।

( ৫ )

সপ্তমী পূজা শেষ হইল। পূজা শেষে মধুসূদন দেবীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্তব পাঠ করিতে করিতে তিনি যেন কোন এক অজ্ঞাত আনন্দময় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরো-হিত হইল। ভক্তিসমুদ্বেলিত কণ্ঠে বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে। মাহেশ্বরি মদাশ্রয়ম্॥"

তাঁহার উভয় গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল।

উমার আনন্দের সীমা নাই। সে চেলীর কাপ-ড়ের আঁচলখানা কোমরে জড়াইয়া, চুলগুলাকে মাথার সম্মুখদিকে ঝুঁটি বাঁধিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরাম নাই। সে একবার পূজার কাছে ছুটি-তেছে, আবার আসিয়া সমাগত বালকবালিকাগণকে মুড়িমুড়কী বিতরণ করিতেছে, কখন বা রন্ধনশালায় ছুটিয়া যাইতেছে; যেন একটি আনন্দ-প্রতিমা আনন্দময়ীর কতকটা আনন্দধারা হৃদয়ে লইয়া তাহা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিতেছে। ছোটবৌ রন্ধনশালা হইতে এক একবার এই দৃশ্য দেখিতেছে, আর ভাব-তেছে, "যাহার উমা আছে, তাহারই পূজা সার্থক।" আর মধুসূদন দেখিতেছেন, একটি উমা যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আজি তাঁহার গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছে। তিনি একবার প্রতিমার দিকে চাহিতেছেন, আরবার অতৃপ্ত-নয়নে উমার স্বেদবিন্দুশোভিত প্রফুল্ল মুখখানি দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার

হৃদয়ে স্নেহমিশ্রিত ভক্তির প্রবাহ তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে।

অন্তরাল হইতে বড়বৌ এক একবার উমার দিকে চাহিতেছে, আর মনে মনে বলিতেছে, মা যদি সত্য হয়, তবে এত অহঙ্কার থাক্‌বে না, থাক্‌বে না।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক খাওয়ান হইল। অতিথি অভ্যাগত সকলেই পরিতোষ সহকারে ভোজন করিল। সকলেই বলিল, এমন পরিতৃপ্তির সহিত আহার রাজবাড়ীতেও হয় নাই। মার দৃষ্টি না হইলে এমন হয় না। রায় বাবুদের বাটীতে নিমন্ত্রণ থাকিলেও এবং তথায় অত্যুত্তম খাদ্যাদির বন্দোবস্ত হইলেও ইহার পর দুই দিন অনেকেই মধুসূদনের বাটীর আহার ছাড়িয়া সেখানে যায় নাই।

তাই বলিয়া মধুসূদন যে এত উৎকৃষ্ট ও প্রচুর সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তবে উমার হাতের গুণেই হউক বা তাঁহার ভক্তিমিশ্রণেই হউক, সেই সকল সামান্য সামগ্রীতেই লোকে অমৃতের আস্বাদ পাইল। মধুসূদন একশত লোকের আয়োজন করিয়া দুইশত লোক খাওয়াইলেন, তথাপি ভাণ্ডার শূন্য হইল না।

সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ রায় মহাশয় স্বয়ং নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "চক্রবর্ত্তি! তোমার পূজাই সার্থক। আমাদের অর্থব্যয়ই সার।"

( ৬ )

অষ্টমী-পূজা হইল। দিবসেই সন্ধিপূজা, তাহাও সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যাকালে আরতির সময় মধুসূদন দেখিলেন, দেবীর প্রফুল্ল বদনমণ্ডল যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

অষ্টমীর শেষ রাত্রিতে উমার দুইবার ভেদ ও বমন হইল। সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। প্রভাতে ছোটবৌ ডাক্তার ডাকিবার জন্য মধুসূদনকে বলিল। কিন্তু মহেশপুরে ডাক্তার ছিল না। প্রায় এক ক্রোশ দূরে গোপালগঞ্জ গ্রামে একজন ভাল ডাক্তার ছিল। কিন্তু কে ডাক্তার ডাকিতে যায়? মধুসূদন পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার আনিতে গেলে মায়ের পূজা হইবে না।"

ছোটবৌ বলিল, "তবে কি হবে?"

মধুসূদন বলিলেন, "মা যা করিবেন, তাহাই হবে।"

মধুসূদন দেবীর চরণামৃত আনিয়া উমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ছোটবৌ কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার রোগক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। মধুসূদন নবমী-পূজা শেষ করিয়া কাতরকণ্ঠে মায়ের নিকট উমার প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

উদ্বেগে—আশঙ্কায় নবমীর দিন কাটিয়া গেল।

সান্ধ্য আরতি শেষে মধুসূদন আবার উমাকে দেবীর চরণামৃত খাওয়াইয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর হইতেই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। যেন কোন নিরানন্দের রাজ্য হইতে একটা গাঢ় অন্ধকার আসিয়া নবমীর বিষাদ-যামিনীকে আরও বিষণ্ণ করিয়া তুলিল। প্রকৃতি স্থির নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে মধুসূদন যেন মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বসূচনা দেখিতে পাইলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল—যে রাত্রিতে গিরিরাণী প্রাণের উমাকে বিদায় দিতে হইবে বলিয়া সকাতরে তাহার করুণা ভিক্ষা করিয়াছিলেন—নবমীর সেই কালরাত্রি আসিল। সেই কাল রজনীতে যখন মধ্য যামের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রায়বাবুদের বাটীতে নহবতের শানাইটা বেহাগের করুণ রাগিণীতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেছিল,—"কেমন ক'রে রব ঘরে ব'লে যা মা হেমবরণি!" সেই সময়ে মধুসূদনের বাটী হইতে ক্রন্দনের উচ্চরোল উঠিল। উমা চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিল। কয়েকজন প্রতিবাসী ছুটিয়া আসিয়া তাহারা ছোটবোয়ের কোল হইতে উমার মৃতদেহ টানিয়া লইয়া উঠানে নামাইল। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। বড়বৌ প্রাচীরের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "আহা, কি পূজাই কর্‌লে ঠাকুরপো, কি রাক্ষসীকে ঘরে আন্‌লে? মাটীর ঠাকুর ঘরে এনে এমন সোনার প্রতিমার বিসর্জ্জন দিলে?" বড়বৌ অঞ্চলে শুষ্ক চক্ষু মুছিল। মধুসূদন তীব্র কটাক্ষে একবার তাহার পানে চাহিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ছুটিলেন।

( ৭ )

দেবীর সম্মুখে একটি মাত্র আলোক জ্বলিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে নিস্তব্ধ চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে দেবী-প্রতিমা যেন থম্‌থম্ করিতেছিল। মধুসূদন ছুটিয়া আসিয়া দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন; উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি করিলি মা!"

মধুসূদন শুনিতে পাইলেন, সহসা দেবী যেন ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "বলি কোথায়?"

মধুসূদন স্থির-দৃষ্টিতে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত থাকিতে উমাই কি তোর বলি হইল মা?"

উত্তর আসিল, "হাঁ।"

মধুসূদন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তবে তাই হোক ইচ্ছা-ময়ি! তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।"

তখন সেই বায়ুকম্পিত ক্ষীণালোকমধ্যে সহসা যেন প্রতিমা নড়িয়া উঠিল। মধুসূদন স্তম্ভিত হৃদয়ে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রতিমা যেন সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন, "মধু!"

কি মধুর স্বর! এমন স্বর মধুসূদন জীবনে আর কখনও শুনেন নাই। সে মধুর অলৌকিক স্বর তাঁহার হৃদয়ের প্রতি গ্রামে যেন একটি সুধাস্রোত প্রবাহিত করাইয়া প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল, "মধু! মধু!" মধুসূদন বিস্ময়ে—ভক্তিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন; রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "মা! মা!"

"বাবা!" উত্তর আসিল, "বাবা!"

মধুসূদন বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখিলেন, দেবী-মূর্ত্তি ক্রমে উমামূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মধুসূদনের দৃষ্টিতে পলক নাই, বক্ষে স্পন্দন নাই, বিস্ময়ের—আনন্দের সীমা নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এক আনন্দরূপিণী উমা ছাড়া যেন আর কিছুই নাই। সেই অনন্তে অনন্তরূপিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মধুসূদন আবার ভক্তিবিকম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"মা!"

আবার—আবার যেন কোন্ অমৃতধাম হইতে অমৃতনিস্যন্দী কণ্ঠে কে উত্তর দিল,—"বাবা!"

এমন সময় ছোটবৌ আসিয়া সেইখানে আছাড়িয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া বলিল, "রাক্ষসি! আমার উমা কোথায়?"

মধুসূদনের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল; মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইল। মধুসূদন, ছোটবৌয়ের হাত ধরিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ, কেঁদ না, উমা আছে।"

* * *

দশমীর অপরাহ্নে প্রতিমার সহিত উমাকে বিসর্জন দিয়া মধুসূদন গৃহে ফিরিলেন। ঢাকটা একবার 'মা গো, 'মা গো' শব্দে কাঁপিয়া উঠিয়া চুপ করিল। মধুসূন নীরবে অশ্রু মুছিয়া গৃহে আসিলেন। ছোটবৌ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, আমার উমাকে কোথায় রেখে এলে?"

মধুসূদন ধীরস্বরে বলিলেন, "উমা শ্বশুরবাড়ী গেছে, এক বৎসর পরে আবার আসবে।"

# কুড়ুনী

( ১ )

অধিক দিনের কথা নয়। সে বৎসরও এমনই দুর্ভিক্ষ, এমনই টাকায় ছয় সের চাউল, এমনই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হাহাকার; এমনই বাঙ্গালীর অর্দ্ধাশন, অনশন, শেষে নীরবে চিরান্তকর মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ। সেবারেও বাঙ্গালা সংবাদপত্র-মহলে এমনই তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল; ইংরাজী সংবাদপত্রে তাহার প্রতিবাদের সুর উঠিয়াছিল, আর গবর্ণমেণ্ট 'ও কিছু নয়' 'ও কিছু নয়' বলিয়া অগ্রসর হইবার জন্য সাহস দিতেছিলেন।

সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে * * * জেলার নিকটবর্ত্তী রূপসী গ্রামে গদাই বাস করিত। গদাই জাতিতে বাগদী। এক বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; জমার জমীর উপর ছোট কুঁড়েখানি, আর তাহাতে একটি মেটে পাথর, একটি কাণাভাঙ্গা ঘটী এবং দুইটি মাটীর কলসী ছাড়া আর কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল না; পরের খাটিয়া মজুরী সংগ্রহ ব্যতীত দিনপাতের অন্য উপায় ছিল না। তা' এই কয়টি ছাড়া আর যে কিছু তাহার সংসারে প্রয়োজন বা প্রার্থনীয় আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত একদিনও গদাই ভাবিত না। এই বৃদ্ধ মাতা, এই কুঁড়েখানি আর এই সুস্থ সবল দেহের একটা অক্লান্ত শক্তি লইয়াই সে এতদিন অনায়াসে নির্ভাবনায় সংসারটি চালাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সহসা কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার অনন্ত অভিশাপের মত দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি আসিয়া তাহার চিন্তাশূন্য জীবনযাত্রার পথে প্রবল প্রতিবন্দিরূপে দণ্ডায়মান হইল, তাহার চিরনির্ভয় হৃদয়ে আশঙ্কার—চিন্তার একটা প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সে তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া গদাই আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না।

ফল কথা, আগে মজুরীলব্ধ যে বারটি পয়সায় সংসার চলিয়া যাইত, এখন আর তাহাতে মাতা পুত্রের অর্দ্ধাশনও হয় না। তা' ছাড়া দূর-পল্লীগ্রামে মজুরীও সব দিন জোটে না। সে দিন পুকুরে শুষ্‌ণী কল্‌মী শাক, বনকচুর মূল প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু গদাই ছাড়া পল্লীর আরও অনেকে এই সকলের প্রত্যাশা রাখে, সুতরাং সময়ে সময়ে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। যে দিন—সে দিন অনশন ভিন্ন উপায় নাই। তা' গদাই নিজে না খাইয়া দুই দিন কাটাইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধা মাতাকে তো উপবাসী রাখা যায় না? সে দিন গদাই গ্রামের পর গ্রাম জঙ্গলের পর জঙ্গল ঘুরিয়া মাতার জন্য ফলমূল লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

এ সময়ে গদাইয়ের মত অবস্থাপন্ন অনেকেই চুরীডাকাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু গদাই সে পথ অবলম্বন করে নাই।

তা' এত কষ্টেও বাঙ্গালার শান্ত জলবায়ুর গুণে শক্তিশালী গদাই কোন দিনই ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই। অন্য দেশের গদাই এরূপ অবস্থায় কাহার উপর দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দেয় বলিতে পারি না, কিন্তু অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালার শান্ত গদাই সে বোঝাটা অদৃষ্ট নামক এক অলক্ষ্য দেবতার স্কন্ধে সম্পূর্ণভাবে চাপাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল। সুতরাং পরের ক্ষেতে সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সে যখন শ্রান্ত দেহ ও ক্ষুধাক্লিষ্ট উদরটি লইয়া গৃহে ফিরিত, তখন অনায়াসেই সমস্ত মাঠটা প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিত,—

'বঁধু তোমায় কোর্‌বো রাজা তরুর তলে।'

এ পর্য্যন্ত গদাইয়ের বিবাহ হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে একবার জনৈক বিধবা প্রতিবাসিনীর কন্যা কুড়ুনীর সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু পণের সাড়ে আট টাকা যোগাড় হইলেও চারিগাছা কাঁসার মল, দুইগাছা কাঁসার খাড়ু, এবং দুইটা পিত্তলের পাশা সংগ্রহ করিতে না পারায় সে যাত্রা বিবাহ হইল না। যে কুড়ুনীকে বিবাহ করিবার জন্য গদাই বহুদিন হইতে একটা প্রবল আগ্রহ পোষণ করিয়া আসিতেছিল এবং প্রাণপণ করিয়া পণের টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল, পাড়ারই আর একজনের সহিত সেই কুড়ুনীর বিবাহ হইয়া গেল। সে আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা। তারপর গদাইয়ের সেই সঞ্চিত টাকা কয়টি খরচ হইয়া গেল, বালিকা কুড়ুনী যুবতী হইল, শেষে বিধবা সাজিয়া মার কাছে আসিল এবং ঘুঁটে বেচিয়া ধান ধরিয়া জীবিকাপাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ কুড়ুনীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পরামর্শ দিল, কিন্তু কেন জানি না, কুড়ুনী তাহাতে মত দিল না। গদাইও এ জীবনে বিবাহ

অসম্ভব বুঝিয়া হাল ছাড়িয়া দিল। তথাপি সে এখনও মাঠ হইতে প্রত্যাগমনকালে, জানি না কি আশায়, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিত,—

"বঁধু তোমায় কোর্‌বো রাজা তরুর তলে।"

তাহার সেই আশাপূর্ণ আবেগ-বিজড়িত গানটি শুনিবার জন্য মাঠের ধারে তালপুকুরের ভাঙ্গা ঘাটটিতে বসিয়া কেহ অপেক্ষা করিত কি?

কুড়ুনী ডাকিল,—"আয় গদাই, হাটে যাই।"

গদাই উত্তর করিল, "আমি কি নিয়ে হাটে যাব?"

কু। আমি ঘুঁটে নিয়ে যাব, আর তুই কাঠ নিয়ে যাবি।

গ। কাঠ কোথায়?

কু। বনে।

গ। এর পর কাঠ ভেঙ্গে কি হাটে যাওয়ার বেলা থাক্‌বে?

কু। কেন থাক্‌বে না? দুজনে ভাঙ্‌লে একদণ্ডে কত কাঠ হবে।

গ। তুই আমাকে কাঠ ভেঙে দিবি?

কু। তা' না হ'লে তোকে ডাক্‌ছি কেন? আমি কি হাটের রাস্তা চিনি না?

গদাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"তা বটে, কিন্তু কুড়ুনী, আমার জন্য তুই এতটা—"

বাধা দিয়া কুড়ুনী বলিল,—"বেলা হ'লো, বেরিয়ে আয়। কা'ল তোর খাওয়া হয় নি?"

গ। কে বল্‌লে?

কু। আমি জানি, তা' কি করবো ভাই!—

কথাটা কুড়ুনীর মুখে বাধিয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি কথাটার চাপা দিয়া বলিল,—"শীগ্‌গীর বেরিয়ে আয়।"

গদাই বুঝিতে পারিল, তাহার মত কুড়ুনীরও কা'ল উপবাস গিয়াছে। সে আর কোন কথা না বলিয়া একখানা দা হাতে লইয়া বাহির হইল।

তোমরা শুনিয়া থাকিবে, গোবরেও পদ্মফুল ফুটে। তা' কুড়ুনী ঠিক পদ্মফুল না হইলেও যে অপরাজিতা বা কাঠমল্লিকা প্রভৃতির অন্তর্গত নহে, ইহা নিশ্চয়। নীচ শ্রেণীর মধ্যে এমন মেয়ে কচিৎ দুই একটা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং স্বাস্থ্য ও যৌবনপূর্ণ সুগোল দেহখানার টলটলে সৌন্দর্য্য লইয়া কুড়ুনী যখন একা হাটে মাঠে যাইত, তখন পল্লীবাসী অনেক নিষ্কর্ম্মা অগ্রসন্তানের মাথা কিছুতেই ঠিক থাকিত না। কিন্তু কুড়ুনী বড় শক্ত মেয়ে। সে অসহায় হইলেও আপনার দর্পটুকু বজায় রাখিয়া নির্ভয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করিত। তাহারা সে সাহসিকতার নিকট—সে গর্ব্বের সম্মুখে অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হইত না।

(৩)

অপরাহ্নকালে গদাই ও কুড়ুনী হাট হইতে ফিরিতেছিল। একটা ছোট বনের পাশ দিয়া রাস্তা। অপরাহ্নের শান্ত সূর্য্যকিরণ শ্যামপত্রাচ্ছাদিত বনশীর্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল; বনফুলের গন্ধমাখা একটা উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ মাঠের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল; পথের পাশে বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় বসিয়া একটা পাখী দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছিল, "চোখ গেল" "চোখ গেল।" আর গদাই আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল,—

'বঁধু তোমায় কোর্‌বো রাজা তরুর তলে।'

সহসা দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া শব্দ উঠিল, গুড়ুম! শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্বলন্ত গুলী আসিয়া গদাইয়ের বাম পার্শ্বে বিদ্ধ হইল। চীৎকার করিয়া গদাই পড়িয়া গেল। কুড়ুনী একটু পাছু পড়িয়াছিল, সে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, গদাই মূর্চ্ছিত হইয়াছে, তাহার গুলীবিদ্ধ ক্ষত স্থান হইতে তীরবেগে রক্ত ছুটিতেছে, সে রক্তে পথ কর্দ্দম হইতেছে। কুড়ুনী কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না; সে কেবল উচ্চ চীৎকারে পথ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

এমন সময় কুড়ুনী দেখিল, বনের পাশ হইতে সুন্দরপুরের কুঠীর অধ্যক্ষ ডন সাহেব বন্দুক-হস্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। সাহেবের পশ্চাতে একজন চাপরাসী। ক্রমে সাহেব নিকটে আসিলেন, গদাইয়ের নিকট আসিয়া একবার দাঁড়াইলেন, একবার মুখ নামাইয়া তাহার ক্ষতস্থান দেখিলেন; তার পর "Oh, curious mistake" বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন। কুড়ুনী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"সাহেব, সাহেব, গদাইকে বাঁচাও।"

সাহেব একবার তীব্র কটাক্ষে কুড়ুনীর দিকে চাহিলেন; তার পর সবলে পা ছিনাইয়া লইয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে পথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কুড়ুনী স্থির-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সাহেব চলিয়া গেলে কুড়ুনী উঠিয়া গদাইয়ের নিকট আসিল। সে বুঝিল, এ সময় কেবল কাঁদিলে বা ভাবিলে কোনই ফল হইবে না, যেরূপে হউক, গদাইকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে। সেখানে

হইতে রূপসী গ্রাম আধ ক্রোশের বেশী হইবে না। কুড়ুনী আপনার পরিধেয় বস্ত্রের আধখানা ছিঁড়িয়া নিকটস্থ খালের জলে ভিজাইয়া আনিল। গদাইয়ের মুখে চোখে জল দিল, কিন্তু মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। তখন সে সেই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া ফেলিল; তাহাতে রক্তস্রাব কিছু কমিল। এবার সে সাহায্যের আশায় একবার চারিদিকে চাহিল; কিন্তু কেহ কোথা নাই। একপার্শ্বে জনশূন্য বিশাল প্রান্তর, অপর পার্শ্বে নীরব অরণ্য, সম্মুখে পশ্চাতে নির্জ্জন পথ। কুড়ুনী কাপড়টা আঁটিয়া পরিল, তার পর উভয় হস্তে গদাইয়ের মূর্চ্ছিত দেহটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে কাঁধে তুলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু একবার, দুইবার চেষ্টা করিয়াও তাহা তুলিতে পারিল না। ক্ষোভে, দুঃখে ও নিরাশায় সে কাঁদিতে লাগিল।

একটু কাঁদিয়াই কুড়ুনী চক্ষু মুছিল, দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত করিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় হৃদয় বাঁধিল; আর একবার আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া গদাইকে তুলিতে চেষ্টা করিল। এবার চেষ্টা সফল হইল। তখন সে গদাইয়ের মূর্চ্ছিত দেহ কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

(৪)

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। গদাইয়ের বৃদ্ধ মাতা অনাহারে বসিয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় গদাইকে স্কন্ধে লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কুড়ুনী তথায় উপস্থিত হইল। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া মাটীতে আছাড়িয়া পড়িল। কিন্তু কুড়ুনী সেদিকে লক্ষ্য করিল না। সে একেবারে ঘরের ভিতর গিয়া গদাইকে শোয়াইল; তার পর বাহিরে আসিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। গ্রামে একজন ভাল ডাক্তার ছিলেন। কুড়ুনীর অনেক কাঁদাকাটায় তিনি আসিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। গুলী অস্থিভেদ করিয়া ভিতরে গিয়াছে, অজস্র রক্তপাতে জীবনীশক্তি ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তিনি উপস্থিতমত রক্তস্রাব বন্ধ হইবার একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কুড়ুনী কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসিল,—"ডাক্তার বাবু! গদাই বাঁচিবে তো?"

ডাক্তার নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কুড়ুনী গদাইয়ের শিয়রে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল; বাহিরে বৃদ্ধার চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল, রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় গদাইয়ের একবার চৈতন্য হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে জল প্রার্থনা করিল। কুড়ুনী তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিল। জলপানান্তে গদাই ডাকিল,—"কুড়ুনী?"

কুড়ুনী সাগ্রহে বলিল —"কেন গদাই?"

গ। কে আমাকে মেরেছে কুড়ুনী?

কু। কুঠীর বড় সাহেব।

"সাহেব" ব'লয়া গদাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। কুড়ুনী বলিল,—"কেন গদাই?"

গ। সাহেবে মেরেছে, এর আর শোধ নাই।

কু। কোম্পানীর মুলুকে একটা খুন ক'রে সাহেব কি পার পাবে?

গ। কোম্পানীর আদালতে সাহেবের বিচার নাই—বুঝি দুনিয়াতেও নাই।

কু। তবে কোথায় আছে?

গদাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুড়ুনীর মুখের দিকে চাহিল; ক্ষীণস্বরে বলিল,—"নিজের হাতে। কিন্তু—"

কুড়ুনী ব্যগ্রভাবে বলিল,—"কিন্তু কি গদাই?"

গদাই একটু থামিয়া, একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"কিন্তু এ বিচার আর কে করবে?"

গর্জ্জন করিয়া কুড়ুনী বলিল,—"আমি করব।"

গদাইয়ের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখে একটা আনন্দের জ্যোতি নাচিয়া উঠিল। তার পর আর একটু জল পান করিয়া গদাই—বাঙ্গালার চিরদুঃখী গদাই নীরবে মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিল। কুড়ুনী কাঁদিল না; সে দুই হাতে বুক চাপিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডন সাহেব তখন সুন্দরপুরের সুসজ্জিত বাঙলায় বসিয়া পিয়ানোর সহিত মিসেস্ ডনের মিহিসুরের মধ্যে কিন্নরী-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনিতেছিলেন।

(৫)

গদাইয়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তাহার মাতা খাইতে না পাইয়া উদ্বন্ধনে নিদারুণ জঠরানল ও শোকানলের তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। কুড়ুনীর মাতাও নানা রোগে ভুগিয়া চিকিৎসাভাবে পথ্যাভাবে ইহলোক হইতে বিদায় লইল। মাতার মৃত্যুর পর কুড়ুনী যে কোথায় গেল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। কেবল রেয়াজউদ্দীন মিস্ত্রী একবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙালা মেরামত করিতে গিয়া দেখিয়াছিল, বাঙলার ভিতর একজন আয়া সাহেবের বন্দুকটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। রেয়াজ-উদ্দীনের বোধ হইয়াছিল, সে আয়া যেন কতকটা কুড়ুনীরই মত। কিন্তু সে বয়সের দোষে তাহা চিনিতে পারে নাই।

এক বৎসর পরে কুড়ুনী আবার দেশে ফিরিয়া আসিল।

কুড়ুনী এখন আর সে কুড়ুনী নাই। সে এখন আর গোবর কুড়ায় না, হাটে যায় না, শাক তুলে না। ইচ্ছামত কোন দিন খায়, কোন দিন বা খায় না। এখন কুড়ুনী একা। সে কখন্ কোথায় যায়, কোথায় থাকে, তাহার কিছুই স্থির নাই। লোকে বলে, কুড়ুনী পাগল হইয়াছে, কিন্তু তাহার পাগলের লক্ষণ কিছুই ছিল না। সে হাসিত না, কাঁদিত না, কাহারও নিকট যাইত না, কাহাকেও কোন কথা বলিত না। সে একা বসিয়া নীরবে সংসারের উদাস দিনগুলি একে একে গণিয়া যাইত। দিন যাইত, রাত্রি আসিত; আবার প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা হইত। গোধূলির রক্তিম রাগ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত, উদাস বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে তাহার ভগ্ন কুটীরপ্রাঙ্গণে বহিয়া যাইত, কৃষকগণ মাঠ হইতে গৃহ ফিরিত, কুড়ুনী নীরবে বসিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিত। তখনও যেন তাহার কানে একটা আকুল কণ্ঠের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আসিয়া বাজিত,—"তোমায় কর্‌বো রাজা তরুর তলে।"

( ৩ )

আবার তেমনই জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ। আবার তেমনই কাননের শ্যামশীর্ষে রক্তিম সূর্য্যের সোনালি কিরণ নৃত্য করিতেছে; তেমনই বনফুলের গন্ধ মাখিয়া উদাস বায়ু প্রান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; তেমনই কদম্ব-বৃক্ষের উচ্চশাখায় বসিয়া 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' শব্দে একটা পাখী দিগন্ত কম্পিত করিতেছে; তেমনই ডন্ সাহেব চাপরাসী সঙ্গে শীকারে বাহির হইয়াছেন।

অপরাহ্ণ সমাগত দেখিয়া সাহেব প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় বনের ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"সাহেব, একটা বাঘ, একটা বাঘ।"

বাঘের নাম শুনিয়া সাহেবের হৃদয় বীরমদে নাচিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোঠায় বাঘ, কোন্ ডিকে?"

"এই দিকে" বলিয়া স্ত্রীলোক ছুটিল; সাহেবও গুলীভরা বন্দুকহস্তে তাহার পশ্চাৎ ছুটিলেন। চাপরাসী বাঘের নাম শুনিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনার দীর্ঘশ্মশ্রুগুম্ফশোভিত পাগড়িমণ্ডিত মস্তকটিকে ব্যাঘ্রকবলগত সম্ভাবনা করিয়া জীবনে এই প্রথম আল্লাকে স্মরণ করিতে লাগিল। শেষে সেখানে একা দাঁড়াইয়া থাকাও তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। কারণ, সাহেবের তাড়া খাইয়া বাঘটা যদি এই দিকে ছুটিয়া আসে? সে তখন ভয়ে ভয়ে সতর্ক-পদক্ষেপে যে দিকে সাহেব গিয়াছেন, সেই দিকে চলিল; এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, এবার সে দেশে গিয়া পদ্মায় নৌকার দাঁড় টানিয়া খাইবে, তথাপি আর কখনও সাহেবের সঙ্গে শীকারে আসিবে না।

এ দিকে কিছু দূর গিয়া স্ত্রীলোকটা থমকিয়া দাঁড়াইল, সাহেবও দাঁড়াইলেন; এবং এই স্থানে কোথাও বাঘ আছে বুঝিয়া চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহসা স্ত্রীলোকটা উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তিনি আত্মরক্ষা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লইয়া চারি পাঁচ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব এই নেটিভ রমণীর সাহস ও বিক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং স্তম্ভিতভাবে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। রমণী তখন বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা সাহেবের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া কর্কশ-স্বরে ডাকিল,—"সাহেব!"

সাহেব বুঝিলেন, রমণী উন্মাদিনী। বলিলেন,—"কে টুমি? কি চাও?"

রমণী গম্ভীর-স্বরে বলিল,—আমি কুড়ুনী, চাই তোমার জান্।"

সাহেব বলিলেন,—"হামার জান্ কেন, হামি টোমার কি করিয়াছে?"

রমণী—কুড়ুনী বলিল,—"কি করেছ, মনে নাই সাহেব? আর বৎসর ঠিক এমনই দিনে এমনই সময়ে—"

সা। এমন ডিনে এমন সময়ে কি হইয়াছিল?

কু। একটা গরীব লোককে বিনা দোষে এই বন্দুকের গুলীতে খুন করেছিলে?

সা। খুন? টা হইতে পারে। কিণ্টু সে নিমিট্ট টুমি এখন কি চাও?

কু। আমি চাই তার শোধ—আমি চাই তোমার জান।

সা। জান্! টুমি আমাকে খুন করিবে? একটা নেটিভ্ কুলী আডমীকে হট্যা করিয়াছে, সে নিমিট্ট টুমি হামাকে হট্যা করিটে সাহস পাইটেছ?

কু। কেন সাহেব, নেটিভ্ কি মানুষ নয়?

সা। মানুষ—হইলেও নেটিভ্, কালা আড্‌মী। টাহার এবং হামার জীবনের মূল্য টুল্য হইতে পারে না।

কু। তোমার অত কথা আমি বুঝি না সাহেব, আমি বুঝি, জানের বদলে জান।

সাহেব একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কিণ্ট্, হামাকে হট্যা করিলে তোমার কি দুর্গতি হইবে জান? তোমাকে ফাঁসী যাইটে—"

কুড়ুনী হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি সাহেবের কর্ণে বজ্রবৎ ধ্বনিত হইল। সাহেব দেখিলেন, রমণী সত্য সত্যই বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহেব অগ্রসর হইয়া রমণীর হাত হইতে বন্দুটা কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। কুড়ুনী বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলিল,—"সাবধান সাহেব, নড়িলেই গুলী করিব। এই সময় তোমার দেবতাকে ডাক।"

সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইলেন; একটু কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"টুমি আমাকে হট্যা করিও না, হামি টোমাকে খুব বকৃশিষ করিবে।"

কুড়ুনী আবার হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে সাহেব যেন মৃত্যুর বিকট অট্টহাস্য শুনিতে পাইলেন। তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"চাপরাসি, চাপরাসি!"

নিস্তব্ধ কানন বাধিত করিয়া একটা বিকট প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—ই—ই—ই।

প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ, কানন, প্রান্তর কম্পিত করিয়া বন্দুক গর্জ্জিল, 'গুড়ুম'; শব্দের সহিত একটা জলন্ত গুলী আসিয়া সাহেবের ললাটে বিদ্ধ হইল। ছিন্নমূল পাদপবৎ সাহেব কাননতলে লুটাইয়া পড়িলেন। অন্তিম নিশ্বাসের সহিত একবার তাঁহার মুখ হইতে শেষ উচ্চারিত হইল,—"Oh God!" পরমুহূর্ত্তেই সাহেবের চিরগর্ব্বিত আত্মা মহাবিচারকের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য কোন অজ্ঞাত অনন্তধামে প্রস্থান করিল। বন্দুকের শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাপরাসী আসিয়া দেখিল, সাহেবের প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত, তাঁহার বুকের উপর বন্দুকটা পড়িয়া রহিয়াছে।

ইহার পর আর কেহ কখনও কুড়ুনীকে দেখিতে পায় নাই।

# ঠাকুরের অদৃষ্ট

( ১ )

মহেশ ঠাকুরের অদৃষ্টটা যে বড় ভাল ছিল না, ইহা গ্রামের সকলেই জানিত; ঠাকুর নিজেও যে তাহা জানিতেন না, এরূপ নহে। আর জানিতেন বলিয়াই তিনি এই স্বভাব-কুটিল নিয়তিচক্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অবাধ গতি প্রতিরোধ করা অসম্ভব-বোধে সেরূপ চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। সুতরাং বাধাবিহীন নদী-স্রোতের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বি-বিরহিত অদৃষ্টচক্রটা অপ্রতিহতবেগে এই নিরীহ ব্রাহ্মণের অগ্রে অগ্রে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতে-ছিল; আর ঠাকুর অন্ধ পথিকের ন্যায় নির্ব্বিকার-চিত্তে তাহার অনুসরণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে সংসারের দুই একটা ধাক্কা আসিয়া তাঁহাকে পথচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইতেছিল বটে, কিন্তু ঠাকুর স্বভাব-সিদ্ধ ধৈর্য্যগুণে তাহাদিগকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে নিয়তি-চক্র-রেখাঙ্কিত পথে সমানভাবে চলিতেছিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তিনি জীবনের ত্রিশটি বৎসর অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিয়া দিলেন।

ঠাকুরের এরূপ চলিবার পক্ষে যে বিশেষ কোন বাধা-বিঘ্ন ছিল, তাহা নহে। ক্ষুদ্র কুলবেড়ে গ্রাম-খানির উপর একটা আন্তরিক টান, আর সেই গ্রামে ছয় বিঘা পাঁচ কাঠা সাড়ে তিন ছটাক পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর জমী, বাস্তুভিটার উপর দুইখানি ছোট ছোট খড়ো ঘর, ঘরের পশ্চাতে পুরাতন বড় একটা তেঁতুল গাছ, এইগুলি ব্যতীত তাঁহার আর কোন সাংসারিক বন্ধন ছিল না। তবে তিনি ইচ্ছাতেই হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক, সংসারের আরও কতকগুলা বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই বন্ধনগুলার প্রভাবেই ঠাকুর জীবনের অলস দিনগুলাকে এক প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া আসিতেছিলেন।

পতি-পুত্র-বিহীনা বৃদ্ধা, কামারখুড়ীকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও না দেখিয়া আসিলে ঠাকুরের চলে না। সদয় পাল বড় গরীব, সব দিন আহার জোটে না, তাহার খোঁজ তো লইতেই হইবে। শুবরাহগুলে তাহার উপস্থিতি তো চাইই। রাম চক্রবর্ত্তীর ছেলের কঠিন পীড়া; রাত্রিকালে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কে একক্রোশ দূরে ডাক্তার ডাকিতে যাইবে? ছেলেটি বেঘোরে মারা যায়; কাজেই ঠাকুরকে ভিজিতে ভিজিতে অন্ধকার রাত্রিতে মেঠো-পথ ভাঙ্গিয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিতে হইল। ঘোষাল-দের বাড়ীতে দুর্গোৎসব, অনেক লোক খাইবে, কিন্তু ভাত রাঁধিবার লোকাভাব; অগত্যা ঠাকুর মাথায় গামছা জড়াইয়া রৌদ্র ও অগ্নির সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সমস্ত গ্রামখানার মধ্যে যে অংশে যে কাজে লোকাভাব, অনাহূত হইয়াও ঠাকুর সেখানে গিয়া সে অভাব পূরণ করিতেন। শেষে এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, ঠাকুর না থাকিলে সেই কুলবেড়ে গ্রামখানার যেন একদিনও চলিত না, আর সেই গ্রাম-খানা না থাকিলে ঠাকুরেরও যেন একটা দিনও কাটিত না।

ঠাকুরের এখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি শ্রোত্রিয়; পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। চেষ্টা করিলে যে এতদিন টাকার জোগাড় না হইত, এমন নহে, কিন্তু ঠাকুর কোন দিন সে চেষ্টা করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন। বোধ হয়, নিজের উপর বা সংসারের উপর ঔদাসীন্যই ইহার কারণ।

( ২ )

সুখেই বল আর দুঃখেই বল, দিনগুলা যদি চির-কাল একই ভাবে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয়, সংসার-যন্ত্রটা এতদিন অচল হইয়া পড়িত। চির-কাল যেমন একটা সুর ভাল লাগে না, সংসারটাও তেমনই চিরদিন একই ভাবে একই রকমে ভাল লাগিতে পারে না, মাঝে মাঝে তাহার গতির পরি-বর্ত্তন চাই। এই পরিবর্ত্তনের জন্যই তাহাতে এত বৈচিত্র্য, এত মমতা, এত আশা, এত ভরসা। ঠাকুরের অদৃষ্টচক্রটাও এই নিয়মের বশে এতদিনের অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আর একটা নূতন পথে চলিল! সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মধ্যে তাঁহার এক শত্রুর আবির্ভাব হইল।

মনে করিও না, যে কখন কাহারও অনিষ্ট করে নাই, সংসারে তাহার শত্রু থাকিতে পারে না। ইহা একটা মস্ত ভুল। ঘটনাচক্র এমনই কুটিল যে, কখন্ তাহার কোন্ একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রাবলম্বনে আর

একটি প্রতিকূল ঘটনায় উদ্ভব হয়, তুমি তাহার কিছুই টের পাইবে না। অথচ এক সময় হয় তো দেখিবে, সেই অজ্ঞাত অচিন্তিত ঘটনা-সূত্র ধরিয়া একটা বিপদের করাল মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, মহেশ ঠাকুর জীবনে কাহারও কোনও অপকার করেন নাই, বরং প্রাণপণে উপকারই করিয়াছেন, তবে সহসা বৃদ্ধ মদন ঘোষাল তাঁহার প্রবল শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইলেন কেন? তোমরা হয় তো বলিবে, ঘোষাল মহাশয় এই পঞ্চাশ বর্ষ বয়সে তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী লইয়া নূতন সংসার পাতিয়াছেন, মহেশ ঠাকুরেরও তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত আছে; বোধ হয়, এইখানেই কোনও একটা গলদ আছে। কিন্তু আমরা জানি, এরূপ পাপবাসনা কোন দিনই ঠাকুরের হৃদয়ে ছায়াপাতও করিতে পারে নাই। তবে কেন এমন হইল? উত্তর—ঐ কুটিল ঘটনাচক্র! অতএব আইস, আমরা এই ঘটনাচক্রকে নমস্কার করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টের গতিটা পর্য্যবেক্ষণ করি।

ঘোষাল মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের পত্নী অন্নদাসুন্দরীর যৌবনও যেমন, রূপও তেমনই। তবে আক্ষেপের বিষয়, তাঁহার এই যৌবন—এমন রূপ এক পক্বকেশ স্খলিতদন্ত বৃদ্ধের হস্তে পড়িয়া মাটী হইতে বসিয়াছে। সংসারে রত্নের আদর নাই। থাকিলে এমনটা হইবে কেন? আর ঐ একজন অবিবাহিত যুবা—ঐ যে হতভাগা মহেশ ঠাকুর, ফুলশরের আয়াস-সহকারে নিক্ষিপ্ত এক অস্ত্র নির্ব্বিকারভাবে সহ্য করিয়া একটুও টলিবে না কেন? যদি সে এ রণে পৃষ্ঠভঙ্গও দিত, তাহা হইলেও কথা ছিল। কিন্তু সে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষত-হৃদয়ে দাঁড়াইয়া তাহার এত কৌশল, এত আয়াসকে ব্যর্থ করিবে, ইহা অসহ্য। সুতরাং অন্নদার সমস্ত রাগটা নিরীহ মহেশ ঠাকুরের উপর পড়িল। অন্নদা যখন তাঁহার উপর রাগিল, তখন ঘোষাল মহাশয় আর না রাগিয়া থাকিতে পারিলেন না, আর তাঁহার সঙ্গে সমস্ত সমাজটাই ঠাকুরের উপর খড়্গহস্ত হইল। কারণ, ঘোষাল মহাশয়ই সমাজের মাথা। তখন এক অন্নদার পাপবাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া ঠাকুর একে একে উপেক্ষিতা অন্নদার, ঘোষাল মহাশয়ের এবং সমাজের বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িলেন। ঘটনাচক্রের গতিই এইরূপ।

ঠাকুর কিন্তু প্রথম প্রথম এত কথা বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম কেন, শেষেও পারেন নাই। না পারিলেও ইহার সম্পূর্ণ ফলটা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

(৩)

সে বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই চারিদিকে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইয়াছিল। সে কালব্যাধি একবার যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল, সে বাড়ী শূন্য হইয়া পড়িতেছিল; গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছিল। ক্রমে এই ভীষণ ব্যাধি কুলবেড়ে গ্রামে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশের সঙ্গেই গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। শবদেহে মাঠ-ঘাট ভরিল। এই রোগের প্রবল আক্রমণে রামনাথ চক্রবর্ত্তী দুই পুত্র, পত্নী ও জামাতাসহ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। বাড়ীতে রহিল কেবল তাঁহার শোকজীর্ণা বৃদ্ধা মাতা এবং সদ্যোবিধবা যোড়শবর্ষীয়া কন্যা শ্যামা। তাহাদিগকে দেখিবার মধ্যে থাকিলেন, উপরে ভগবান্, আর দুনিয়ায় মহেশ ঠাকুর।

বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ঠাকুর সংসারের নিকট যতগুলা আঘাত পাইয়া আসিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই আঘাতটাই তাঁহার নিকট গুরুতর বলিয়া বোধ হইল। পরদুঃখ-কাতর হৃদয় পরের কষ্ট দেখিলেই ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্যামার বৈধব্য-যন্ত্রণাটা তাঁহাকে তদপেক্ষা একটু অধিক ব্যথিত করিল। ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে, তাঁহাদের উভয়ের অতীত জীবনে বাল্যক্রীড়ার সহিত বুঝি একটা প্রণয়াত্মক ভালবাসার উদ্ভব হইয়াছিল—শ্যামার না হইলেও অন্ততঃ ঠাকুরের হইয়াছিল। এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, ঠাকুর যখন প্রায় যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন শ্যামার জন্ম হইয়াছে; সুতরাং এখানে প্রণয়সঞ্চারের প্রধান হেতু বাল্যক্রীড়াটির সম্পূর্ণ অভাব।

তবে ঠাকুর যে শ্যামাকে ভালবাসিতেন, ইহা নিশ্চয়। সংসারে আসিয়া কবে যে তিনি পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া পিতার পিতৃব্য-পত্নীর হাতে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনেই নাই। তার পর সেই স্নেহশালিনী অথচ অপ্রিয়ভাষিণী প্রতিপালিকাও যে কালস্রোতে কবে কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল, তাহাও বেশ স্মরণ হয় না। সুতরাং ঠাকুরের জীবনটা বড় নীরবে নির্জ্জনেই কাটিতেছিল। কিন্তু প্রতিবাসী রাম খুড়ার মেয়ে শ্যামা যখন হইতে চলিতে শিখিল, তখন হইতেই সে নিয়ত আসিয়া তাঁহার সেই চিরনীরবতা ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার শুষ্ক অবসন্ন জীবনটাকে সজীব করিয়া তুলিতে লাগিল। সেই ক্ষুদ্র বালিকার আদর ও অভিমানে, আবদার ও তিরস্কারে ঠাকুর যেন জীবনে সেই প্রথম সুখের আস্বাদ—সংসারের মাধুর্য্য অনুভব

করিলেন। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র বালিকা বড় হইল; এক দুই করিয়া একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কিন্তু তখনও সে তাহার মহেশদা'র সঙ্গ ছাড়িল না। তাই তাহার ঠাকুরমা পরিহাস করিয়া বলিতেন, "তোর দাদাই বুঝি শেষে তোর বর হবে।" এই পরিহাসটায় ঠাকুরের মনে একটা নূতন ভাব জাগিয়া উঠিত। কিন্তু যে দিন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্যামার পিতা কুলীন, তিনি শ্রোত্রিয়, সুতরাং শ্যামার সহিত তাঁহার বিবাহ অসম্ভব, সেই দিনই তিনি এ আশার মূলচ্ছেদন করিলেন, ইহার দাগটুকু পর্য্যন্ত আর তাঁহার হৃদয়ে রহিল না।

তার পর শ্যামার বিবাহ হইয়া গেল। রাম খুড়া কুলীন জামাতাকে আপনার গৃহে আনিয়া রাখিলেন। শ্যামা তাহার সহিত সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। ঠাকুরও আপনার অদৃষ্টের পথে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিন শ্যামা পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়া, কেবল বৃদ্ধা ঠাকুরমার হাত ধরিয়া অসহায় অবস্থায় সংসার-পথে দাঁড়াইল, সেই দিন হইতে ঠাকুর আবার তাহার ভার গ্রহণ করিলেন, সম্ভাবিত সহস্র বিপদের সহস্র কষ্টের মুখ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু আমি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া একটি ভাল কাজ করিতে গেলে সকলেই যে তাহাকে ভাল বলিবে, কেহই যে তাহার ভিতর একটুকু ছিদ্র—এতটুকু দুরভিসন্ধি দেখিতে পাইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং ঠাকুরেরও এই সহানুভূতিমূলক কাজটার মধ্যে কেহ কেহ একটি ছিদ্র—একটি অসদুদ্দেশ্য দেখিতে পাইল। যাহারা দেখিল, তাহাদের মধ্যে ঘোষাল মহাশয়ই প্রথম ও প্রধান দ্রষ্টা এবং তাঁহার পত্নী অন্নদাসুন্দরীই ইহার নিরপেক্ষ সমালোচিকা। এই দর্শন ও সমালোচনার ফলে গ্রামের মধ্যে শীঘ্রই শ্যামার নামের সহিত বিজড়িত ঠাকুরের একটি কল্পিত অসদভিসন্ধি ও অপবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যদু দাঁর মুদীখানার দোকান, বড়পুকুরের ঘাট এবং চৌধুরীদের বৈঠকখানার পাশার আড্ডা হইতে ইহার একটি তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। পাঁচ সাত দিন আন্দোলন চলিল। তার পর একদিন প্রকাণ্ড সভায় ঘোষাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহেশ ঠাকুর সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার সহিত আহার-ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল, ধোপা-নাপিত বন্ধ হইল, এবং যদিও তিনি তাম্রকূটভক্ত ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে হুঁকা প্রদানের নিষেধাজ্ঞাও প্রচারিত হইল। তার পর গ্রামখানা আবার শান্ত হইয়া পড়িল। কেবল মেয়েমহলে একটু আধটু আন্দোলন চলিতে লাগিল। দুই একটা রমণীসভায় অন্নদাসুন্দরী, 'পোড়ারমুখী' শ্যামাকে শত ধিকার প্রদান করিয়া পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের মাহাত্ম্যসূচক দুই চারিটি বক্তৃতাও দিলেন।

(৪)

লোকে বলে, 'স্বভাব যায় না ম'লে।' তাই এত নির্য্যাতনের পরও ঠাকুর আপনার দুষ্ট স্বভাবটিকে ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি সকল নির্য্যাতন—সকল অপবাদকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তবে একটা বিষয়ে ঠাকুর একটু আঘাত পাইলেন। এখন আর কেহ তাঁহাকে বিপদে-সম্পদে ডাকে না। তিনি অযাচিত হইয়া সাহায্য করিতে গেলেও কেহ তাহা গ্রহণ করে না। এ আঘাতটি তাঁহার পক্ষে বড় কম নহে। কিন্তু ইহাও তিনি সহ্য করিলেন।

ঠাকুর সহ্য করিলেও শ্যামার কিন্তু এতটা সহিল না। তাহাকে সাহায্য করিয়া একজন নিরীহ নির্দ্দোষী যে সমাজের এমন গুরুতর শাসনটা ভোগ করিবে, ইহা বড়ই কষ্টকর। ইহার তো একটা উপায় করা চাই। তাই একদিন শ্যামা ঠাকুরকে বলিল,—"এ দেশ ছাড়িয়া গেলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন,—"না।"

শ্যামা। কেন?

ঠা। তাহাতে দুর্নাম আরও বাড়িবে। এখনও ইহাতে যাহাদের সন্দেহ আছে, তাহারাও বিশ্বাস করিবে।

শ্যা। করে করুক, আমরা অনেক দূরদেশে চলিয়া যাইব।

ঠা। যেখানেই যাও, এই মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা সঙ্গে যাইবে।

শ্যা। তবে উপায়?

ঠা। উপায় ভগবান্।

শ্যামা একটু ভাবিয়া বলিল,—"এক কাজ করিলে হয় না?"

ঠা। কি?

শ্যা। তুমি আর এখানে আসিও না।

ঠা। তোমাদিগকে কে দেখিবে?

শ্যা। ভগবান্।

ঠা। না শ্যামা, এ বিষয়টি আমি কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিব না। যদি পারিতাম, তাহা হইলে কখনই তোমাকে এই মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিনী হইতে দিতাম না। তুমি জান না, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার কি বিপদ্ হইতে পারে।

শ্যামা সে বিপদের কথা বুঝিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার কি মরণ হয় না ?"

ঠাকুর বলিলেন,—"মরণ একদিন হইবেই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মরণাধিক বিপদ্ ঘটিতে কতক্ষণ!"

শ্যামা শিহরিয়া উঠিল। ঠাকুর বলিলেন,—"চিন্তা কি শ্যামা,—মানুষের বিচারে কি হয় ? ভগবানের নিকট বিচারের জন্ত প্রস্তুত থাকিলেই নিশ্চিন্ত!"

কিন্তু শ্যামা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একে শোকের তীব্র তাড়না, তাহার উপর লোকের তীব্র গঞ্জনা, শ্লেষোক্তি, সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের একমাত্র বন্ধু মহেশদা'র নির্য্যাতন; এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার উপর নবব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে আহারাদি বিষয়েও অনেক অত্যাচার চলিতে লাগিল। প্রথমে দেহ দুর্ব্বল, তার পর একটু একটু জ্বর হইল, শেষে অত্যাচারে সেই জ্বর ভীষণভাব ধারণ করিল; শ্যামা শয্যাশায়িনী হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,—"এ অভাগীর কি মরণ নাই ঠাকুর!"

ঠাকুর দেশে কবিরাজের নিকট ঔষধ পাইলেন না, বিদেশ হইতে ঔষধ আনিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে শয়নের জন্ত যাহার প্রাণ ব্যাকুল, সে কি ঔষধ খায় ? সুতরাং কবিরাজের বটিকাগুলি শয্যার নীচেই পড়িয়া রহিল, শ্যামার উদরস্থ হইল না। শেষে একদিন নিদাঘের স্তব্ধ সন্ধ্যায় শ্যামা মৃত্যুর স্নিগ্ধ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সংসারের সকল যন্ত্রণা—সকল অপবাদ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিল।

( ৫ )

ধিকি ধিকি চিতা জ্বলিতেছে। উষার প্রথম রশ্মি আসিয়া তাহা স্পর্শ করিতেছে। ঠাকুরের অবশিষ্ট সংসার-বন্ধন—অদৃষ্টের শেষ সূত্রটাও বুঝি তাহার সঙ্গে পুড়িতেছে। শেষ থাকিতেছে, একটি নীল ধূমরেখা,—তাহাও শেষে অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া যাইতেছে। তাহার পর—শেষ আর নাই।

কুলবেড়ে গ্রামে বনের পাখীরা যখন প্রথম প্রভাতী সঙ্গীত গাহিল, গৃহস্থেরা যখন "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া শয্যাত্যাগ করিল, তখন চিতা নির্ব্বাপিত হইয়াছে; শ্যামার শেষ চিহ্ন পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আর মহেশ ঠাকুর—গ্রামের লোকেরা খুঁজিল—ঠাকুর কোথায় ? ঠাকুর কোথায় ? ঠাকুর নাই। গ্রামখানা যেন একবার রুদ্ধ করুণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"ঠাকুর! ঠাকুর!" কিন্তু ঠাকুর কোথায় ?—

ঠাকুর তখন অদৃষ্টের শেষ সূত্রটুকু ছিন্ন করিয়া অনন্ত শান্তি, অনন্ত তৃপ্তি লইয়া অনন্তের পথে ছুটিয়াছে। পশ্চাতে পড়িয়া সংসার ডাকিতেছে, "ঠাকুর! ঠাকুর!"

# গঙ্গাস্নান

( ১ )

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

অপরাহ্ণকালে শিরোমণি মহাশয় চতুষ্পাঠীর মধ্যে বসিয়া নস্যগর্ভ শম্বুকটির গাত্রে টোকা দিতে দিতে জনৈক ছাত্রকে উক্ত গঙ্গামাহাত্ম্যসূচক শ্লোকটির অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিলেন, আর এক পার্শ্বে ভিন্নাসনে বসিয়া বৃদ্ধ হলধর ঘোষ মুদিত-নয়নে হরিনামের মালাটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একমনে শিরোমণি মহাশয়ের মুখনিঃসৃত ব্যাখ্যাবলী শ্রবণ করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাখ্যা শেষ হইলে হলধর চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"দাদা ঠাকুর! সত্যি কি তাই হয়?"

শিরোমণি মহাশয় একটিপ নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে।"

হলধর আর কিছু বলিল না। সে কেবল মনে মনে বার বার আবৃত্তি করিয়া শ্লোকটি মুখস্থ করিতে লাগিল। আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার কালিমাচ্ছন্ন মুখটা যেন এক একবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। তার পর সন্ধ্যা হইলে শিরোমণি মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন; হলধর তাঁহাকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে আপনার গৃহাভিমুখে চলিল।

তা' হলধর যে চিরদিনই এইরূপ বৃদ্ধ ছিল এবং হরিনামের মালা-হাতে শিরোমণি মহাশয়ের টোলে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য একপার্শ্বে বসিয়া থাকিত, তাহা নহে। একদিন—সে অতি অল্পদিনের কথা—তাহার ভয়ে সনাতনপুর গ্রামখানা তটস্থ ছিল। সে তখন নিতাইগঞ্জের জমীদার চৌধুরী বাবুদের বাটীতে নায়েবী করিত। তখন তাহার উন্মদ যৌবন ছিল, দেহে অসুরের ন্যায় শক্তি ছিল, মস্তিষ্ক কূটবুদ্ধির আকর ছিল; আর তাহার নামের সহিত একটা সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর প্রতাপ বিজড়িত ছিল। সকলেই সভয়ে সম্মানের সহিত তাহার নাম উচ্চারণ করিত। কিন্তু চিরধ্বংসশীল কালের প্রচণ্ড আঘাতে এখন তাহার সব গিয়াছে; সে যৌবন গিয়াছে, সে শক্তি গিয়াছে, সে সাহস ও বুদ্ধি গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতাপ ও সম্মান অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন আছে কেবল অনন্তকাল-ব্যাপিনী চিন্তা; অতীত স্মৃতিবিজড়িত একটা তীব্র অনুতাপ, কালের একটা মর্ম্মভেদী কঠোর উপহাস। আশার সমুন্নত সুখ-সৌধ বিচূর্ণ হইয়াছে, তথায় আছে কেবল দীর্ঘশ্বাস-বিজড়িত ভগ্নস্তূপ; জীবনের অবলম্বন সে উৎসাহ-বিহঙ্গম উড়িয়া গিয়াছে, আছে শুধু হতাশপূর্ণ শূন্য পিঞ্জর। কিন্তু কিসে কি হইল, সেই কথাটাই আগে বলিব।

( ২ )

সনাতনপুরে হলধর ঘোষের ন্যায় বড় লোক আর ছিল না। সে যখন নায়েবী পদ পাইয়া প্রথম চৌধুরী বাবুদের বাটীতে প্রবেশ করে, তখন তাহার একটি ভগ্নপ্রায় ক্ষুদ্র একতালা বাটী এবং কয়েক বিঘা জমী ব্যতীত আর কিছু ছিল না। কিন্তু নায়েব হইবার অল্পদিন পরেই তাহার সেই ক্ষুদ্র গৃহ অট্টালিকায় পরিণত হইল, চারিদিক্ হইতে আত্মীয়-স্বজনগণ আসিয়া সে অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিল; দোল-দুর্গোৎসব-ক্রিয়া চলিতে লাগিল। একটি শিব-মন্দির এবং বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হইল, দানধ্যানের অবধি রহিল না; দেশ-বিদেশ হইতে দায়গ্রস্ত কত লোক আসিয়া তাহার দ্বারস্থ হইতে লাগিল।

সকলেই সবিস্ময়ে হলধর ঘোষের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। জমীদার মহাশয়েরাও ইহা দেখিলেন—বুঝিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না। কারণ, হলধরের দ্বারা তাঁহারা তখন আশাতীত উপকার পাইতেছিলেন। পূর্ব্বে যে মহালে একটি পয়সাও খাজনা আদায় হইত না, এখন সুকৌশলী হলধর সেখানে গিয়া কড়ায় গণ্ডায় খাজনা আদায় করিতেছে। যেখানে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমীদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, সুচতুর হলধর সেখানে গিয়া আপনার অপ্রতিহত প্রতাপে প্রজাদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিতেছে। ঘর জ্বালাইয়া, গৃহলুণ্ঠন করিয়া, কূট মোকদ্দমা চালাইয়া, অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া বিদ্রোহী প্রজাবর্গকে হলধর শাসন করিত। তাহার ভয়ে আর কেহ জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না। জমীদার দেখিলেন, হলধরের গুণে জমীদারীর আয় ক্রমেই বাড়িতেছে, পতিত-মহাল উদ্ধার পাইতেছে। এ অবস্থায় তাহাকে কিছু বলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ প্রভুর আয় দেখাইয়া মাঝে হইতে সে যদি কিছু আত্ম

করিতে পারে, তাহাতে এমন ক্ষতিই বা কি? সুতরাং হলধরের উন্নতিস্রোতটা কিছু দ্রুতগতিতে চলিল।

একমাত্র নায়েবীই হলধরের উন্নতির মূল, ইহা সকলে জানিলেও, আমরা কিন্তু জানি, ইহা ছাড়া তাহার আর একটা লাভজনক কারবার ছিল। তখন দেশে ডাকাতির বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। সে প্রদেশে যেখানে যত ডাকাতি হইত, সে সকলের মধ্যেই হলধরের যোগ থাকিত। সে নিজে কোথাও ডাকাতি করিতে যাইত না, কিন্তু যেখানে যত ডাকাতি হইত, তাহার সমস্ত অর্থই তাহার হাতে আসিয়া পড়িত। তৎকালে অনেক বড় লোকই এই কার্য্যের সহিত সংলিপ্ত থাকিতেন এবং এই উপায়ে অনায়াসে আপনাদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া লইতেন।

এই ধনীদিগের সহায়তা না পাইলে ডাকাইতগণেরও ব্যবসায়ে সুবিধা হইত না। তাহারা ডাকাতি করিত, কিন্তু অপহৃত ধন গোপন করিবার স্থান পাইত না। তাহারা নিজে সেই সকল চোরাই মাল বিক্রয় করিতে গেলে প্রায়ই ধরা পড়িত। কিন্তু বড়লোকের সহিত যোগ থাকায় তাহারা সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্য আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিত, ধনী আপন ইচ্ছামত মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া লইতেন। ডাকাইতেরা যাহা পাইত, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইত। ইহাতে তাহাদের আরও একটা বিশেষ উপকার হইত,—সন্দেহ বশতঃ পুলিস আসিয়া তাহাদের ঘর খানাতল্লাসী করিলে চোরাই মালের সন্ধান পাইত না। অধিক পীড়নে কোনও অশিক্ষিত ডাকাইত ধনীর নাম বলিয়া ফেলিলেও পুলিস তথায় খানাতল্লাসী করিতে সাহসী হইত না বা ইচ্ছা করিয়াও তাহা করিত না। কেন করিত না, তাহা অপ্রকাশ্য। কিন্তু এই ধনীর নামও দলপতি ভিন্ন দলের আর কেহই প্রায় জানিতে পাইত না। সুতরাং ধনীরাও নিঃশঙ্কচিত্তে এই ব্যবসায় চালাইতেন। এইরূপে দস্যুতা-লব্ধ ধনে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের অনেক বংশধর এখন অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন-যাপন করিতেছেন এবং ভদ্রসমাজে আপনাদিগকে বনিয়াদি বড়লোক বলিয়া সগর্ব্বে পরিচয় দিতেছেন।

এইরূপ উপায়ে হলধর শীঘ্রই অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া উঠিল, চারিদিকে তাহার নাম জাহির হইয়া পড়িল। তা' ছাড়া আপনার অধীনস্থ এলাকার মধ্যে যেখানে যত নিঃস্ব ব্রাহ্মণের দলিলহীন ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর প্রভৃতি জমী ছিল, হলধর তৎসমস্তই আপনার সম্পত্তিভুক্ত করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে দানধ্যান, ক্রিয়া-কলাপের মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। ইহাতে তাহার সমস্ত দোষই চাপা পড়িয়া গেল, চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল। কেবল স্পষ্টভাষী গোপাল সরকার একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিল, "গরু মেরে জুতো দান।" এ জন্য সরকার মহাশয়কে হলধরের হস্তে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু এত ঐশ্বর্য্য, এত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াও হলধরের মনে প্রকৃত শান্তি ছিল না। সে যখনই নিভৃতে আপনার হৃদয় পানে চাহিত, তখনই কাঁপিয়া উঠিত, তাই সে বাহ্য সৎকর্ম্মের আবরণ দ্বারা আপনার হৃদয়ের দুষ্কৃতভার চাপিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

( ৩ )

সহস্র চেষ্টাতেও পাপ কখনও প্রচ্ছন্ন থাকে না। যদি থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্যরূপ আকার ধারণ করিত। বিশ্ব-নিয়ন্তার এমনই অলঙ্ঘনীয় স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও পাপ কিছুতেই চিরদিন গুপ্ত থাকে না। একদিন না একদিন তাহার দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া পুণ্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিভাসিত হইবেই হইবে; একদিন নিশ্চয়ই ধর্ম্মের উন্নত আসনের নিকট অধর্ম্ম স্বীয় মস্তক অবনত করিবে; সত্যের অলৌকিক বিক্রমে মিথ্যার কল্পিত আবরণ একদিন বিদূরিত হইবেই হইবে। প্রকৃতির ইহাই মহিমা, বিশ্বচক্রের ইহাই স্বাভাবিক গতি।

বহু দুষ্কর্ম্ম করিয়াও হলধর যে রাজপুরুষগণের দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিল, তাহার মূল কারণ, দেবীপুরের থানার দারোগা বাবু। তাহারই কৌশলে এবং করুণায় কেহই তাহার কিছু করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিল, পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল, হলধর তখন দারোগা বাবুর কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া উঠিল।

একবার একটা নদীগর্ভোত্থিত চড়া লইয়া নূতনবাড়ী গ্রামের জমীদার দাঁ বাবুদের সহিত চৌধুরী বাবুদের বিবাদ বাধিল। বিরোধ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকু অধিকার করিবার জন্য উভয় পক্ষই সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। জেদটা হলধরেরই কিছু বেশী। কারণ, বিপক্ষপক্ষের নায়েব মহাশয় বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ আর বড় লোকের সিন্দুকের টাকা নয় যে, এক অন্ধকার রাত্রেই হলধর ঘোষের বাক্সে আসিয়া পড়িবে। কথাটা হলধরের মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল।

ক্রমে উভয় পক্ষই স্থানটা দখল করিবার জন্য লোকজনসহ প্রস্তুত হইল। সকলেই বুঝিল, একটা ভীষণ দাঙ্গা বাধিবে। দাঙ্গার পূর্ব্বদিবস রাত্রিকালে হলধর স্বয়ং থানায় গমন করিয়া সাক্ষাৎকার্থ উপস্থিত

হইবার জন্য দারোগা বাবুর হস্তে তিন শত টাকার খুচরা নোট গুঁজিয়া দিয়া আসিল। সে বুঝিয়াছিল, বিপক্ষপক্ষের লোকবল অধিক, সুতরাং দারোগা বাবুর সহায়তা ব্যতীত এ ক্ষেত্রে জয়লাভ অসম্ভব। কিন্তু সে চলিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পরেই বিপক্ষ-দলের নায়েব মহাশয় যে সহাস্য-বদনে দারোগা বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা হলধর দেখে নাই।

পরদিন সেই চড়ার নিকট উভয় পক্ষই সমবেত হইল। তার পর লাঠি-সড়্কী চালাইয়া উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দারোগা বাবু দলবলসহ দূরে দাঁড়াইয়া এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। দাঙ্গায় বিস্তর লোক হতাহত হইবার পর শেষে বিপক্ষ-পক্ষই জয়লাভ করিল। হলধর দেখিল, শেষ পর্য্যন্ত দারোগা বাবু সেই একস্থানেই সমানভাবে দণ্ডায়মান। সে বুঝিল, দারোগা বাবু সিন্নি খাইয়া ভরা ডুবাই-লেন। তাহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। এ পরাজয়ের সমস্ত অপমানটা যেন তাহারই ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিল, তাহারই মাথাটা যেন ঐ চড়া-ভূমির বালুকার উপর বিপক্ষের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। তাহার সমস্ত রাগটা দারোগা বাবুর উপর পড়িল।

হলধর রাগের মাথায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানা-ইল যে, দারোগা বাবু পূর্ব্বে দাঙ্গার সংবাদ পাইয়াও শান্তিরক্ষায় মনোযোগী হন নাই, বরং বিপক্ষপক্ষের নিকট ঘুস খাইয়া শান্তিভঙ্গের সহায়তা করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দারোগা বাবুর কৈফিয়ত তলব করিলেন। দারোগা বাবুও পাকা লোক, তিনি ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল এই দারোগাগিরী করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছেন। কিন্তু এবারে তাঁহাকে একটু বেশী বেগ পাইতে হইল, অনেক কৌশলে তিনি এবার চাকরীটি বজায় রাখিলেন। তার পর তিনি হলধরকে শিক্ষা দিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

( ৪ )

দারোগা বাবুকে সুযোগের জন্য অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না—শীঘ্রই সুযোগ মিলিল। অল্পদিন পরেই নূতন বাড়ীর দাঁ বাবুদের বাটীতে একটা ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইয়া গেল; ডাকাতিতে দুই তিনটা খুনও হইল। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র দারোগা বাবু ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সত্বর তথাকার তদন্ত শেষ করিয়া হলধরের বাটীতে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়াই বাটী ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। হলধর বাটীতেই ছিল; সে প্রথমে অনেক আপত্তি, অনেক তর্ক করিল, কিন্তু দারোগা বাবু তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। তাহাকে নজরবন্দী করিয়া তাহার বাটী খানাতল্লাসী করা হইল।

খানাতল্লাসীতে অপহৃত সকল দ্রব্যই বাহির হইয়া পড়িল। বেগতিক দেখিয়া হলধর, দারোগা বাবুর শরণ গ্রহণ করিল; তাঁহাকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইল। কিন্তু দারোগা বাবু কিছুতেই ভুলিলেন না। তিনি মালসহ হলধরকে চালান দিলেন। ডাকাত-দলেরও অনেকে ধরা পড়িল।

যথাসময়ে দায়রার বিচারে হলধর সঙ্গিগণসহ শ্রীঘরে চলিল। তাহার পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল।

( ৫ )

পাপের পতনাবস্থা যেমন ভয়ানক, তেমনই দ্রুত-গামী। একবার পতন আরম্ভ হইলে আর রক্ষা নাই; তখন চারিদিক্ হইতে সহস্র বিপদ বিকট মুখব্যাদান করিয়া পাপীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় এবং অচিরেই সুখকাকলী-পূর্ণ পাপ-নগরী শ্মশানের হাহাকারে পূর্ণ করে; একদিনে—এক মুহূর্ত্তে আশার নন্দন-কাননে মরুভূমির ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেয়।

পাঁচ বৎসর পরে কারামুক্ত হইয়া হলধর যখন ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, তাহার পরিজনপূর্ণ অত বড় বাড়ীটা শূন্য হইয়াছে; এত দিনের এত চেষ্টায় সে সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন যে একটি সংসার গড়িয়া-ছিল, ক্ষুদ্র পাঁচটি বৎসরের মধ্যে নিয়তির নির্ম্মম আঘাতে তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; কেবল একটা তীব্র বিষাদের হাহাকার বক্ষে লইয়া বাড়ীখানা জনশূন্য শ্মশানের মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কার্য্যক্ষম পুত্রদ্বয় তাহার হৃদয়ে চিরস্থায়ী শেল বিদ্ধ করিয়া এক এক বৎসরের ব্যবধানে পরলোকযাত্রা করিয়াছে; পত্নীও শোকের অসহ্য যন্ত্রণা বুকে লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে; জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ উন্মাদিনী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনগণও স্ব স্ব আশ্রয়ানুসন্ধানে প্রস্থান করিয়াছে। দাস-দাসীগণ চলিয়া গিয়াছে, গোশালা শূন্য হইয়াছে। পূজার দালানে চামচিকা বাসা বাঁধিয়াছে, অট্টালিকার চূণসুরকী খসিয়াছে, বাড়ীর মধ্যে চারিদিকে আগাছার বন জন্মিয়াছে। কোন অভিশপ্ত প্রেতের দীর্ঘশ্বাসের মত এক একটা বায়ু-প্রবাহ আসিয়া ধূলি-ধূসরিত রুদ্ধ-দ্বার গবাক্ষে আঘাত করিতেছে। এখন সেই জনশূন্য বৃহৎ বাটীর মধ্যে কেবল বিধবা কনিষ্ঠ

পুত্রবধূ ক্ষীণ সন্ধ্যা-দীপ জ্বালাইবার জন্য একা একপার্শ্বে পড়িয়া আছে।

স্তম্ভিত হৃদয়ে হলধর এই ভীষণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। অবশেষে সে বুঝিল, ইহা তাহারই সযত্নরোপিত বিষবৃক্ষের প্রথম ফল।

( ৬ )

শত শত উপদেশে, সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তে যে ফল না হয়, কালের একটিমাত্র আঘাতে তদপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। যুগব্যাপী প্রাণান্ত চেষ্টায় যে হৃদয় দমিত হয় না, কালের একটি আবর্ত্তনে এক মুহূর্ত্তে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই আঘাতের ফলেই দস্যু রত্নাকর, লম্পট বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি একদিনে মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। কালের এই কঠোর আঘাত সময় বা অবস্থাবিশেষে বড়ই হিতকর।

হলধরও কালের এই নির্ম্মম আঘাতে বড়ই শুভ ফল পাইল। সে, দুরাশার যে প্রবল পিপাসা হৃদয়ে জাগাইয়া এতদিন অনায়াসে সমস্ত দুষ্কার্য্য-সাধন করিয়া আসিতেছিল, পত্নী-পুত্রের মৃত্যুর সহিত তাহার সে সর্ব্বনাশিনী তৃষ্ণার অবসান হইল। তৃষ্ণানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পরলোকের ভীষণ চিত্র, দুর্দ্দৃশ্য আলেখ্য তাহার সম্মুখে নাচিয়া উঠিল; একদিন তাহাকেও যে পত্নী-পুত্রের ন্যায় এই মহাপথের পথিক হইয়া মহাবিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল; সেই মহাবিচারের দিন স্মরণ করিতেও সে ভীত হইল। তখন দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা আসিল, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল, হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; সে বহ্নির দহনে হলধর অস্থির হইয়া পড়িল।

হলধর এখন আর কাহারও সহিত কথা কহে না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া উঠে; অতীতের কঠোর স্মৃতি আসিয়া হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। সে আঘাতে কাতর হইয়া হলধর ভাবে, হায়, জীবন দিলেও কি অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না? এখন সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই হলধর তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান জিজ্ঞাসা করে।

একদিন জনৈক বৃদ্ধ বাবাজী তাহাকে বলিলেন, —"হরিনাম কর, হরিনামে সকল পাপ দূর হয়।" সেই দিন হইতে হলধর হরিনাম করিতে লাগিল। সে পূর্ব্বেও হরিনাম করিত; কিন্তু সেই হরিনামে আর এই হরিনামে কত প্রভেদ! সে হরিনাম ভক্তি-শূন্য—প্রাণহীন, কেবল দুষ্কর্ম্মের আবরণস্বরূপ ছিল, কিন্তু এখনকার ভক্তিপূর্ণ প্রাণঢালা এই হরিনাম কত মধুর! হলধর বুঝিল, দুঃখে না পড়িলে বুঝি প্রাণ দিয়া হরিনাম করা যায় না; আর প্রাণ ঢালিয়া হরিনাম না করিলে মধুরতা অনুভূত হয় না। হলধর হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি ঢালিয়া হরিনাম করিতে লাগিল।

স্রোতের যখন যে দিকে গতি, সেই দিকেই তাহার অধিক আকর্ষণ। হলধরের প্রবৃত্তি যখন পাপের পথে ধাবিত হইয়াছিল, তখন সে সেই দিকেই উত্তরোত্তর সুখের আশায়—তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার প্রবৃত্তি ভিন্নমুখী হইয়াছে; ভক্তির কণামাত্র আস্বাদন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, সুতরাং এখন সে তাহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি-লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বুঝিল, হৃদয়ে অতীতের যে আবিলতা রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ধৌত না করিলে তৃপ্তিলাভ অসম্ভব। আবিলতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া হলধর আপনাকে বড়ই অশুচি জ্ঞান করিতে লাগিল। হরিনামে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের মলিনতা তো ধৌত হইল না। কোন্ স্বর্গের পবিত্র সলিল স্পর্শে এই মলিনতা বিধৌত হইবে, তাহারই অন্বেষণে সে ব্যস্ত হইল। তার পর সে যে দিন শিরোমণি মহাশয়ের মুখে গঙ্গার অপরিসীম মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিল, সে দিন যেন তাহার হৃদয়ের ভারটা কিছু লঘু হইল। মনে মনে ভাবিল, তবে আর ভয় কি?

সর্ব্ব-কলুষ-নাশিনী ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে আপনার হৃদয়স্থিত পাপরাশি বিধৌত করিবার জন্য হলধর প্রস্তুত হইল। সম্মুখে মাঘীপূর্ণিমার যোগ। বিধবা পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া হলধর গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিল। পাড়ার আরও কয়েকজন লোক সঙ্গী হইল।

( ৭ )

তখনও সে প্রদেশে রেল হয় নাই; সুতরাং পদব্রজে পঁচিশ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া মাঘীপূর্ণিমার দুই দিন পূর্ব্বে সকলে কলিকাতায় উপস্থিত হইল। সম্মুখে কলনাদিনী ভাগীরথীর সুপবিত্র মধুরাহ্বান শুনিয়া হলধরের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হাটখোলার মধ্যে গ্রামের নিতাই দাসের একটি ক্ষুদ্র দোকান ছিল। নিতাইয়ের সহিত হলধরের খাতক-মহাজন সম্বন্ধ ছিল। হলধর লোকজনের সহিত তাহার দোকানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দূর-পথ অতিক্রম করিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিল। বৃদ্ধ হলধরের জীর্ণ তনু দেহ সর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উত্তমরূপে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল।

রাত্রিকালে তাহার যেন একটু জ্বর হইল। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পরদিন প্রাতে উঠিয়াই সে এক ঘণ্টা ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিল। আহারাদির পর জ্বরটা একটু জোরে আসিল। সকলেই চিন্তিত হইল, কিন্তু হলধর তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় জ্বরত্যাগ হইলে সে আবার উত্তমরূপে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। রাত্রিকালে জ্বরের প্রকোপ আরও বাড়িল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে হলধর গঙ্গাস্নানে চলিল। সকলেই তাহাকে স্নান করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, মা গঙ্গার কোলে দেহ রাখিব, এত পুণ্য আমার নাই।"

কিন্তু স্নানের পর হলধর সেই যে শয্যা গ্রহণ করিল, আর উঠিতে পারিল না, জ্বরের প্রকোপে তাহার চৈতন্য রহিত হইল। অপরাহ্নে সকলে দেখিল, জ্বর বিকারে পরিণত হইয়াছে। নিতাই দাস ভীত হইয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিলেন, হৃদ্‌যন্ত্রের গতি পরীক্ষা করিলেন; তার পর মুখ বিকৃত করিয়া কয়েকটা ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন; বলিয়া গেলেন, "আশা নাই; আজি রাত্রিটা কাটিলে, কালি সকালে আমাকে সংবাদ দিও।"

হলধরের চৈতন্য নাই, বিকারের ঘোরে আচ্ছন্নপ্রায়। মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতেছে; প্রলাপের মাঝে মাঝে বলিতেছে,—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

পুত্রবধূ সমস্ত রাত্রি তাহার মাথার শিয়রে বসিয়া রাত্রি কাটাইল।

নিতাই বড় বিপদেই পড়িল। লোককে আশ্রয় দিয়া যে শেষে এমন বিপদে পড়িতে হয়, তাহা কে জানে। সে এখন এই পাপ বিদায় করিতে পারিলে বাঁচে। নিতাই বৃদ্ধের অনেকগুলি টাকা ধারিত।

প্রাতঃকালে নিতাই সকলের নিকট রোগীর গঙ্গাযাত্রার প্রস্তাব করিল। হলধরের পুত্রবধূ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সকলেই নিতাইয়ের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। নিতাই তখন হলধরের গঙ্গাযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইল। অল্পক্ষণমধ্যেই খাট আসিল, সকলে হলধরকে খাটে তুলিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। হলধরের তখন বিকারের ঘোরটা কাটিয়াছে, অল্প অল্প চৈতন্য হইতেছে। সে ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসিল,—"আমাকে কোথায় লইয়া যাও?"

নিতাই নিকটে আসিয়া বলিল,—"গঙ্গাতীরে।"

হলধর বলিল,—"মাঘীপূর্ণিমা কবে?"

নিতাই বলিল,—"আজ।"

সকলেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া হলধরকে খাট হইতে নামাইল। তাহার চরণ হইতে নাভি পর্য্যন্ত অর্দ্ধাঙ্গ গঙ্গার জলে স্থাপন করিল, অপর অর্দ্ধাঙ্গ স্থলে রহিল। পুত্রবধূ শ্বশুরের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। সকলে গঙ্গামৃত্তিকা আনিয়া হলধরের সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম লিখিয়া দিল।

গঙ্গাতীরে লোকারণ্য। বহু দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী পূর্ণিমার যোগে স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই হলধরের মৃত্যু দেখিবার জন্য তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। হলধরের সঙ্গিগণ তাহাকে হরিনাম শুনাইতে লাগিল, সমবেত নরনারীগণও উচ্চকণ্ঠে চারিদিক্ হইতে হরিধ্বনির উচ্চরোল তুলিল।

হলধর একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল; দেখিল, কি পবিত্র সঙ্গম! কি সুখের মৃত্যু! ঊর্দ্ধে আবরণশূন্য অনন্ত আকাশ, সম্মুখে ত্রিলোকপাবনী জাহ্নবীর অনন্ত সলিলরাশি, চতুর্দ্দিকে অনন্তকণ্ঠে সুমধুর হরিনাম। হলধর মৃত্যুযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া মনে মনে বলিল,—"মা গো পাপনাশিনি জাহ্নবি, এই পুণ্য মুহূর্ত্তে—এই পবিত্র সঙ্গমে তোমার কোলে শুইয়া মধুর হরিনাম শুনিতে শুনিতে মরিলেও কি আমার পাপরাশি বিধৌত হইবে না মা?"

তাহার নেত্র-প্রান্ত হইতে প্রেমাশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল, নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল, ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষুতারকা স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। একজন তাহার কানের নিকট মুখ রাখিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল,—"বল গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।"

অন্তের অশ্রাব্য স্বরে হলধর তখন বলিতেছে,—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

উচ্চারণ শেষ করিয়া হলধর ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল, একটা তরঙ্গ আসিয়া তাহার মস্তক পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিল। অনন্তগামিনী পতিতপাবনী জাহ্নবীর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে পূর্ণিমার পুণ্যময় মুহূর্ত্তে হলধর অনন্তের পথে যাত্রা করিল।

চিরচক্রতিশালী হলধরের অনুতপ্ত আত্মা মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইবে না কি?

# কৃতজ্ঞতা

( ১ )

ক্রোশত্রয়ব্যাপী বিস্তৃত মাঠের মধ্যস্থলে বাবলাগাছে ঘেরা ছোট গ্রামখানি; গ্রামের নাম তেঁতুলবেড়ে! দশঘর কৈবর্ত্ত, একঘর কুমোর, তিনঘর চাঁড়াল এবং দুইঘর জেলে মাত্র গ্রামের অধিবাসী। অধিবাসীরা দরিদ্র, চাষই তাহাদের উপজীবিকা। চারিদিকে জনশূন্য বিশাল প্রান্তর, মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র অরণ্যানীসদৃশ এই তেঁতুলবেড়ে গ্রাম। দূর হইতে দেখিলে গ্রামখানিকে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল বলিয়াই বোধ হয়।

গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠের ধারে রামধন কৈবর্ত্তের বাস। রামধনের বয়স ষাট বৎসরের উপর। পূর্ব্বে তাহার অবস্থা একটু স্বচ্ছল ছিল, কিন্তু, উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায় অবস্থাটা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর গত বৎসর চৈত্রমাসে চড়কের দিনে—যখন বিবিধবর্ণের পঙ্কশোভিত ঢাকের তুমুল শব্দের সহিত গ্রামখানার মধ্যে একটা উৎসবের কল্লোল ছড়াইয়া পড়িতেছিল; তখন—তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীমন্ত কঠিন জ্বররোগে পিতাকে কাঁদাইয়া, যুবতী ভার্য্যাকে ফেলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। নিদারুণ পুত্রশোকে রামধনের হৃদয়টা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পত্নী তো বহুপূর্ব্বেই শ্রীমন্তকে দুই বৎসরের রাখিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তো রামধন ততদূর কাতর হয় নাই। সে কেবল শ্রীমন্তের মুখ চাহিয়া তাহা সহ্য করিয়াছিল, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও শক্তি ঢালিয়া দিয়া শ্রীমন্তকে বড় করিয়াছিল, তাহার বিবাহ দিয়াছিল, শূন্যগৃহে আবার সুখের সংসার পাতিয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তো সে তাহা রাখিতে পারিল না; কালের কঠোর করস্পর্শে বৃদ্ধের একমাত্র হৃদয়রত্ন, সংসারে আশা-ভরসার স্থল পঁচিশ বৎসরের শ্রীমন্ত সেই নূতন পাতান সংসারটাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল! বৃদ্ধের সমস্ত আশা, ভরসা, উদ্যম ভাঙ্গিয়া পড়িল, এত কষ্টের সংসারটা আবার যে শূন্য, সেই শূন্য হইল। সেই শূন্য সংসারে রহিল কেবল শোকজীর্ণ বৃদ্ধ রামধন, আর তাহার সপ্তদশবর্ষীয়া পুত্রবধূ কেতকী।

কেতকী না থাকিলে বুঝি বৃদ্ধ রামধনের হৃদয়ে এত বড় আঘাতটা সহিত না। কেবল কেতকীর যত্নে, কেতকীর ভক্তিতে, কেতকীর সেবায়, কেতকীর মায়ায় বৃদ্ধকে হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুনটা চাপিতে হইল, কেতকীর জন্যই সংসারশূন্য হইয়াও আবার তাহাকে সংসারী হইতে হইল। আবার শোকজীর্ণ রামধন তরকারীর মোট মাথায় লইয়া চকদিঘীর হাটে চলিল, আবার সে বৈশাখের রৌদ্র, শ্রাবণের ধারাপাত উপেক্ষা করিয়া চাষে খাটিতে লাগিল; কেতকীর মুখে 'বাবা' সম্বোধন শুনিয়া বৃদ্ধ এই মরণের পথে দাঁড়াইয়াও জীর্ণ সংসারটাকে আবার সবলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

রামধনের কয়েক বিঘা তরকারীর ক্ষেত ছিল। তাহাতে বেগুন, শশা, শাক, কুমড়া প্রভৃতি সময়োপযোগী ফসল হইত। হাটের পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে কেতকী বিক্রয়ের উপযুক্ত জিনিস ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া ঠিক করিয়া রাখিত, রামধন সকালে উঠিয়া সেই মোট মাথায় তিনক্রোশ দূরে চকদিঘীর হাটে যাইত। হাট হইতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইত। সে দিন আর দিবসের মধ্যে কেতকীর খাওয়া হইত না। সে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া, অপরাহ্ণকাল হইতে দ্বারদেশে বসিয়া শ্বশুরের আগমন প্রতীক্ষা করিত। তার পর দূর হইতে শ্বশুরকে আসিতে দেখিলেই সে তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত হইতে ঝাঁকাটা লইত এবং শ্বশুরের অগ্রে অগ্রে গৃহে আসিত। গৃহে আসিলে কেতকী জল আনিয়া শ্বশুরের পা ধোয়াইয়া দিত, তামাক সাজিয়া আনিত। তার পর একটু বিশ্রাম করিয়া রামধন আহারে বসিত, কেতকী সম্মুখে বসিয়া, মাতা যেমন আগ্রহ ও যত্নের সহিত সন্তানকে খাওয়ায়, তেমনই করিয়া তাহাকে খাওয়াইত। শ্বশুরের আহার শেষ হইলে তাহাকে পান তামাক দিয়া কেতকী নিজে আহারে বসিত।

এইরূপে কেতকীর যত্নে ও শুশ্রূষায় বৃদ্ধ রামধন সমস্ত ভুলিয়া যাইত; তাহার ভগ্ন অবসন্ন হৃদয়টা আবার সংসারের সহিত কঠোর যুদ্ধের জন্য সবলে বুক বাঁধিত।

( ২ )

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। রামধন হাটে গিয়াছিল, কিন্তু এই দুর্য্যোগে তখনও ফিরিতে পারে নাই। সন্ধ্যার বৃষ্টিটা একটু জোরে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কেতকী দ্বার রুদ্ধ করিয়া, একা ঘরের ভিতর বসিয়া শ্বশুরের জন্য ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে

কত কথাই তাহার মনে হইতেছিল। স্বামীর কথা, সংসারের কথা, একে একে সকলই একটি ঘোর দুঃস্বপ্নের মত তাহার মনে পড়িতেছিল। হায়! স্বামী—সেই জীবের মত স্বামী থাকিলে আজ বৃদ্ধবয়সে শ্বশুরকে এত কষ্ট করিতে হইবে কেন? ভাবিতে ভাবিতে—কেতকীর বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে একটা আকুল দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া ঝটিকাপ্রবাহে মিশিয়া যাইতেছিল। বাহিরে উন্মাদিনী প্রকৃতির ভৈরব তাণ্ডবে দিগন্ত কম্পিত হইতেছিল।

সহসা বহির্দ্বারে ঘন ঘন আঘাত-শব্দ হইল। কেতকী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুরের আগমন-সম্ভাবনায় তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখটা হাসিয়া উঠিল। সে ভিজিতে ভিজিতে গিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। বাহিরে ঘোর অন্ধকার হইলেও ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। সেই বিদ্যুতালোকে কেতকী দ্বারের সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইল। সেরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তি কেতকী জীবনে কখনও দেখে নাই। ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া আসিল।

কেতকী যে মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, তাহা আর কিছুই নহে, জনৈক সাহেবের মূর্ত্তি। কেতকী ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সাহেব দেখে নাই। কেবল শুনিয়াছিল, রেললাইন প্রস্তুত করিতে শ্যামগঞ্জে কয়েকজন সাহেব আসিয়াছে। আজি সম্মুখে সাহেবের অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া কেতকী তাহাকে মনুষ্য অথবা অন্য কোন প্রকার জীব বলিয়া কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। মানুষ হইলে এমন মানুষ ত সে কখনও দেখে নাই। সাহেব দ্বারমোচনকারিণীকে এরূপ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলিলেন,—আমি বড় বিপদে পাড়িয়াছে।"

বাঁকা বাঁকা কথা হইলেও কেতকী বুঝিল, ইহা মানুষ। তার পর সে বিদ্যুতালোকে দেখিল, মানুষটার সর্ব্বশরীর বৃষ্টিসিক্ত, কর্দ্দমাক্ত, শীতে কম্পমান। কেতকী বুঝিতে পারিল, যেই হউক, একটা মানুষ ঝড়-বৃষ্টিতে মাঠের মাঝে বিপদে পড়িয়াছে। তখনও সমান বেগে বৃষ্টির সহিত করকাপাত হইতেছিল, ঝড়ও চলিতেছিল। কেতকী দেখিল আশ্রয় না পাইলে মানুষটা আজি এই জলে ঝড়ে মারা যাইবে। তখন সে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিল,—"এস।"

"Thank you girl." বলিয়া সাহেব অগ্রবর্ত্তিনী কেতকীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন। কেতকী আসিয়া গৃহের রোয়াকে দাঁড়াইল, সাহেবেও দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঝড়ের বেগে সেখানে দাঁড়ান দায় হইল। অগত্যা কেতকী ঘরে প্রবেশ করিয়া সাহেবকেও আসিতে বলিল; সাহেব ঘরে আসিয়া "O God!" বলিয়া হাঁফ ছাড়িলেন। কেতকী ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে কেতকী ভাল করিয়া সাহেবের মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদ দেখিল। গ্রামের কেহ কেহ পূর্ব্বে সাহেব দেখিয়া আসিয়াছিল; তাহাদের মুখে যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছিল, এক্ষণে সম্মুখস্থ মূর্ত্তিকে তদনুরূপ দেখিল। কেবল তাহার মাথায় টুপীটা ছিল না, তাহা ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। কেতকী চিনিল, এও সাহেব। সে শুনিয়াছিল, সাহেবেরা দেবতার জাত, কেহ তাহাদের কাছে যাইতে পারে না; তাহারা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, মন্ত্রবলে গাড়ী চালায়, জলের উপর বাড়ী ভাসায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষণে সেই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সাহেবকে আপন গৃহে বিপন্ন অতিথিরূপে দেখিয়া কেতকীর একটু ভয়-বিমিশ্রিত কৌতূহল হইল। সে সাহস করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি সাহেব?"

সাহেব তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"Yes, আমি সাহেব আছে; কিন্তু আমাকে বড় শীত হইতেছে।"

কেতকী দুইখানি শুষ্ক বস্ত্র দিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। বাধ্য হইয়া সাহেব কোট-প্যাণ্টালুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক একখান কাপড় পড়িলেন, অপরখান গায়ে দিলেন। ঘরে একখান জলচৌকী ছিল, কেতকী তাহা লইয়া সাহেবকে বসিতে দিল। সাহেব হৃষ্টান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিয়া তাহাতেই উপবেশন করিলেন।

তেঁতুলবেড়ের তিন ক্রোশ পশ্চিমে রেল-লাইন নির্ম্মিত হইতেছিল। তাহারই তত্ত্বাবধারণ জন্য কয়েকজন সাহেব আসিয়া শ্যামগঞ্জে ছাউনী করিয়াছিলেন। আগন্তুক সাহেব তাঁহাদিগেরই অন্যতম। সাহেবের নাম জন হ্যারিংটন। ছাউনীতে যে কয়জন সাহেব ছিলেন, হ্যারিংটনই তাঁহাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ প্রধান কর্ম্মচারী। অন্য কোনও বিশেষ কার্য্যানুরোধে সাহেব পদব্রজে চক্দিঘীর বাজারে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিতে অপরাহ্ণ হইয়াছিল। মাঠের উপর দিয়াই রাস্তা। সাহেব যখন সেই বিস্তৃত মাঠের মধ্যস্থলে আসিলেন, তখন সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টি আসিল। সাহেব ভিজিতে ভিজিতে আশ্রয়ানুসন্ধানে ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের অন্ধকারের সহিত মিশিয়া চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিল। হ্যারিংটন অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়া তেঁতুলবেড়ে গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্যুতালোকে সম্মুখেই একখানি বাটী দেখিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার

অন্ত ঘাড়ে করাঘাত করিলেন। সেই করাঘাতেই কেতকীর চিন্তাসূত্র বিছিন্ন হইয়াছিল।

( ৩ )

রজনীর গভীরতা-বৃদ্ধির সহিত বৃষ্টির বেগও বাড়িতে লাগিল। কেতকী বসিয়া বসিয়া শশুরের বিষয় ভাবিতে লাগিল, আর সাহেবও মুদিত নয়নে বসিয়া ছাউনীস্থ আরাম-কেদারার সহিত এই ক্ষুদ্র চৌকীখানীর তুলনা করিতে করিতে কে অধিক মূল্যবান, তাহারই মীমাংসা করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে এই দয়াবতী রমণীর করুণা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে থাকিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তখন কেতকী উঠিয়া জিজ্ঞাসিল,—"সাহেব! তুমি কি খাবে?"

সাহেব উত্তর দিলেন,—"আমি খাইব না।"

কেতকী বলিল,—"তাও কি হয়? অতিথিকে উপোস রাখতে নাই সাহেব?"

সে স্নেহকোমল স্বর শুনিয়া সাহেব বিস্মিত হই-লেন। একজন অসভ্য পল্লীবাসিনী রমণীর হৃদয়ে যে এতটুকু করুণা, এতটুকু অতিথিবৎসলতা থাকিতে পারে, তাহা তিনি এই প্রথম দেখিলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার আহারেচ্ছা না থাকিলেও এই দয়াবতী রমণীর হৃদয়ে ক্ষোভ দেওয়া অসঙ্গত বিবেচনায় বলিলেন,—"খাইতে কি আছে?"

কেতকী বলিল,—"ভাত আছে।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া সাহেব বলিলেন,—"আমি কখনও ভাত খায় না।"

কেতকী বলিল,—"তবে গুড় আছে, মুড়ি আছে, কলা আছে।"

সাহেব গুড়মুড়ি খাইলেন না, কেবল কয়েকটা সুপক্ব কদলী উদরসাৎ করিলেন। কেতকীর অন্ন প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সে কিছুই খাইল না। আহারান্তে সাহেব বসিয়া বসিয়া কেতকীকে তাহার সংসারের কথা, অবস্থার কথা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন; কেতকী একে একে ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিল। তাহার সকল কথা না বুঝিলেও সাহেব ইহা বুঝিতে পারিলেন, সে বিধবা, তাহার কেবল এক বৃদ্ধ শশুর ভিন্ন আর কেহই নাই, অবস্থা বড় মন্দ।

রাত্রিশেষে বৃষ্টি থামিল। প্রভাতে উঠিয়া সাহেব বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন এবং পকেট হইতে একখান নোট বাহির করিয়া কেতকীর হাতে দিতে গেলেন; কিন্তু কেতকী তাহা লইল না। সাহেব অনেক অনুরোধ করায় সে বলিল,—"বিপদে মানুষকে আশ্রয় দিয়া কিছু লইতে নাই সাহেব।"

অসভ্য অশিক্ষিত নেটিভ-রমণীর হৃদয় এত উচ্চ, এত লোভশূন্য দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি নোটখানি আপনার পকেটে রাখিয়া বলিলেন, —"তোমার নাম কি হয়?"

কেতকী নতবদনে আপনার নাম বলিল। সাহেব নোট-বুকে নামটি লিখিয়া লইয়া বলিলেন,—"আমার নাম হয় জন হ্যারিংটন। কোন প্রয়োজন হইলে বা কোন বিপদে পড়িলে শ্যামগঞ্জের ছাউনীতে আমার নিকট যাইবে।"

ঘরের এদিকে ওদিকে একবার পাদচারণ করিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন। কেতকী তাঁহার সমস্ত নামটা মনে রাখিতে পারিল না, কেবল জন কথাটা মনে রহিল।

( ৪ )

প্রভাতে রামধনের গৃহ হইতে সাহেবকে বহির্গত হইতে দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বিস্মিত হইল। তার পর যখন তাহারা অনুসন্ধানে জানিল যে, কল্য রাত্রিতে রামধন বাটীতে ছিল না এবং সাহেবের সহিত কেতকী সমস্ত রাত্রি বাস করিয়াছে, তখন সকলেই অনায়াসে স্থির করিল যে, এতদিনের পর কেতকী মরিয়াছে, সে এখন সাহেবের অনুগৃহীতা হইয়াছে। ক্ষুদ্র গ্রামে কথাটা শীঘ্রই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। সহসা নবীন আন্দোলনের হিল্লোলে চির-নিস্তব্ধ গ্রামখানা যেন মুহূর্ত্তে সজীব হইয়া উঠিল।

একটু বেলা হইলে রামধন বাটীতে আসিল। কেতকী শশুরের নিকট গত রাত্রিকার ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া রামধন তাহাতে একটুও অবিশ্বাস করিল না বা অসন্তুষ্ট হইল না, বরং বিপন্নকে আশ্রয়-দানের জন্ত পুত্রবধূর প্রশংসা করিল।

কিন্তু বাটীর বাহির হইলেই অনেকে আসিয়া বৃদ্ধের নিকট কেতকীর দুশ্চরিত্রতার কথা প্রকাশ করিল। রামধন জ্বলিয়া উঠিল, তাহাদিগকে দুই চারিটা কড়া কথা শুনাইয়া দিল। তাহারা বুঝিল, ভিতরে বুড়ারও যোগ আছে।

সেই দিনই গ্রামের মণ্ডল শ্রীনাথ দাস, রামধনকে ডাকাইয়া বলিল,—"কেতকীকে বাড়ী হইতে তাড়া-ইয়া দাও, নতুবা তোমার সহিত কেহ চলিবে না।"

সতী-সাবিত্রী পুত্রবধূর উপর অকারণ এই দোষা-রোপ বৃদ্ধের সহ্য হইল না। সে রাগের মাথায় মণ্ডলকে দুই চারিটি কড়া উত্তর শুনাইয়া দিয়া সেখান হইতে

চলিয়া আসিল। ইহাতে সকলেই স্থির করিল, বুড়া শেষ বয়সে পুত্রবধূর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়াছে। সকলেই তাহার উপর চটিয়া গেল।

কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন কেতকীও তাহা শুনিল। সে বুঝিল, এরূপ অবস্থায় তাহার উপর লোকের সন্দেহ হওয়াই সম্ভব। ঘৃণায় অপমানে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু বৃদ্ধ শ্বশুরকে কাহার কাছে রাখিয়া মরিবে? সুতরাং কেতকীর মরা হইল না, সে কেবল কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রামধন বলিল,—"কান্না কিসের মা, লোকের কথায় কি আসে যায়? 'মিথ্যা কথা সেঁচা পানি' কতক্ষণ থাকে? ভগবান্‌কে ডাক মা!"

সেই দিন রাত্রিকালে শ্বশুরের জন্য শয্যা পরিষ্কার করিতে গিয়া কেতকী দেখিল, শয্যার নীচে একটা আংটী। সে আংটীটা আনিয়া শ্বশুরকে দেখাইল। আলোকের নিকট গিয়া রামধন দেখিল, আংটীর মধ্যে একটা লাল পাথর, পাথরটা যেন জলিতেছে। সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া রামধন বলিল,—"আংটীটা বোধ হয় দামী।"

কেতকী বুঝিল, ইহা সেই সাহেবেরই কাজ। সে বলিল,—"এটা নিশ্চয় সেই সাহেবের আংটী, বোধ হয় ফেলে গেছে! কা'ল তাহাকে দিয়া আইস।"

পরদিন রামধন আংটী লইয়া শ্যামগঞ্জের ছাউনীতে উপস্থিত হইল। হ্যারিংটন ছাউনীর বাহিরে বসিয়াছিলেন। তিনি রামধনের নিকট সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—"আমিই সেই সাহেব; কিন্তু এ আংটী আমার নহে। তোমাদের সাধুতার জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত পুরস্কার।"

রামধন তাঁহাকে আংটী ফিরাইয়া লইতে অনেক অনুরোধ করিল; কিন্তু সাহেব কিছুতেই তাহা আপনার বলিয়া স্বীকার করিলেন না। অগত্যা রামধন ফিরিয়া আসিল। সাহেব এই দরিদ্র কৃষকের সততা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন।

( ৫ )

অপবাদটা মুখে মুখে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, এমন কি, শেষে দেশে বাস করাও রামধনের দায় হইয়া পড়িল। কেহই তাহার সহিত কথা কহে না, দেখা হইলে মুখ বাঁকাইয়া, মুচকি হাসিয়া চলিয়া যায়। কেহ বা তাহার মুখের উপর দুই চারিটা তীব্র বিদ্রূপবাক্যও শুনাইয়া দেয়, কখন বা ছেলের দল তাহার পশ্চাতে হাততালি দিয়া উঠে। ইহাতে বৃদ্ধ রামধন হৃদয়ে শেলাঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করে।

অনেক চিন্তার পর রামধন দেশত্যাগ করাই স্থির করিল। কিন্তু অন্যত্র গিয়া নূতন করিয়া ঘর বাঁধিতে হইলে কিছু টাকার দরকার। তখন কেতকী সেই আংটীটা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রামধনও তাহাতে সায় দিল।

হাটের দিন রামধন হাটে যাইবার সময় আংটীটা সঙ্গে লইয়া গেল। সেখানে এক পোদ্দারের দোকানে আংটীটা দেখাইল। পোদ্দার রামধনের হস্তে এমন মূল্যবান্ আংটী দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে বুঝিল, আংটীর পাথরখানার দাম দুই হাজার টাকার কম নহে। একজন সামান্য লোকের নিকট এরূপ মূল্যবান আংটী দেখিয়া পোদ্দারের মনে বড় সন্দেহ হইল। সে রামধনকে বসিতে বলিয়া গোপনে পুলিশে সংবাদ দিল। তৎক্ষণাৎ পুলিশ আসিয়া আংটীর সহিত রামধনকে গ্রেপ্তার করিল।

মধ্যাহ্নকালে দুই একজন লোক হাট হইতে ফিরিয়া এ সংবাদটা গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিল। কেতকীও শুনিল, তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি উপায়ে শ্বশুরকে উদ্ধার করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। গ্রামের মধ্যে এমন কেহই নাই, যাহাকে সে আপনার দুঃখের কথা বলে বা এ বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করে। কেতকী বড় অস্থির হইয়া পড়িল। সহসা তাহার মনে হইল, সেই সাহেব যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল, "কোন বিপদে পড়িলে শ্যামগঞ্জে আমার নিকট যাইবে।" সাহেব মনে করিলে কি না করিতে পারে? বিশেষতঃ সাহেব যদি আংটী নিজের বলিয়া স্বীকার করে, তবে তো সকল গোল চুকিয়া যায়। কিরূপে সেখানে সংবাদ দেওয়া যায়? অনেক ভাবিয়া শেষে কেতকী সাহসে বুক বাঁধিল, নিজেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য শ্যামগঞ্জে চলিল।

তিন ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া কেতকী অপরাহ্নকালে শ্যামগঞ্জের ছাউনীতে উপস্থিত হইল। ছাউনীর বাহিরে একজন লোক দাঁড়াইয়াছিল; কেতকী তাহাকে জন সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিল। লোকটি বলিল, "এখানে জন নামে দুই জন সাহেব থাকেন। সাহেবের আর কোন নাম জান?"

কেতকী বলিল, "ভুলিয়া গিয়াছি।"

লোক বলিল,—"কিন্তু জন নামে যে দুই জন সাহেব থাকেন, তাঁহাদের কেহই আজ এখানে নাই। এক জন চারি ক্রোশ দূরে পলাশপুরে গিয়াছেন, সন্ধ্যার পর আসিবেন বোধ হয়, আর এক জন গোপালনগরে আছেন।"

গোপালনগর সেখান হইতে এক ক্রোশ দূর; রাস্তা ভাল। কেতকী আর কোন কথা না বলিয়া গোপালনগরে চলিল। যাইবার সময় লোকটি জিজ্ঞাসিল,—"তোমার নাম কি?"

কেতকী আপনার নাম বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

( ৬ )

সন্ধ্যার সময় কেতকী গোপালনগরে উপস্থিত হইল এবং অনেক খুঁজিয়া মাঠের ধারে সাহেবের ক্ষুদ্র বাংলা পাইল। বাংলার সম্মুখে এক জন ভৃত্য বসিয়াছিল। কেতকী তাহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, সাহেব বাংলার ভিতর আছেন। তখন সে ভৃত্যকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া সাহেবের সহিত দেখা করাইয়া দিতে বলিল। তাহার কাতরতাদর্শনে ভৃত্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাংলার ভিতর প্রবেশ করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া, কেতকীকে লইয়া সাহেবের নিকট পৌছাইয়া দিল। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া সাহেব তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। কেতকী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই চমকিয়া উঠিল। দেখিল, এ তো সে সাহেব নয়, তাহার মুখখানা তো এমন বিশ্রী নহে। কেতকীকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিলেন। তাহার পর স্বাভাবিক রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি চাও টুমি?"

কেতকী কম্পিত-কণ্ঠে বলিল,—"তুমি তো সে সাহেব নও?"

সাহেব বলিলেন,—"কাহাকে চাও টুমি?"

কেতকী বলিল,—"আমি জন সাহেবকে খুঁজছি।"

সাহেব সহাস্যে বলিলেন,—"হামিও জন আছে, হামার নাম জন রবার্ট। কি কাজ আছে টোমার?"

কেতকী ভাবিল, সাহেব তো বটে? মনে করিলে এ সাহেবও তো উপকার করিতে পারে। তখন সে আপনার বিপদের কথা সাহেবকে জানাইল। শুনিয়া সাহেব ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিলেন,—"Very good, হামি টাহার উপায় করিটে পারিবে। ডর করিও না টুমি, বইস।"

সাহেব নিকটস্থ শয্যা দেখাইয়া কেতকীকে তাহাতে বসিতে বলিলেন। আর অন্ত আসন সেখানে ছিল না। কেতকী বলিল,—"না, আমাকে এখনই যাইতে হইবে।"

সাহেব। রাট্রিকালে যাইতে পারিবে না টুমি, প্রাটে উঠিয়া যাইবে।

কেতকী। আমার শ্বশুর বিপদাপন্ন।

সাহেব। Don't care, হামি টাহার ভাল করিবে।

সাহেব পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া তাহা ধরাইলেন। পরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"কল্য প্রাটে হামি পোলিশে লোক পাঠাইব। ডরো মৎ বিবি।"

সাহেব কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কেতকী কক্ষতলে বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভৃত্য আসিয়া আলোক দিয়া গেল। কেতকী তাহাকে বলিল,—"আমি বাহিরে যাব।"

ভৃত্য বলিল,—"সাহেবের হুকুম না হইলে যাইতে পারিবে না।"

কেতকী জিজ্ঞাসিলেন,—"সাহেব কোথায়?"

ভৃত্য কোন উত্তর দিল না, দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কেতকী মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল।

এ দিকে সন্ধ্যার পরই হ্যারিংটন সাহেব জামগঞ্জের ছাউনীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত লোকটি তাঁহার নিকট কেতকীর আগমন-সংবাদ জানাইল। সাহেব তাহাকে আগন্তুক স্ত্রীলোকের নাম জিজ্ঞাসিলেন। লোক বলিল,—"তাহার নাম কেতকী।"

সাহেব একবার নোটবুক খুলিয়া দেখিলেন, তাহার পর ব্যস্ততাসহ জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কোন্ দিকে গিয়াছে?"

লোক বলিল,—"গোপালনগরে।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ দুই জন ভৃত্যকে তাঁহারই অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া দ্রুতপদে গোপালনগর অভিমুখে চলিলেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় সশব্দে দ্বার মুক্ত করিয়া রবার্ট সাহেব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চরণদ্বয় ঈষৎ চঞ্চল, স্বরটা একটু জড়িত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ। সাহেব আসিয়াই "O my darling!" বলিয়া কেতকীকে ধরিতে গেলেন। কেতকী ব্যস্তভাবে উঠিয়া পশ্চাৎপদ হইল, সাহেব হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই তিনি উভয় বাহু বিস্তার করিয়া কেতকীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কেতকী চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে সহসা সশব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং এক ব্যক্তি বিদ্যুদ্বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া

সাহেবের পৃষ্ঠে সবলে পদাঘাত করিলেন। সে আঘাতে সাহেব কয়েক হাত দূরে নিপতিত হইলেন। কেতকী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সে যাহাকে খুঁজিতেছিল, সম্মুখে সেই সাহেব। সে চীৎকার করিয়া সাহেবের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

( ৭ )

কেতকীর নিকট সমস্ত অবগত হইয়া সেই রাত্রিতেই হ্যারিংটন থানায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ং জামিন হইয়া রামধনকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। দেশের লোকেরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইল; কেতকীর সহিত সাহেবের যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, তাহাতে তাহাদের আর কোনই সন্দেহ রহিল না। অপবাদটা আরও একটু বাড়িয়া উঠিল।

যথাসময়ে আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। হ্যারিংটন আদালতে উপস্থিত হইয়া আংটী আপনার বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহা তিনি পুরস্কারস্বরূপ রামধনকে দান করিয়াছিলেন, এ কথাও বলিলেন। মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইয়া গেল।

আদালতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেও কিন্তু রামধন এবার কালের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাহার শোকতাপজীর্ণ হৃদয়ে কেতকীর সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদটা বড়ই আঘাত পাইয়াছিল, লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে তাহার বুকটা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর আবার চোর অপবাদে গ্রেপ্তার, পুলিশের হস্তে অযথা পীড়ন—বৃদ্ধের জীর্ণ বুকে এত আঘাত আর সহিল না, সে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। তার পর এক দিন পুত্রবধূর কোলে মাথা রাখিয়া হরিনাম করিতে করিতে বৃদ্ধ সকল জ্বালার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। দুর্গম সংসারপথে কেতকী একা পড়িয়া রহিল।

কেতকী প্রথমে খুব কাঁদিল, তার পর চক্ষু মুছিয়া শ্বশুরের সৎকারের জন্ত ব্যস্ত হইল। সে গ্রামের সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া মাথা কুটিল, কিন্তু কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। অধিকন্তু কেহ কেহ শ্লেষ করিয়া বলিল,—"ভাবনা কি, এখনই সাহেব এসে গোর দিবে।"

কেতকী অকূল পাথারে পড়িল। কেবল একজন তাহার এই কাতরতা সহ্য করিতে পারিল না। বৃদ্ধ সদয় চাঁড়াল মনে মনে গ্রামের লোকের মুণ্ডপাত করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে কতকগুলা কাঠ কাটিয়া চিতা সাজাইয়া দিল। কেতকীর দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল; সে শ্বশুরের শবদেহ স্কন্ধে লইয়া শ্মশানে আসিল। তার পর সদয়ের উপদেশানুসারে অনেক কষ্টে দাহকার্য্য সম্পন্ন করিল। দাহশেষে স্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেতকী একা শূন্যগৃহে প্রবেশ করিল।

( ৮ )

ইহার তিন দিবস পরে একদিন গভীর রজনীতে তেঁতুলবেড়ে গ্রামে একটা বড় গোল উঠিল। ভীষণ চীৎকার ধ্বনি, লাঠীর ঠক্‌ঠকি এবং দরজা ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া গ্রামবাসীরা বুঝিল, রামধনের ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে। সকলে উত্তমরূপ স্ব স্ব গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল।

তার পর প্রভাতে উঠিয়া সকলে দেখিল যে, সত্য সত্যই রামধনের বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছে। কিন্তু ঘরের জিনিসপত্র সমস্তই রহিয়াছে, কেবল কেতকী নাই। সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল।

পুলিশ আসিয়া যথারীতি ডাকাতির তদন্ত আরম্ভ করিল। কিন্তু তিন চারি দিন অতীত হইলেও ডাকাতির কোন কিনারাই হইল না, কেতকীরও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

এই অদ্ভুত ডাকাতির সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। হ্যারিংটন সাহেব শ্যামগঞ্জে বসিয়াই এ সংবাদ শুনিলেন; শুনিয়াই তিনি তেঁতুলবেড়ে উপস্থিত হইলেন। লোকের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে, মিঃ রবার্ট পদাঘাতের বেদনা ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু সে কথা প্রকাশ না করিয়া তিনি স্বয়ং গোপনে কেতকীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তিন দিন অনুসন্ধানের পর সাহেব শুনিলেন যে, গোপালনগরের প্রান্তভাগে নদীতীরে ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে একটা অর্দ্ধভগ্ন মন্দির আছে, কেতকীকে সেই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। শুনিবামাত্র হ্যারিংটন লোকজনসহ সেই স্থানাভিমুখে ছুটিলেন।

অনেক অন্বেষণ করিয়া হ্যারিংটন মধ্যাহ্নকালে সেই নদীতীরস্থ জঙ্গল ও মন্দির পাইলেন। তখন তিনি জঙ্গল ঠেলিয়া অনেক কষ্টে মন্দিরের সম্মুখে আসিলেন। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সেই মুক্ত দ্বারপথে সাহেব যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সেই মন্দিরের একদিকে ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া আড়ষ্টভাবে কেতকী দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সম্মুখে দুই তিন হাত দূরে রবার্ট সাহেব তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল হস্তে দণ্ডায়মান। রবার্ট বলিতেছে,—"হয় সম্মত হও, নতুবা এখনই গুলী করিব।"

হ্যারিংটন লাফাইয়া মন্দিরের দ্বার-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সে শব্দে চমকিত হইয়া রবার্ট একবার ঘৃণার চক্ষে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। মুহূর্ত্ত পরেই তাহার হস্তস্থিত পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই হ্যারিংটন "O Satan" বলিয়া লাফাইয়া উভয়ের মধ্যস্থলে পিস্তলের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন, গুলী তাঁহার স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। হ্যারিংটন সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণ ছুটিয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ রবার্ট পিস্তল ঘুরাইয়া আপনার ললাট লক্ষ্য করিল। আবার ভীষণশব্দে মন্দির জঙ্গল প্রতিধ্বনিত করিয়া পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল, শব্দের সহিত রবার্টের প্রাণহীন দেহ হ্যারিংটনের পার্শ্বে পতিত হইল।

হ্যারিংটন তখনও সংজ্ঞাহীন। অনুচরগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ গোপালনগরের কুঠীতে লইয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া হ্যারিংটনের স্কন্ধ হইতে গুলী বাহির করিয়া দিলেন, ঔষধ দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ করিলেন। সন্ধ্যার পর হ্যারিংটনের চৈতন্য হইল। তিনি কেতকীকে দেখিতে চাহিলেন। কেতকী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে তখন কাঁদিতেছিল, গণ্ড, বক্ষ প্লাবিত করিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিতেছিল! সাহেবেরও চক্ষু সজল। কেতকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"সাহেব, আমার জন্য তুমি প্রাণ দিলে?"

সাহেবের মুখে হাস্যরেখা বিভাসিত হইল; তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"আমি অতিশয় আনন্দিত হইব, যদি তোমার কথা সত্য হয়। তুমিই একদিন মৃত্যুর মুখ হইতে আমাকে বাঁচাইয়াছিলে।"

কেতকী বলিল,—"আমি তো বাঁচাই নাই সাহেব, আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করেছিলাম।"

হ্যারিংটন বলিলেন,—"তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলে, কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য পালন না করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমি জানিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দিয়া তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমি তোমার কিছুই করিতে পারি নাই। ওঃ, দয়াময় ঈশ্বর! কেবল প্রাণ দিয়া কি আমি তোমার নিকট মার্জ্জনা পাইব?"

হ্যারিংটন আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তিনি আবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। ক্ষতস্থান হইতে আবার রক্ত ছুটিতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন,—"বাঁচিবার আশা নাই।"

পরদিন মধ্যাহ্নকালে হ্যারিংটনের আর একবার চৈতন্য হইল। তিনি কেতকীকে ডাকিলেন। কেতকী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সম্মুখে আসিল। সাহেবের নিকট প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল; তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ কেতকীকে দান করিলেন, অপরার্দ্ধ ভৃত্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তার পর যীশুর পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে হ্যারিংটন চিরনিদ্রিত হইলেন।

কেতকী সেই পাঁচ হাজার টাকা দিয়া মাঠের মধ্যে এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইল। দীর্ঘিকার নাম রাখিল সাহেবদিঘী। তারপর কেতকী কোথায় গেল, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু সেই বিশাল দীর্ঘিকা আজও শত শত তৃষ্ণাতুর পথিককে সুশীতল বারিরাশি দান করিতে করিতে কৃতজ্ঞতার মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

# ঋণশোধ

(১)

প্রভাতে ছোট চালাটিতে বসিয়া রহমত আলি তামাক টানিতে টানিতে গোসেবানিরত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁ রে হান্‌ফে! রায়বেড়ের তিন বিঘের খড়গুলো কেটে আন্‌লে হয় না?"

হান্‌ফে ওরফে হানিফ জাবনা মাখিতে মাখিতে বলিল, "সে আর কেটে এনে কি হবে? গোরু ছেড়ে খাইয়ে দিলেই হবে।"

রহমত কিছু ভগ্নস্বরে বলিল, "তাই তো রে, তাতে কি কিছুই হবে না?"

হানিফ বলিল, "এক মুঠোও না বাপজি, এক মুঠোও না।"

রহমত আপন মনে তামাক টানিতে লাগিল। হানিফ বলদ দুইটি ও গাভীটিকে যথাস্থানে বাঁধিয়া বৎসটিকে একপাশে বাঁধিল; গোশালা হইতে এক ঝুড়ি গোবর বাহিরে ফেলিয়া, নিকটস্থ কলসীতে হাত ডুবাইয়া হাতটা ধুইয়া ফেলিল। তার পর একটা খড়ের বিঁড়া টানিয়া লইয়া পিতার পাশে বসিল এবং রহমতের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া তাহাতে একটা টান দিয়া বলিল, "তাই তো বাপজি! বছর কাটিবে কিসে? কুড়ি বিঘে জমী চষি, এক মুঠো ধান ঘরে ঢুকলো না। খাব কি?"

রহমত বলিল, "খোদা জীব দিয়েছে, আহার দেবে, তার জন্য ভাবি না। গতর আছে, খেটে খাব। কিন্তু এখন পৌষের কিস্তীর খাজনার কি হবে, তাই ভাবছি। দুদিন পাগ (পাইক) এসে ফিরে গেছে।"

হানিফ হুঁকাটা পিতার হাতে দিয়া বলিল, "দাশু মোড়লের কাছে গেছলে?"

রহমত বলিল, "গেলে কি হবে রে, তার গেল বছরের সাড়ে ছ'গণ্ডা টাকা ধার। আবার কি ব'লে হাত পাৎতি?"

হানিফ সগর্ব্বে বলিল, "কেন তার টাকা কি ডুবে যাবে? নাই বা ফসল হোলো, খেটে দেনা শোধ কোর্‌বো।"

পুত্রের উৎসাহ-বাক্যে বৃদ্ধ রহমতের হৃদয় একটু আশান্বিত হইল। সে একটু হাসিয়া বলিল, "তা বটে, কিন্তু মহাজন কি বিশ্বাসে দেয়?"

হানিফ বলিল, "কেন, না-খানা তো আছে। নায়ের কাজে বাপ-বেটায় খেটেও কি টাকা দিতে পার্‌বো না?"

পিতাপুত্রের কথায় বাধা পড়িল। দুইজন পাইক, মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা—চৌদ্দপোয়া মাপের লাঠী ঘাড়ে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। একজন রহমতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সেখের পো! নায়েব মশায় ডাক্‌ছে।"

রহমত ভীতভাবে বলিল, "নবু চাচা! কা'ল সকালে যা পাবি, নিয়ে তেনার সাথে দেখা কর্‌বো বোলো।"

নবু বলিল, "তা আমরা জানি না, নায়েব মশায়ের হুকুম, তোমাদের বাপ-বেটাকে এখনি হাজির হ'তে হবে।"

রহমত পুত্রের মুখপানে চাহিল। হানিফ বলিল, "তা চল না বাপজি! নায়েব মশায়ের সাথে দেখা ক'রে তেনাকে সব বুঝিয়া বল্‌লে হবে।"

রহমত নায়েব মহাশয়কে বেশ চিনিত; তাঁহাকে বুঝাইলে যে কিছুই হইবে না, তাহাও জানিত। সুতরাং সে ভয়ে ভয়ে কাছারীর দিকে চলিল। গোশালা হইতে একটা টিকটিকি টক্‌টক্‌ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। রহমত আল্লার নাম জপিতে জপিতে পাইকদ্বয়ের পশ্চাদ্‌গামী হইল।

(২)

গোপীবাজার নামক ক্ষুদ্র গ্রামখানি কংসাবতীর তীরের উপর অবস্থিত। সেই গ্রামে ঠিক নদীর তীরে রহমত আলির বাস। বাসগৃহখানি ক্ষুদ্র সাদাসিধা রকমের। দুইখানি খড়ের ঘর, একখানি রাঁধিবার ক্ষুদ্র চালা, একপাশে একটি গো-শালা। বাটীতে প্রাচীর নাই। উঠানে এক বৃহৎ তেঁতুলগাছ। পরিজনের মধ্যে তাহার স্ত্রী ও ষোড়শবর্ষীয় পুত্র হানিফ। গোশালায় দুইটি বলদ, একটি গাভী ও একটি বৎস। এই ক্ষুদ্র গৃহস্থালীটি লইয়া রহমত বেশ আনন্দের সহিত কাল কাটাইত। কুড়ি বিঘা জমী চাষ, তাহাতে যে ফসল পাইত, খাজনাখরচা বাদ দিয়াও তদ্দ্বারা সংবৎসর একরকমে কাটিয়া যাইত। ইহা ব্যতীত তাহার একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল, তাহাতেও কিছু আয় হইত। সুতরাং তাহার

উচ্চাশা-বিহীন বিলাসবাসনাবৰ্জ্জিত ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ইহাতেই বেশ সন্তুষ্ট ছিল, কোন দিনই তাহাতে একটুও অসন্তোষের রেখা পড়িত না।

কিন্তু গত বৎসর হইতে তাহার সময়টা মন্দ প'ড়িয়াছে। বিগত ভাদ্রে হঠাৎ কংসাবতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার সমস্ত ফসল প'চিয়া গেল। পৌষ মাসে দাশু মণ্ডলের নিকট সাড়ে ছগণ্ডা টাকা ধার করিয়া জমীদারের খাজনা শোধ করিল। সমস্ত বৎসরটা বড় কষ্টে কাটিল। আবার বর্ষা আসিল। নবোৎসাহে বুক বাঁধিয়া পিতাপুত্রে আবার চাষ করিল; আবার শ্যামল শস্যশ্রেণী দূরবিস্তৃত মাঠে শ্যামসাগরের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। কিন্তু আবার দেবতা বিরূপ হইলেন। আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি হইল না; মাঠের ধান্য মাঠে শুকাইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় নদীর জলে অনেক উপকার হইত, কিন্তু ভাদ্র মাস হইতে কংসাবতীও শুষ্কপ্রায়। রহমতের বুকটা দমিয়া গেল। বুঝিল, এবার আর রক্ষা নাই, এ খোদার মার। বাস্তবিকই বুঝি রহমত এবার খোদার অভিশাপে পড়িল।

( ৩ )

রহমতের বাটীর অনতিদূরেই কাছারী-বাড়ী। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে মাটীর উচ্চ প্রাচীর। মধ্যস্থলে এক সুদীর্ঘ চলগৃহ, বটের দেয়াল, খড়ের ছাউনী। তাহার এক অংশে একখানি গৃহ, অন্য অংশে কাছারী। বিস্তৃত অঙ্গনের এক পাশে খানিকটা ঘেরা জায়গা; সেখানে কয়েক ঝাড় বেলফুলের গাছ, একটা চাঁপাগাছ, একটি কলমের আমগাছ। অপর একদিকে একটা লাউগাছ বাঁশ বহিয়া প্রাচীরে উঠিতেছে। কাছারীর হলে উঠিবার ধাপ তিনটি বিলাতী মাটী দেওয়া, তাহার দুই পাশে দুইটি কামিনী-ফুলের গাছ।

রহমত যখন কাছারীতে উপস্থিত হইল, তখন নায়েব মহাশয় একখানি জলচৌকিতে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন। নায়েব মহাশয়ের দেহটি বেশ স্থূল, কিন্তু যেরূপ স্থূল হইলে চল-ফেরা করিতে কষ্টবোধ হয়, সেরূপ স্থূল নহে। তবে উদরের পরিমাণটা দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু। বর্ণ ঈষৎ শ্যাম। কণ্ঠদেশে ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা। নাম শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, জাতিতে সদ্‌গোপ। ঘোষমহাশয়ের বিদ্যাশিক্ষা কোথায় কতদূর হইয়াছিল, তাহার সন্ধান কেহ রাখে না, তবে তিনি যে খাজনা আদায়ে ও প্রজাশাসনে সিদ্ধহস্ত, এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত। আর এই গুণেই জমীদারের নিকট তাঁহার সাত খুন মাপ হইত। তাঁহার অমোঘ প্রতাপে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়।

রহমত কাঁপিতে কাঁপিতে এ হেন প্রবল-প্রতাপান্বিত নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া এক সুদীর্ঘ সেলাম করিল। নায়েব মহাশয় তাহার দিকে একবার বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। রহমত পুত্রের সহিত উঠানের এক পাশে বসিল।

মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ হইলে ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। নায়েব মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে রহমতের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "রহমত! গতিকখানা কি? রাজার খাজনা দিতে হবে ব'লে কি মনে নাই? খাজনা এনেছিস্?"

রহমতের মুখ শুকাইয়া গেল, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। দুই একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না। তখন নায়েব মহাশয় আবার মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন, "কি গো নবাব সাহেব! গরীবের কথাটা কানে গেল কি?"

রহমত দুই একটা ঢোঁক গিলিয়া, দুই একবার কাসিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, আপনি গরীবের মা-বাপ।"

নায়েব মহাশয় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, গরীবের মা-বাপ নয় তো কারে আর শুনে দিচ্ছি? এখন আসল কথাটার কি বল দেখি?"

রহমত বলিল, "হুজুর যদি মেহেরবাণী ক'রে এ কিস্তিটা রেহাই দেন, তবে আসচে কিস্তিতে—"

বাধা দিয়া নায়েব বলিলেন, "আমার তো বাবার ধন নয় যে, রেহাই দেব। আমি রেহাই দিলে জমীদার ছাড়বে কেন? আর জমীদার ছাড়লেও কোম্পানী ছাড়বে কেন?"

রহমত বলিল, "হুজুর মনে করলে সব করতে পারেন, আপনি আমাদের মা-বাপ।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "ও সব তেল-মাখান কথা রাখ, আদায় চাই। ওরে নবা! আজ খাজনা আদায় ক'রে তবে বাপ-বেটাকে ছেড়ে দিবি।"

রহমত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "হুজুর? আপনি রাজা, রাখতেও পারেন, মারতেও পারেন, হুজুর গরীবের উপর জুলুম করলে—"

নায়েব মহাশয় সশব্দে চৌকী হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তবে রে বেটা নেড়ে! জুলুম? এখন আমি রাজা, মা-বাপ, কিন্তু আমার মেয়ের বে'র সময় যখন পাঁচটি টাকা চেয়েছিলাম, তখন আমি ছিলাম জমীদারের চাকর!"

ইহার পর নায়েব মহাশয়ের মুখবিবর হইতে যে সকল রুচিসঙ্গত বাক্য বাহির হইতে লাগিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সুরুচিসম্পন্ন পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাহি না। এইরূপ কতকগুলা ভদ্রোচিত বাক্যোচ্চারণের পর নায়েব মহাশয় হুকুম দিলেন, "বেটা নেড়েদের বাপ-বেটাকে খুঁটিতে বেঁধে পঞ্চাশ জুতো লাগাও!"

রহমত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া নায়েব মহাশয়ের পায়ে আছাড়িয়া পড়িল। নায়েব মহাশয় তাহার বক্ষে এমন এক পদাঘাত করিলেন যে, সে কয়েক হাত দূরে ঠিকরিয়া পড়িল।

হানিফ বসিয়া বসিয়া পিতার এইরূপ লাঞ্ছনা দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। নিকটে জনৈক পাইকের এক জোড়া নাগরা জুতা পড়িয়াছিল। সে ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, তাহারই একটা নায়েব মহাশয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। সৌভাগ্যক্রমে তাহা নায়েব মহাশয়ের মস্তকে না লাগিয়া স্কন্দদেশে আঘাত করিল। জলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল। নায়েব মহাশয় হুকুম দিলেন, ছোঁড়াকে ঘরের ভিতর লইয়া যাও। পাইকগণ হানিফকে টানিয়া লইয়া চলিল। রহমত অনেক কাঁদিল, অনেক কাকুতি-মিনতি করিল; কিন্তু তাহাতে নায়েব মহাশয়ের হৃদয় গলিল না। আরও কয়েকজন পাইক রহমতকে ধরিয়া একদিকে লইয়া গেল।

ওদিকে ঘরের ভিতর পাইকগণ হানিফকে রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিল। নায়েব মহাশয়ও স্বয়ং একবার গিয়া কিছু শিক্ষা দিয়া আসিলেন।

( ৪ )

এ দিকে নায়েব মহাশয় যখন পিতা-পুত্রকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন গ্রামবাসীরা সভয়ে দেখিল, রহমতের গৃহ হইতে অগ্নির করাল জিহ্বা উঠিয়া মধ্যাহ্ন-গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া সেখানে সমবেত হইল। কিন্তু কি জানি, কাহার ইঙ্গিতে কেহই সে অগ্নি নির্বাণ করিতে চেষ্টিত হইল না। রহমতের স্ত্রী গৃহ হইতে বাহির হইতে পারে নাই; ভীষণ অগ্নিস্তূপের মধ্য হইতে তাহার করুণ ক্রন্দন উঠিয়া দর্শকবৃন্দকে অস্থির করিয়া তুলিল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাহার উদ্ধারে অগ্রসর হইল না। সকলেই নীরবে সেই ভীষণ অগ্নি-ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিল। হতভাগিনী রহমতের স্ত্রী জীবন্তে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় সেই ভীড়ের মধ্য হইতে জনৈক বলিষ্ঠ যুবক কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চতুর্দ্দিকে হুতাশনের লেলিহমান জিহ্বা নৃত্য করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে যুবক রহমতের স্ত্রীকে অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় বাহিরে আনিল। দেখিতে দেখিতে রহমতের গৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

নায়েব মহাশয়ের আদেশানুসারেই যে এই গৃহ-দাহের ব্যাপারটা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। কিন্তু সে কথাটা মুখ ফুটিয়া কেহই বলিতে পারিল না।

অপরাহ্নে রহমত যখন পুত্রকে লইয়া ঘরে ফিরিল, তখন হানিফ অচৈতন্য, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত। রহমত পুত্রের অচেতন দেহ বক্ষে লইয়া ভগ্নস্তূপের নিকট দাঁড়াইল, বৃক্ষতলশায়িতা অর্দ্ধদগ্ধা স্ত্রীর যন্ত্রণা-কাতর মুখের পানে চাহিল, দুর্ব্বলের উপর প্রবল কত অত্যাচার করিতে পারে, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, শোকে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু সে একটুও কাঁদিল না, স্ত্রীর পার্শ্বে পুত্রকে শয়ন করাইয়া ডাক্তার আনিতে চলিল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার আসিলেন; হানিফের অবস্থা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। তারপর রহমতের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া পুলিশে সংবাদ দিতে বলিলেন। ডাক্তার বাবু এই গ্রামবাসী হইলেও এতাবৎকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিকেল কলেজেই অতিবাহিত করিয়াছেন। সুতরাং নায়েবের অখণ্ড প্রতাপ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। এই জন্যই তিনি মধ্যাহ্নকালে অগ্নিস্তূপ হইতে রহমতের স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে এবং এক্ষণে নায়েবের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার পরামর্শ দিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু রহমত জানিত যে, পুলিসে সংবাদ দেওয়া বৃথা, পুলিশ তো নায়েবের দক্ষিণ হস্ত। এমন কি, নিম্নআদালতেও তাহার অপরাধের বিচার হইবে না। তাই সে ডাক্তারের কথায় একবার উর্দ্ধে চাহিল। বুঝি, পৃথিবীর উপরে যে আদালত, যেখানে রাজাপ্রজায় ভেদ নাই, যেখানে নায়েব রহমত উভয়েই সমান, সেই আদালতে প্রাণের অব্যক্ত কাতরতা জানাইয়া সে বিচারপ্রার্থী হইল। কিন্তু সে উচ্চ আদালতে দরিদ্র রহমতের নীরব অভিযোগ পৌঁছিল কি?

যথারীতি চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু হানিফের আর চেতনা হইল না। ইহার উপর প্রবল জ্বর আসিল। ডাক্তার আশা ত্যাগ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসের রাত্রে হানিফের একবার চৈতন্য হইল।

একথায় অতি কষ্টে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বাপজি, বড় মেরেছে, এর শোধ চাই।" ইহার পর তাহার বাক্‌শক্তি চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইল, ক্ষীণদীপ্ত চৈতন্যালোক চিরকালের মত নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। রহমতের স্ত্রী রোগশয্যায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু রহমত কাঁদিল না। তাহার কর্ণে তখনও পুত্রের শেষ উক্তি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, "এর শোধ চাই।" রহমতও মৃত পুত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এর শোধ চাই।" তাহার বিকৃত কণ্ঠধ্বনি ভিত্তিগাত্রে প্রহত হইয়া বজ্রনাদে প্রতিধ্বনিত করিল, "চাই।"

(৫)

রহমতের গৃহ শূন্য। হানিফের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে রহমতের স্ত্রীও পুত্রের অনুসরণ করিল; কয়েকদিন দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পুত্রশোকাতুরা জননীর প্রাণ পুত্রের উদ্দেশে ধাবিত হইল; পুত্রের কবরপার্শ্বে শয়ন করিয়া অভাগিনী বুঝি কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। সংসারপথে রহমত একা পড়িয়া রহিল। তাহার সুখের গৃহ শ্মশান হইল, ছিন্নকন্ধর শুষ্কদেহ বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় এই বিশাল সংসার-প্রান্তরে রহমত একা কেবল অতীতের সাক্ষিরূপে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনের সকল সুখ, সকল আশা, সকল উদ্যম হারাইয়া কঠোর বর্ত্তমানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই দুর্ব্বহ জীবনভার বহনে প্রস্তুত হইল।

রহমত এখন আর কাহারও সহিত কথা কহে না। সে এখন নীরব ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া কেবল ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে নেত্রপ্রান্ত হইতে কয়েকবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হয়, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করে। তার পর সে বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলায়।

অনেক নীরব মধ্যাহ্নে, শুভ্র সন্ধ্যায় সে নদীতীরে একা বসিয়া থাকিত। বসিয়া বসিয়া দেখিত, জগৎ যেমন চলিত, তেমনই চলিতেছে। কংসাবতী তেমনই হেলিয়া দুলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কল-কল রবে ছুটিতেছে, তেমনই তাহার তরঙ্গায়িত বক্ষ ভেদ করিয়া নৌকা সকল নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে. সম্মুখের তেঁতুলগাছের উচু ডালে বসিয়া পাখীগুলি তেমনই ডাকিতেছে, দিনের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর রাত্রি সেই মত আসিতেছে, আবার যাইতেছে। প্রভাতে, অপরাহ্ণে নায়েব মহাশয় তেমনই ছড়ি ঘুরাইয়া নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। সংসারে সব সমান চলিতেছে, কেবল তাহারই দিনগুলা উল্টাইয়া গিয়াছে। তাহার জীবন-ঘড়ীর কাঁটাটা ঠিক চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন কোন্ আঘাতে কোন্ দিকে ঘুরিয়া পড়িয়াছে, তাহার অদৃষ্টের সূক্ষ্ম সূত্রটা সহসা কাহার হস্তে পড়িয়া গোলমাল হইয়া গিয়াছে. ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের শিরাগুলা টন্‌টন্ করিয়া উঠিত, তাহার উদাস হৃদয়খানা কংসাবতীর শীতল জলতলে শয়ন করিয়া জুড়াইবার নিমিত্ত অস্থির হইত; কিন্তু অমনই কোথা হইতে একটা মর্ম্মভেদী সকরুণ স্বর তাহার কানে বাজিত, "এর শোধ চাই, এর শোধ চাই!" সহসা তাহার সম্মুখে অতীতের স্মৃতির একখানি চিত্র ফুটিয়া উঠিত। সে দেখিত, তাহার সম্মুখে মৃত্যুশয্যায় শুইয়া হানিফ যেন তেমনই ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে, "বাপজি! বড় মেরেছে, এর শোধ চাই!" প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর করালচ্ছায়াব্যাপ্ত মুখখানি অতীতের অন্ধকার ঠেলিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিত, স্ত্রীর উচ্চ হাহাকার শুনিতে পাইত, তাহার অন্তিম শয্যা মনে পড়িত। অমনই রহমত উঠিয়া দাঁড়াইত, তাহার বৃদ্ধ হৃদয়ের শীতল রক্তস্রোত উত্তপ্ত হইয়া শিরায় শিরায় ছুটিত, নয়নে প্রতিহিংসাবহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। সে উন্মাদের ন্যায় শূন্য গৃহপানে ছুটিত। মুক্ত বায়ু তাহার পশ্চাতে হো হো শব্দে উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া উঠিত।

(৬)

তুমি সুখেই থাক আর দুঃখেই থাক, দিন চলিয়া যাইবে। অনন্ত কালস্রোত অনন্ত হইতে আসিতেছে, অনন্তে মিশিতেছে। সে অবাধ স্রোতে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-নিরানন্দ সকলই ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া যাইতেছে; স্রোতের নিবৃত্তি নাই। সে অনন্ত কাল হইতে আপন মনে তর-তর-বেগে বহিয়া যাইতেছে, এবং যাইবে। কোন বাধা মানিবে না, কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। সে স্রোতে এক একটি বুদ্বুদ উঠিয়া কত সংসার গড়িতেছে, আবার স্রোতের বুদ্বুদ স্রোতে মিশাইয়া কত সংসার ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু স্রোতের গতির বিরাম নাই। নাই বলিয়া তুমিও সুখী, তোমার দিন কাটে, আর আমি দুঃখী, আমারও দিন কাটে। তাই অতি দুঃখী রহমতেরও দিন কাটিতে লাগিল। দুই এক দিনে নয়—দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল, হৃদয়ে প্রতিহিংসার জ্বলন্ত-বহ্নি জাগাইয়া রহমত দুইটি বৎসর কাটাইল, কিন্তু প্রতিহিংসা-সাধন তো হইল না।

কতদিন সে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে; নায়েবের উষ্ণরক্তে হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, ভৈরব ঘোষের জীবন দিয়া হানিফের অন্তিম আকাঙ্ক্ষা—শেষ ঋণপরিশোধের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু পারে নাই, হৃদয় অগ্রসর হয় নাই। কতদিন

প্রভাতে সে তাহার নিরানন্দময় দগ্ধ গৃহদ্বারে বসিয়া দেখিয়াছে, নায়েব মহাশয় গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া সদর্প পদক্ষেপে নদীতীর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে তাহার সম্মুখে পদচারণ করিতেছেন; দেখিয়া তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার দারুণ পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, পুত্র-শোকের প্রবল বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয়কে উন্মাদ করিয়াছে; অমনই তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি ভিত্তিগাত্রে দণ্ডায়মান সুপক দীর্ঘ বংশযষ্টির উপর পতিত হইয়াছে। ইচ্ছা—তাহার এক আঘাতেই নায়েব মহাশয়ের নায়েবী জীবন শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু পারে নাই, তাহার হৃদয়ের সঙ্কল্প হৃদয়েই বিলীন হয়। কোন্ এক অজ্ঞাত মন্ত্রশক্তি আসিয়া তাহার হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; হাত উঠে না, পা অগ্রসর হয় না, সে কেবল মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গমের ন্যায় অন্তরে অন্তরে গর্জ্জিতে থাকে, ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরে।

একদিন রহমত দেখিল, নায়েব মহাশয়ের দ্বাদশ-বর্ষীয় পুত্র নির্জ্জন নদীঘাটে একা স্নান করিতেছে। স্নান করিতে করিতে বালক সাঁতরাইতেছে, ডুবিতেছে, উঠিতেছে, আবার সাঁতরাইয়া দূরে যাইতেছে। রহমত দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইহা দেখিল, ভাবিল, এই তো অবসর, হানিফের ঋণশোধের এই তো শুভ সুযোগ। পাপিষ্ঠ ভৈরব ঘোষকে শাস্তি দিবার এই তো উত্তম সময়। রহমত দুই পদ অগ্রসর হইল, একবার দাঁড়াইল, একবার জলক্রীড়ানিরত বালকের পানে চাহিল, তার পর বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের পানে ছুটিল। হায় পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধ!

( ৭ )

বর্ষাকাল। গতরাত্রিতে নদীতে বান পড়িয়াছে। কংসাবতী কূলে কূলে পুরিয়া উঠিয়াছে, প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তীরে আঘাত করিতেছে। বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া, শরবনের উপর দিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে প্রখর স্রোত চলিয়াছে, জল তীরের মত ছুটিয়াছে। সে স্রোতে কুটা পড়িলে ছিঁড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে আবর্ত্ত উঠিতেছে, জল ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, ফিরিয়া আবার ছুটিতেছে, তাহাতে রাশি রাশি ফেনা উঠিতেছে। উন্মাদিনীর ন্যায় কংসাবতী ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটিয়াছে। পারাপার বন্ধ। মাঝিরা মোটা মোটা কাছিতে অশ্বত্থ-গাছে নৌকা বাঁধিয়া বসিয়া আছে।

প্রাতঃকাল হইতে রহমত নদীতীরে বসিয়া কংসাবতীর এই উন্মাদ নৃত্য দেখিতেছে। নিকটেই তাহার ভগ্নপ্রায় নৌকাখানা পড়িয়া রহিয়াছে। এতদিন একেবারেই লক্ষ্য রহমত তাহার দিকে চাহিয়া দেখে নাই। কিন্তু আজ দেখিল, কংসাবতীর খরস্রোত সেই নৌকাখানাকে বেড়িয়া দুই পাশ দিয়া ছুটিতেছে। একটা অবিশ্রান্ত কল কল ধ্বনি উঠিতেছে। তরঙ্গা-ঘাতে নৌকাখানা এক একবার নড়িতেছে, বুঝি নৌকা-কেও বিচলিত করিতেছে। রহমত বসিয়া দেখিতে লাগিল; একটা কঠোর স্মৃতির আঘাতে তাহার উদাস হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। সে কতদিন কংসাবতীর যৌবনের এইরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে। এই-রূপ সময়ে কতদিন সে হানিফের সহিত এই ক্ষুদ্র নৌকা-খানিতে বসিয়া কংসাবতীর তরঙ্গময় বক্ষে নৃত্য করিয়াছে। কতদিন খরস্রোতে তাহাদের নৌকাখানা বহুদূরে ভাসিয়া গিয়াছে, আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবু ডুবু হইয়াছে, ভয়ে হানিফ পিতাকে নৌকা ফিরাইতে বলিয়াছে, কিন্তু রহমত নৌকা ফিরায় নাই। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্ত্ত হইতে আবর্ত্তান্তরে পড়িয়াছে, তাহার উপরে জল উঠিয়াছে, আতঙ্কে হানিফ দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে; অমনই রহমত হাসিয়া সুকৌশলে নৌকাকে তীরসংলগ্ন করিয়াছে। তখন হানিফ হাসিতে হাসিতে আবার গিয়া দাঁড় ধরিয়াছে। আজিও সম্মুখে সেই কংসাবতী, সেইমত তাহার উদ্দাম নৃত্য, সম্মুখে সেই নৌকা, বসিয়া সেই রহমত, কিন্তু আজি হানিফ কোথায়? সে হানিফ আর নাই, হৃদয়ে আর সাহস নাই; নৌকা এখন ভগ্ন, গৃহ এখন শূন্য, সংসার এখন অন্ধকার। সবই আছে; কিন্তু রহমতের সম্মুখে আজি ঘোর অন্ধকার। সে অন্ধকারের একটা কঠোর পেষণে তাহার বুকের হাড়গুলা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

( ৮ )

রহমত যেখানে বসিয়াছিল, তাহার অনতিদূরেই পার-ঘাট। নায়েব মহাশয় পুত্রের সহিত সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে দুইজন পাইক, পাঁচ ছয় জন অনুগত প্রজা। নায়েব মহাশয়ের গৃহিণীর পীড়া, এই সংবাদ লইয়া কল্য তাঁহার মধ্যম পুত্র তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে। এজন্য অদ্য তিনি বাটী গমন করিতেছেন। নদীতে বান আসিয়াছে, ইহা তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এই সামান্য কারণে গৃহিণীর পীড়ার সংবাদকে উপেক্ষা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। বিশেষতঃ তিন চারিদিনের মধ্যে বানের তেজ কমিবে না, ইহা তিনি জানিতেন। অগত্যা তাঁহাকে নিজ জীবনের উপর একটু আশঙ্কা সত্ত্বেও যাত্রা করিতে হইল।

নদীর বান দেখিতে গ্রামের অনেক লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। নায়েব মহাশয়কে দেখিয়াই

তাহারা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। দিনু মাঝি শক্ত কাছিতে খেয়া নৌকাটিকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া, নিকটে হারু মুদির দোকানের রোয়াকে বসিয়া তামাক টানিতেছিল এবং তৎপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন লোকের নিকট গত বৎসর এইরূপ বানের মুখে কিরূপ সাহসের সহিত সে একনৌকা আরোহীকে পার করিয়া মাঝি-গিরির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল, তাহারই গল্প বলিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছিল। সহসা নায়েব মহাশয়ের শুভাগমন দেখিয়া সে ব্যস্তে হুঁকা ফেলিয়া উঠিয়া নায়েব মহাশয়কে একটা প্রণাম করিল। নায়েব মহাশয় তাহাকে শীঘ্র পার করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দিনু একবার মুখ সিঁটকাইয়া নায়েব মহাশয়ের হুকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত হইল। অন্য কেহ হইলে নৌকার কাছি কখনই খুলিত না, কিন্তু নায়েব মহাশয়ের হুকুম অমান্য করে কাহার সাধ্য। অগত্যা নৌকাটিকে টানিয়া আনিল; নিজে গিয়া হালে বসিল। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরি আসিয়া দাঁড় ধরিল, কিন্তু সে একবারে সকলকে পার করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। কাজেই প্রথমে নায়েব মহাশয়ের পুত্র ও একজন পাইক নৌকায় উঠিল। নায়েব মহাশয় সেইখানে হারু মুদীর আনীত একটা কেরাসিনের বাক্সের উপর বসিয়া নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দিনু একবার দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাকিয়া গঙ্গাদেবীকে স্মরণ করিতে করিতে নৌকা খুলিয়া দিল। স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়া চলিল; রহমত কঠোর দৃষ্টিতে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল।

স্রোতের বেগে হেলিয়া দুলিয়া নৌকা চলিল। তাহার দুই পাশ দিয়া খল্‌-খল্ ছল্‌-ছল্ শব্দে জল ভাঙ্গিতে লাগিল। দিনু শক্ত করিয়া হাল ধরিল, হরি প্রাণপণে দাঁড় বাহিতে লাগিল। সম্মুখেই একটা ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত। দিনু অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু রাখিতে পারিল না, নৌকা বেগে গিয়া সেই আবর্ত্তে পড়িল। তীর হইতে সামাল্ সামাল্ শব্দ উঠিল। দিনু সবলে হাল চাপিয়া ধরিল। অমনই কট্ কট্ শব্দে হালের দড়ি কাটিয়া গেল, নৌকা একপাক ঘুরিয়া পড়িল। তার পর পাগলের মত নাচিয়া নাচিয়া নৌকাখানা স্রোতের মুখে তীরবেগে ছুটিল। সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিল। নিকটেই একটা অর্দ্ধমগ্ন তালবৃক্ষ দাঁড়াইয়া ছিল। নৌকা বেগে গিয়া তাহাতে প্রচণ্ড হইল, একবার ওপাশে হেলিয়া নৌকা ডুবিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে পুত্রের রক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন; পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কেহই অর্থলোভে কংসাবতীর সেই খর স্রোতে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল না। দেখিতে দেখিতে নৌকা ডুবিয়া গেল। দাঁড়ী, মাঝি, পাইক সন্তরণকৌশলে স্রোতে ভাসিয়া চলিল, নায়েব মাটীতে আছড়াইয়া পড়িলেন।

যেখানে রহমত বসিয়াছিল, তাহার ঠিক সম্মুখেই নৌকাখানা ডুবিল। রহমত দেখিল, নৌকা নায়েব মহাশয়ের পুত্রের সহিত ডুবিয়া গেল। অমনই সে "হা আল্লা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর দ্রুতপদে গিয়া জলে পড়িল। কিন্তু কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ পরে ঘাট হইতে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, যেখানে নৌকা ডুবিয়াছিল, তাহার কিয়দ্দূরে দুইটা মাথা ভাসিয়া উঠিয়াছে। সকলে সোৎসুক দৃষ্টিতে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে মাথা দুইটা তীরের নিকটবর্ত্তী হইল। নায়েব মহাশয় সেই দিকে ছুটিলেন, জনমণ্ডলীও আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ চলিল।

নিকটে গিয়া নায়েব মহাশয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, তাঁহার পুত্রের উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহ নহে—রহমত। তাঁহারই অত্যাচার-প্রপীড়িত, তাঁহারই হৃদয়হীন কঠোর পীড়নে পুত্রহীন রহমত তাঁহার পুত্রের অচেতন দেহ বক্ষে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ শত্রুতনয়ের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া নদীর খরস্রোতে ঝাঁপ দিয়াছে। নায়েব মহাশয়ের হৃদয়ে এককালে শত বৃশ্চিকের দংশনযাতনা উপস্থিত হইল, কে যেন একটা তীক্ষ্ণাগ্র শেল লইয়া তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। রহমত তাঁহার পুত্রের অচেতনপ্রায় দেহ ধীরে ধীরে তাঁহার পদতলে রাখিল, তাহার পর চীৎকার করিয়া বিকৃত-কণ্ঠে বলিল, "আজ আমার হানিফের ঋণশোধ।" সঙ্গে সঙ্গে কংসাবতীও প্রতিধ্বনি তুলিয়া যেন উত্তর দিল, "শোধ"; সে উত্তর নায়েব মহাশয়ের হৃদয়ে এককালে শত বজ্রের আঘাত করিল।

নায়েব মহাশয়ের পুত্র রক্ষা পাইল। কিন্তু সেই দিন হইতে রহমতকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

ইহার পর হইতে যখনই কংসাবতীতে বান আসিত, তখনই নায়েব মহাশয় শুনিতেন, যেন তাহার প্রখর প্রবাহ হইতে ভীমনাদে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, "শোধ!" যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন মধ্যে মধ্যে এই ধ্বনি শুনিতেন, শুনিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেন।

# দুর্ব্বাসা ঠাকুর

তেঁতুলবেড়ের সাতকড়ি ঘোষাল ওরফে সাতুঠাকুরকে লোকে দুর্ব্বাসা ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। অবশ্য, দুর্ব্বাসা ঠাকুরের ক্রোধাগ্নিতে কেহ যে কখনও ভস্মীভূত হইয়াছে, এমন কথা শুনা যায় নাই; তথাপি তাঁহার দ্বিতীয় রিপুটা খুব প্রবল না হউক, তাহা এত সহজেই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিত যে, তাহাতে মহামুনি দুর্ব্বাসাও অনেক সময়ে বোধ হয় লজ্জা অনুভব করিতে পারিতেন। সাতুঠাকুর কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেন না; বরং আর পাঁচটা রিপুকে বশে আনিয়া এই রিপুটাকেই সকলের উপর প্রাধান্য দান করিতেন।

আশা, সাতুঠাকুর চিরদিনই দুর্ব্বাসার এই প্রচণ্ড ক্রোধ লইয়া সংসারটাকে ভস্ম করিবার জন্য উদ্যত হইতেন, তাহা নহে। এতদিন সংসারের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতও তাঁহার সহিষ্ণুতাকে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যু, মহাজনের উৎপীড়ন, জ্ঞাতিদিগের দুর্ব্ব্যবহার, গ্রামের লোকের হৃদয়হীনতা, এ সকলই তিনি সহাস্যমুখে সহ্য করিয়া সংসারের নিকট আপনার সবলতা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং গোপনে শুধু বিশ্বনাথের চরণে আপনার মর্ম্মবেদনা জানাইয়া আসিতেছিলেন।

সাতুঠাকুর পুরুষানুক্রমে গ্রামদেবতা বিশ্বনাথের সেবায়েত। লোকে বলিত, বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ নহেন, স্বয়ম্ভূ; বহুদিন পূর্ব্বে এখানে তুঁতগাছের ক্ষেত ছিল। জমীতে চাষ দিতে দিতে শিবলিঙ্গ উত্থিত হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার মাথায় লাঙ্গলের ফলার চিহ্ন দেখা যায়। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ন'পাড়ার হাজরারা ইঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বর্দ্ধমানের মহারাজ ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সে মন্দির এক্ষণে জীর্ণ, হাজরারা নির্ব্বংশ এবং ভূসম্পত্তি স্বল্প-মাত্রাবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু দেবতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কাহারও ধারণা বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। সাতুঠাকুর ইঁহাকে স্বয়ং কৈলাসবাসী মহাদেব বলিয়াই জানিতেন এবং তদনুরূপ ধারণা লইয়াই নয় বৎসর বয়স হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বনাথের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। শুধু সেবাই করিতেন না, ইঁহাকেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা জানে, দুর্ব্বল প্রজা যেমন প্রবলের অত্যাচার-কাহিনী রাজার নিকট নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তেমনই সংসারের যত অত্যাচার অবিচার সকলই এই জগৎপতির চরণে নিবেদন করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতেন।

দেবোত্তর জমী যাহা ছিল, পৈতৃক ঋণের দায়ে মহাজন তাহার অধিকাংশ বেচিয়া লইল। অনেকে পরামর্শ দিল, "সাতুঠাকুর, দেবোত্তর জমী কেউ বেচে নিতে পারে না। তুমি মামলা কর, ফেরত পাবে।"

সাতুঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিল, "এখানে ফেরত পেতে পারি, কিন্তু বিশ্বনাথের আদালতে তো পাব না।"

জমী যাহা রহিল, তাহাতে কষ্টে দিন চলিতে লাগিল। এমন সময় গ্রামের গোপী মুখুয্যে মারা গেলে তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটা গোল উঠিল। গোপীনাথ নাকি কলিকাতায় বেশ্যামহলে পৌরোহিত্য করিতেন, এবং তাহারই ফলে তিনি অনেকগুলি পয়সা রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং সমাজের কেহই গোপী মুখুয্যের শ্রাদ্ধে পাতা পাতিতে চাহিলেন না। পরিশেষে তদীয় পুত্র সামাজিকগণকে যথেষ্ট প্রণামী দিয়া এই দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিল। সকলেই তাহার বাড়ীতে গেল, কেবল সাতুঠাকুর গেলেন না; বলিলেন, "বেশ্যাযাজীর অন্নগ্রহণ ক'রে, সে হাতে বিশ্বনাথের মাথায় ফুল দিতে পারবো না।" সামাজিকগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সাতুঠাকুর আপনার জেদ ছাড়িলেন না। ইহার ফলে সামাজিকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিলেন। সাতুঠাকুর কিন্তু ইহাতে ভীত বা দুঃখিত হইলেন না।

কিন্তু সেই দিন ভীত হইলেন, যে দিন স্ত্রী রোগশয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, অথচ একজন ডাক্তার বা একবিন্দু ঔষধ খুঁজিয়া পাইলেন না। তার পর কেবল বিশ্বনাথের চরণামৃত খাইয়া তিন বছরের ছেলে বিশুকে স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া স্ত্রী যখন পরলোকের পথে যাত্রা করিল, তখন সাতুঠাকুর এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না, যাহার কাছে ছেলেটিকে রাখিয়া স্ত্রীর সৎকারের চেষ্টা করেন। পরিশেষে মদন সর্দ্দারের কাছে ছেলেকে রাখিয়া, কয়েক

জন ইতর লোকের সাহায্য লইয়া, পত্নীর দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিলেন।

তার পর সেই মাতৃহীন শিশু—সংসারের একমাত্র অবলম্বন বিশুকে কিরূপে মানুষ করিবেন—ভাবিয়া আকুল হইলেন। জ্ঞাতি বিধু ঘোষাল বলিলেন, "ছেলেটাকে বিলিয়ে দাও হে সাতকড়ি। আমার পিসতুতো ভাই কালী পুষ্যিপুত্র নেবার চেষ্টা কর্‌ছে, বল তো তাকে খবর দি।"

সাতুঠাকুর ইহাতে মত দিলেন না। স্ত্রীর শেষ গচ্ছিত ধন, পিতৃপুরুষের একমাত্র পিণ্ডস্থল, সংসারে মায়া-মমতার আধার,—সেই পুত্রকে বিলাইয়া দিবেন? তবে আর কাহাকে লইয়া সংসারে থাকিবেন? না না, বিশুকে তিনি যেরূপে পারেন, মানুষ করিবেন।

তাঁহার এক বিধবা শ্যালিকা ছিল। তাহাকে আনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে তিনি ছেলেটার প্রতিপালনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু আর এক দিকে বড় গোল বাধিল। বিধবা যুবতী শ্যালিকাকে ঘরে আনিয়া রাখায় পাঁচ জনে পাঁচ কথা কহিতে লাগিল। পরিশেষে এমন হইল যে, গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই বাঁকিয়া বসিল। অনেকেই বলিতে লাগিল, "সাতুঠাকুর গ্রামের বুকের উপর বসিয়া যদি এমন গর্হিত কাজ করেন, তবে তাঁহাকে বিশ্বনাথের মন্দিরে উঠিতে দেওয়া হইবে না।"

(২)

এক দিকে পুত্র, অন্য দিকে বিশ্বনাথ, সাতুঠাকুর কোন্ দিক্ রাখিবেন—ভাবিয়া আকুল হইলেন। কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিবারও অবসর পাইলেন না। সেই দিনই পূজা করিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে গ্রামের পাঁচ জন প্রধান সমবেত হইয়াছে। তাহারা সাতুঠাকুরকে বাধা দিয়া বলিল, "ঠাকুর, হয় বিধবাটাকে ত্যাগ কর, নয় তো আমরা অন্য ব্রাহ্মণ দিয়া পূজা করাইব।"

প্রসন্ন সরকার সদম্ভে বলিয়া উঠিল, "করাব কি, আমি বিধু ঘোষালকে স্নান ক'রে আসতে বলেছি, আজ থেকে সে পূজা করবে।"

সাতুঠাকুর স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি থাকিতে বিধু আসিয়া বিশ্বনাথের পূজা করিবে? সে পূজার কি জানে? গাঁজা খায়, গয়লা-পাড়ায় গিয়া পড়িয়া থাকে, আচার-বিচারের ধার ধারে না; তাহার হাতে কি বিশ্বনাথ পূজা গ্রহণ করিতে পারেন? তাহার স্পর্শে অশুচির আশঙ্কায় দেবতা যে মন্দির ছাড়িয়া পলায়ন করিবেন। দেবতাকে যে উপবাসী থাকিতে হইবে? উঃ, কিসের সংসার, কিসের মমতা! তিনি স্নেহের অনুরোধে দেবতার এই কষ্ট চোখে দেখিবেন! দেবতার উপর পুত্রকে স্থান দিয়া আপনার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবেন?

মুহূর্ত্তে সাতুঠাকুর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন এবং শ্যালিকাকে ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

স্নেহের উপর ভক্তিকে স্থান দিয়া সাতুঠাকুর শ্যালিকাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পুত্রকে রাখিতে পারিলেন না। লোকে বলিল, "ঠাকুর, ছেলেটা যে যায়, ওর দিকে চেয়ে দেখ।" সাতুঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বিশ্বনাথ দেখবেন।"

বিশ্বনাথের জন্যই তিনি যখন ছেলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপায়টা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন বিশ্বনাথই তাহাকে রক্ষা করিবেন। মানুষের কৃতজ্ঞতা নাই বলিয়া দেবতাও কি অকৃতজ্ঞ হইবেন? এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সাতুঠাকুর নিশ্চিন্ত রহিলেন।

দেবতা কিন্তু দেখিলেন না। তাঁহার চরণামৃত, তাঁহার প্রসাদ, কিছুই ছেলেটাকে রক্ষা করিতে পারিল না। জ্বরে, যকৃতের পীড়ায় জীর্ণ হইয়া বিশু একদিন পিতার কোলেই চক্ষু মুদ্রিত করিল। সাতুঠাকুর নিজের হাতে পুত্রের চরম সৎকার সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। তার পর শ্মশান হইতে ফিরিবার পথে মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যে ভীমগর্জ্জনে "বিশ্বনাথ!" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণের সে রুদ্রগর্জ্জনে রুদ্রদেবের প্রাণ বিচলিত না হইলেও তাঁহার মন্দিরটা যেন থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

পাথরে ঠাকুর! তোমার মধ্যে দেবতার সত্তা বুঝি এতটুকুও নাই! উঃ, এতকাল কি গ্রামের সমস্ত ভক্তি-প্রীতি দিয়া একটা চেতনাশূন্য জড় পাথরের সেবা করিয়া আসিলাম? সাতুঠাকুরের ইচ্ছা হইল, এই পাথরটাকে টানিয়া তুলিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দেন। কিন্তু না, তুমি থাক ঠাকুর; এতকাল ভক্তি দিয়া যে ভুল করিয়াছি, এবার অভক্তি দিয়া, অবজ্ঞা দিয়া তাহার শোধ দিব।

সেই দিন হইতে মহিম্নঃস্তোত্রের সুমধুর সঙ্গীতে মন্দির আর মুখরিত হইত না, শিবাষ্টকের সুমধুর আবৃত্তি শুনিয়া কেহ মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইত না। সাতুঠাকুর পূজা করিতে আসিয়া কেবল শিবের মাথায় এক ঘটী জল

চাপিয়া দিতেন, তার পর বোঁটা সমেত কতকগুলা বেল-পাতা চাপাইয়া দিয়া চালগুলা বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেন; কোন দিন বা বেলপাতাগুলা চাপাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া যাইতেন। ওহো, বেলপাতার বোঁটা শিবের মাথায় যে বজ্রের আঘাত দেয়। সাতুঠাকুর তাড়াতাড়ি সেগুলাকে পুষ্পপাত্রে ফেলিয়া এক একটি করিয়া বোঁটা কাটিতে বসিতেন। কিন্তু তখনই মনে হইত, কেন বৃথা এই পণ্ডশ্রম। পাথরের কি প্রাণ আছে যে, সে আঘাতের বেদনা অনুভব করিতে পারিবে? যদি পারিত, তবে আজ কি তাঁহাকে পুত্র-শোকের—রোষে সাতুঠাকুরের চোখ দুইটা জলিয়া উঠিত; কম্পিতহস্তে বৃন্তহীন ও সবৃন্ত বেলপাতাগুলা এক সঙ্গে তুলিয়া লইয়া শিবের মাথায় চাপাইয়া দিতেন। কেমন ঠাকুর, বোঁটাগুলার আঘাত তোমাকে লাগে কি? তাহাতে কি তোমার কষ্ট অনুভব হয়? যদি তুমি শুধু পাথর না হও, যদি তোমার ঐ প্রতিমূর্ত্তির কোনখানে চেতনার একটুও আভাস থাকে, সে আভাস আছে নিশ্চয়; না না, তুমি শুধু জড় পাথর নও, দেবতার সত্তা তোমার মধ্যে আছেই আছে, আর এই বিল্বপত্রের বৃন্তের আঘাত নিশ্চয় তোমার মস্তকে বজ্রের আঘাত দিতেছে। তথাপি আমি জানিয়া শুনিয়াও—ওহো দেবতা!

সাতুঠাকুরের দুই চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল গড়াইত; কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি প্রস্তরময় মন্দিরতলে লুটাইয়া পড়িতেন।

কেহ যদি কোন দিন পূজার সময় আসিয়া বলিত, "ঠাকুর, আমার ছেলের বড় ব্যামো, বাবাকে মানত কর, ভাল হ'লে বাবাকে ষোল আনা দিয়ে যাব।" তাহা হইলে সাতুঠাকুর ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিতেন, ছাই দিবি! ছেলের ব্যামো হয়ে থাকে, ডাক্তার দেখা, বদ্যি দেখা। বাবা তোর ছেলেকে ভাল করবার তরে এখানে ব'সে আছে আর কি?

তাঁহার সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া লোকের মুখ দিয়া কথা সরিত না; ভয়ে ভয়ে দুর্ব্বাসা ঠাকুরের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিত।

(৩)

"তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মিয়াদে,
সংসার-গারদে থাকি বল্।"

একটা বৃষ্টিশূন্য ঘোলাটে মেঘ আসিয়া ফাল্গুনের অপরাহ্ণটাকে বড়ই বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছিল; দক্ষিণে বাতাসটাও সেদিন ছিল না, উত্তরে বাতাসে একটু একটু শীতের সঙ্গে কেমন যেন একটা অস্বচ্ছন্দ-ভাব আনিয়া দিতেছিল। সাতুঠাকুর ময়লা বনাতখানা জড়াইয়া বাড়ীর বাহিরে ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন—

"তারা, কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মিয়াদে,
সংসার-গারদে থাকি বল্।"

"বামুন জেঠা!"

সাতুঠাকুর গান ছাড়িয়া ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, প্রসন্ন সরকারের ছেলে হাবু। বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া সাতুঠাকুর মুখ ফিরাইয়া লইলেন। হাবু কিন্তু তাঁহার বিরক্তিটুকু আদৌ গ্রাহ্য করিল না, সে আর একটু সরিয়া আসিয়া সহাস্যমুখে পুনরায় ডাকিল, "বামুন জেঠা!"

গম্ভীরস্বরে সাতুঠাকুর উত্তর দিলেন, "কেন?"

"বাত্তা (বাতাসা) দেবে না?"

"না, বাতাসা নাই।"

সাতুঠাকুর তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সে কঠোর দৃষ্টিতে ভীত হইয়া হাবু ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সতুঠাকুর অন্যদিকে মুখ রাখিয়া পুনরায় অনুচ্চকণ্ঠে গান ধরিলেন —

"আমার বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধ'রে খাই হলাহল।"

হঠাৎ হাবুর দিকে ফিরিয়া পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

শঙ্কাজড়িতস্বরে "যাই" বলিয়া হাবু তাঁহার দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎপদ হইল। সাতুঠাকুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রসন্ন সরকারের এই ছেলেটা প্রায় প্রত্যহই আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিত। এই প্রসন্ন সরকারই একদিন তাঁহাকে বিশ্বনাথের সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল। সে কথাটা সাতুঠাকুর আজিও ভুলেন নাই এবং সুযোগ পাইলে তিনি যে একদিন আপনার পুত্রশোকের প্রতিশোধ লইবেন, এমন একটা কল্পনাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই প্রসন্ন সরকারের ছেলে আসিয়া যে প্রত্যহ তাঁহাকে বিরক্ত করিবে, ইহা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কিন্তু সেই যে এক দিন তিনি বাড়ীর সামনে হাবুকে খেলা করিতে দেখিয়া তাহাকে প্রসন্ন সরকারের ছেলে বলিয়া না জানিয়াই তাহার হাতে খানকতক বাতাসা দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে হাবু যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সেই দিন হইতে

হাবু প্রায় প্রত্যহই দিবসের কোন না কোন এক সময়ে বামুন জেঠার নিকট উপস্থিত হইত এবং তাঁহার ক্রোধ ও বিরক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বাতাসা সন্দেশ আদায় করিয়া লইত।

শত্রুর পুত্র জানিলেও সাতুঠাকুরকে হাবুর জন্য বাতাসা সন্দেশ গুছাইয়া রাখিতে হইত। নতুবা ছেলেটা বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলে; পাছু পাছু ফেরে, ধমক দিলে কাঁদিয়া ফেলে। কাজেই তাহার আবদার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য সাতুঠাকুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজে না খাইয়া মিষ্টান্নগুলা তুলিয়া রাখিতেন এবং হাবু আসিলে তাহার হাতে সেগুলা দিয়া যেন একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি পাইতেন। কোন দিন যদি হাবু না আসিত, তাহা হইলে দিবা-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাতুঠাকুর বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেন। তার পর হয়তো হঠাৎ সচকিত-ভাবে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া আসিতেন এবং আপনার এই অকারণ উদ্বেগে আপনিই লজ্জিত হইয়া পড়িতেন।

সে দিন কিন্তু হাবু বামুন জেঠার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কঠোরতা দেখিতে পাইল যে, ভয়ে সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল, এবং যাইতে যাইতে এক একবার পিছনে ফিরিয়া বামুন জেঠার মুখের কঠোর ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে কি না, ইহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই রূপে সে খানিকটা দূরে গেলে সাতুঠাকুর হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন্।"

হাবু থমকিয়া দাঁড়াইল। সাতুঠাকুর এবার স্বরে একটু কোমলতা আনিয়া বলিলেন, "দাঁড়ালি যে, আয়।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া বাড়ী ঢুকিলেন। হাবু সাহস পাইয়া হাসিমুখে তাঁহার পিছনে আসিল।

সাতুঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া শিকা হইতে বাতাসার হাঁড়ি পাড়িতে পাড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'খানা নিবি?"

হাবু হাত পাতিয়া বলিল, "দুখানা।"

"মোটে দুখানা!" বলিয়া সাতুঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া তাহার হাতে এক মুঠা বাতাসা দিলেন। বাতাসা পাইয়া হাবুর মুখে হাসি ফুটিল; সে আহ্লাদে গা দোলাইতে দোলাইতে সেগুলার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। সাতুঠাকুর প্রসন্নদৃষ্টিতে তাহার উল্লাসসূচক অঙ্গভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "আর চাই?"

হাতের অবশিষ্ট বাতাসাগুলা একেবারে মুখে ফেলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাবু বলিল, "হুঁ।"

সাতুঠাকুর এবার দুইটা সন্দেশ লইয়া তাহার দুই হাতে দিলেন। সন্দেশ পাইয়া হাবু আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল; উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল, দুতো অন্দে, বা বা!"

সাতুঠাকুর তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "লাফাস না, খেয়ে ফেল।"

হাবু সাগ্রহদৃষ্টিতে একবার সন্দেশ দুইটার দিকে চাহিয়া সাতুঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি থন্দে কাবে না বামুন জেথা?"

সহাস্যে সাতুঠাকুর বলিলেন, "আমি আর কি খাব বল্, আর তো নাই।"

হাবু তাঁহার দিকে একটা হাত বাড়াইয়া দিয়া গ্রীবা আন্দোলনপূর্ব্বক বলিল, "তবে এত্তা তুমি কাও, এত্তা আমি কাই।"

সাতুঠাকুরের মুখখানা প্রীতিভরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাবুর মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া স্নেহসরসকণ্ঠে বলিলেন, "না রে বোকা, আমি খেয়েছি, তুই খা।"

"কেয়েতো? থত্যি?"

"হাঁরে হাঁ, তুই খা তো।"

হাবু এবার বিনা বাক্যব্যয়ে সন্দেশ দুইটা উদরস্থ করিল। তার পর সে সাতুঠাকুরের কাছে বসিয়া, আজ সে কাহার সঙ্গে খেলিয়াছে, ঘোষেদের মেনীর সঙ্গে কেন আড়ি দিয়াছে, কাল সকালে তাহার সঙ্গে ভাব করিবে কি না, ইত্যাদি গল্প আরম্ভ করিল। ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া ধরণীর বুকে পড়িলে হাবু চলিয়া গেল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারটা যেন আরও গাঢ় হইয়া উঠিল। সাতুঠাকুর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথের আরতি দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার বিশু আর এই হাবু নাকি সমবয়স্ক। উভয়ে একই দিনে একই সময়ে জন্মিয়াছিল। কিন্তু একই তিথিতে একই লগ্নে জন্মিয়া বিশু কবে চলিয়া গেল, আর হাবু দিনে দিনে কত বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিশু বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে সেও ঠিক এমনটিই হইত। সমগ্র অন্তর-প্রদেশে তীব্র মোচড় দিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস এমনই বেগে বাহির হইল যে, তাহাতে হাতের জলন্ত পঞ্চপ্রদীপটা নিবিয়া গেল। সাতুঠাকুর পুনরায় তাহা জ্বালিয়া লইয়া আরতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার কি বিচার! যে প্রসন্ন সরকার অনাচারী বিধু ঘোষালের হাত দিয়া পূজা খাওয়াইতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার ছেলের কোন আপদ্-বালাই নাই। আর যে সন্তানের সুখদুঃখকে গ্রাহ্য না করিয়া দেবতাকে এই লাঞ্ছনার হাত হইতে

রক্ষা করিল, তাহাকে আজ পুত্রশোকে হায় হায় করিতে হইতেছে। উঃ, দেবতা কি নির্লজ্জ! সাতুঠাকুরের ইচ্ছা হইল, হাতের জলন্ত পঞ্চপ্রদীপটা নির্লজ্জ দেবতার মাথায় আছড়াইয়া দিয়া এই তীব্র অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সাতু ঠাকুর দাঁতে দাঁতে চাপিয়া জলন্তদৃষ্টিতে দেবতাকে যেন ভস্ম করিতে উদ্যত হইলেন।

( ৪ )

সারাদিনটা কাটিয়া গেল। , গোধূলির ধূসর ছায়ায় আকাশের ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিতেছে। আর একটা পাখীকেও উড়িতে দেখা যায় না। হাবু কৈ আজ আসিল না। সাতুঠাকুর যত পারিলেন, দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করিয়া পথের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ না কে আসিতেছে? না, ঘোষেদের নেপা! আজ আর সে আসিবে না। নাই বা আসিল, তাহাতে কি? কিছুই না। তবে ছেলেটা দোষে গুণে ভাল, বড় মায়াবী। নতুবা কোন্ ছেলে আবার হাতের সন্দেশ অপরকে দিতে চায়? আহা! বালক কি না, মনে খলকপটতা কিছুই নাই। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বড় হইয়াও ছেলেটা বাপের মত নিষ্ঠুর হইবে না। আজ পাঁচটা সন্দেশ ছিল, নিজে জল খাইবার সময় একটাও খাইতে পারেন নাই, বাতাসা খাইয়া সন্দেশগুলি তুলিয়া রাখিয়াছেন। হাবু আসিলে খাইত। যখন আসিল না—থাক, কাল আসিয়া খাইবে। আর না;—বিশ্বনাথের আরতির সময় হইয়াছে। সাতুঠাকুর আর একবার প্রসারিত-দৃষ্টিতে সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে ঢাকা পথের দিকে চাহিলেন। তার পর ভ্রুকুটী করিয়া উঠিয়া উত্তরীয়-খানা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইলেন।

পরদিনও হাবু আসিল না। উৎকণ্ঠায় সমস্ত অপরাহ্নটা অতিবাহিত করিয়া সাতুঠাকুর যখন বিশ্বনাথের আরতি করিতে যাইতেছিলেন, তখন প্রসন্ন সরকারের মেজো ছেলে আশু ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া আসিতেছিল। সাতুঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার ওষুধ রে আশু?"

আশু বলিল, "হাবুর।"

চমকিতভাবে সাতুঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার কি হয়েছে?"

আশু বলি, "পরশু রাত হ'তে খুব জ্বর হয়েছে, বুকে সর্দ্দি বসেছে। ডাক্তার বল্ছে—"

"নিমোনিয়া নাকি?"

"হাঁ, দু'দিকেই হয়েছে।"

আশু চলিয়া গেল। সাতুঠাকুর স্তব্ধভাবে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেটার অসুখ,—ডবল নিমোনিয়া। সহসা সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারের মধ্যে একটা আশা ও আশঙ্কার বিদ্যুৎ যেন তাঁহার চোখ দুইটাকে বাঁধিয়া দিয়া চমকিয়া গেল। সাতুঠাকুর শিহরিয়া উঠিলেন।

হে বিশ্বনাথ! কে বলে—তুমি নাই। কে বলে তুমি পাথরের ঠাকুর? তোমার ওই প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে দেবত্বের যে সত্তা আছে, সে সত্তা দিয়া তুমি ভক্তের মর্ম্মবেদনা বেশ অনুভব কর্তে পার; মানুষের কাতর-ক্রন্দনে তোমার ন্যায়ের সিংহাসন বিচলিত হয়। মূর্খ আমি, পাপী আমি, তাই তোমাকে শুধু পাথর ভেবে তোমার এত লাঞ্ছনা, তোমার উপর এত অত্যাচার করেছি।

সাতুঠাকুর লুটিয়া গিয়া মন্দির-তলে লুটাইয়া পড়িলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অজ্ঞানের শত অপরাধ মার্জ্জনা কর বিশ্বনাথ!"

অনেকদিন পরে সাতুঠাকুর সে দিন শিবাষ্টক পাঠ করিতে করিতে বহুক্ষণ ধরিয়া দেবতার আরতি করিলেন।

আরতি দিয়া বাড়ী ফিরিবার সময়ে সাতুঠাকুর রাস্তায় দাঁড়াইয়া একবার প্রসন্ন সরকারের বাড়ীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। ডবল নিমোনিয়া, ঐটুকু ছেলে কতক্ষণ যুঝিবে? প্রসন্ন সরকার! সাতকড়ি ঘোষালের বুকে কি রাবণের চিতা জ্বলিতেছে, এইবার তা বুঝিতে পারিবি। কলি বলিয়া কি ধর্ম্ম নাই? দেবতা নাই? ব্রাহ্মণ নাই? বিনা দোষে ব্রাহ্মণকে লাঞ্ছনা করার কি ফল, এইবার তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবি।

সাতুঠাকুর চিত্তে যেন একটা তীব্র প্রসন্নতা লইয়া ধীরগম্ভীরপদে বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

সে রাত্রে আর আহারে প্রবৃত্তি হইল না। দূর হউক, ক্ষুধাও তেমন নাই, রাঁধিতেও পারা যায় না, একটু জল খাইয়া পড়িয়া থাকিব। জল খাইতে গিয়া শিকা হইতে মিষ্টান্নের হাঁড়ীটা পাড়িতেই সন্দেশগুলার উপর দৃষ্টি পড়িল। এঃ, সন্দেশগুলা খারাপ হইয়া যাইতেছে। হাবু যে আর উঠিয়া সন্দেশ খাইতে আসিবে, সে আশা নাই; সারিয়া উঠিলেও তাহার এখন উঠিয়া বসিতেই একমাস সময় লাগিবে। সুতরাং সন্দেশ কয়টা রাখিয়া আর ফল কি? সাতুঠাকুর সেই সন্দেশ কয়টা লইয়া জল খাইতে বসিলেন। একটা সন্দেশ হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, বড় চমৎকার সন্দেশ, বাজারে জিনিস নয়, করমাস দিয়া

তৈরী। আহা, এমন চমৎকার সন্দেশ পাইলে, হাবুর কতই না আহ্লাদ হইত! কিন্তু তাহার আহ্লাদে হইত কি? সাতকড়ি ঘোষালের সাত পুরুষ স্বর্গে যাইত! সাতুঠাকুরের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, তিনি নিজের উপর রাগে নিজের ঠোঁটটা কামড়াইয়া ধরিলেন।

আপনার মূর্খতায় আপনিই হাসিয়া সাতুঠাকুর একটা সন্দেশ মুখে দিলেন। এ কি, এ যে গলা দিয়া নামিতে চায় না, কে যেন গলার ভিতর হইতে উপর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে! আরে নির্লজ্জ বুড়া, একটা বালকের উদ্দেশে খাবার রাখিয়া সেই খাবার নিজের মুখে তুলিতে তোর লজ্জা করে না! যাহার জন্য রাখিয়াছিলি, সে আজ মৃত্যুশয্যায়; আর তুই বুড়া হাসিতে হাসিতে সেই সন্দেশ মুখে তুলিয়াছিস্? ওরে নিষ্ঠুর, এই নির্ম্মমতার পাপেই তুই আজ পুত্রহীন, নির্ব্বংশ, সংসারের স্নেহ, দয়া, মায়ার সকল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন। সাতুঠাকুর মুখমধ্যস্থ সন্দেশটা থু-থু করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, তার পর অবশিষ্ট সন্দেশগুলা উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

( ৫ )

সকালে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া সাতুঠাকুর ভাবিতেছিলেন, ছেলেটা কেমন আছে—কে জানে। বাঁচিবে, না মরিবে! সঠিক-সংবাদটা কাহার নিকট পাওয়া যায়? বাঁচুক মরুক, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি তেমন কিছুই নাই, কিন্তু সংবাদ পাইলে মনটা অনেক স্থির হয়। কে সে সংবাদ দিবে? নিজে একবার দেখিতে গেলে হয় না? কিন্তু ছিঃ, মনের ভিতর অশুভ-কামনা লইয়া দেখিতে যাওয়া, সে যে বিষম লজ্জার কথা। অন্তরে উৎকণ্ঠার ভার লইয়া সাতুঠাকুর যেন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

সম্মুখের রাস্তা দিয়া গণেশ মণ্ডল যাইতেছিল। গণেশ তো প্রসন্ন সরকারের খুব অনুগত। তাহার বাড়ীর দিক্ হইতেই আসিতেছে; খুব সম্ভব, উহার নিকট সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইবে। সাতুঠাকুর গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া ডাকিলেন, "ওহে গণেশ!"

দুর্ব্বাসা ঠাকুরের সম্বোধন-শ্রবণে গণেশ একটু চমকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "পেন্নাম বাবা ঠাকুর।"

সাতুঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে?"

গণেশ একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "সরকার মশায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁর ছোট ছেলের বড্ড ব্যামো কি না!"

যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞভাব প্রকাশ করিয়া সাতুঠাকুর বলিলেন, "বটে! ব্যামোটা কি?"

গণেশ বলিল, "জ্বর-বিকার, নিমুনিয়া।"

একবার কাসিয়া সাতুঠাকুর বলিলেন, "আছে কেমন?"

গণেশ। থাকা-থাকি আর কি, খুবই বাড়াবাড়ি; বিকারের ঝোঁকে তেড়ে তেড়ে উঠছে, আবোল-তাবোল বকছে। আশা নাই, তবে বাবা যদি ফেলে যান, তবেই।"

সাতুঠাকুরের মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। তিনি গম্ভীরস্বরে "হুঁ" বলিয়াই অস্থিরভাবে উঠিয়া পড়িলেন। গণেশ কিন্তু তাঁহার সে অস্থিরতা লক্ষ্য করিতে পারিল না; সে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সরকার মশায়ের মুখে তো রা নাই, মা আছাড়-কাছাড় কচ্ছে। পরেশ ডাক্তারকে নাকি আনতে গিয়েছে। আহা, ছেলে নয় তো, যেন রাজপুত্তুর। শত্রু যে, সেও ফিরে চায়। ভগবান্ যে কার কপালে কখন্ কি লিখেছেন, কে বলতে পারে!"

সাতুঠাকুর এতক্ষণে আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া তীব্র ভ্রূকুটীর সহিত বলিলেন, "রাজপুত্তুর বুঝি মরে না?"

দুর্ব্বাসা ঠাকুরের সহসা ক্রোধের সম্ভাবনা দর্শনে শঙ্কিত হইয়া গণেশ বলিল, "তা আর মরে না বাবা ঠাকুর? কে আর অমর ফল খেয়ে এসেছে, বল! তবে একটা সময় আর অসময় আছে। অসময়ে গেলে একটু দুঃখু হয় বৈ কি!"

সাতুঠাকুরের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। রোষ-তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,"তোমার দুঃখু হয় ব'লে কেউ তো মরবে না? ভারী দয়ালু লোকটা তুমি কি না।"

নির্দ্দয়তা যে কিসে হইল এবং দুঃখ-প্রকাশেই যে কি দোষ ঘটিল, তাহা গণেশ বুঝিতে পারিল না; না বুঝিলেও প্রতিবাদ করিয়া দুর্ব্বাসা ঠাকুরের ক্রোধোদ্দীপনে সাহসী হইল না; সে আর একটা পেন্নাম জানাইয়া আস্তেব্যস্তে তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। সাতুঠাকুর রোষসঙ্কুচিতমুখে অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

তবে বাঁচিবে না? দেবরোষ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কি মানুষের সাধ্য? হায়, হতভাগ্য প্রসন্ন সরকার! ডাক্তার-কবিরাজে কি করিবে? এই ক্ষুদ্র বালকের উপর দেবতার যে শাসনদণ্ড উত্থিত হইয়াছে, ডাক্তার-কবিরাজের সাধ্য কি, তাহার প্রতিরোধ করে। তোর অদৃষ্টে পুত্রশোক যে দৈবের বিধান। জয় বিশ্বনাথ! ধন্য তোমার মহিমা!

দেবতার মহিমাস্মরণে ভক্তের মুখ প্রেমে ভক্তিতে বিকসিত হইয়া উঠিল।

একবার দেখিয়া আসিলে হয়. হাবুর কি অবস্থা হইয়াছে, আর পুত্রের যে অবস্থা-দর্শনে প্রসন্ন সরকারের গর্ব্বস্ফীত মুখখানা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। যে প্রতিহিংসার জন্য এতদিন দেবতার দ্বারে মাথা কুটিয়া আসিয়াছি এবং নিষ্ফল ক্রোধে দেবতাকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি, আজ সেই প্রতিহিংসাবৃত্তি সার্থক হইয়াছে। এ সার্থকতা একবার নিজের চোখে দেখিব না ?"

সাতুঠাকুর এক পা এক পা করিয়া প্রসন্ন সরকারের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

( ৬ )

প্রসন্ন সরকার বাড়ীর বাহিরে ডাক্তারের আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল; সাতুঠাকুরকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর গো, আমার হেবো যে যায়। বাবাকে জানাও, আমি যোড়া ঢাক দিয়ে যোড়শোপচারে বাবার পূজা দেব।"

হো হো! মূর্খ! কাহাকে যোড়া ঢাকের লোভ দেখাইতেছিস্ ? বাবা নিজেই যে এই মরণের দুন্দুভি বাজাইয়া দিয়াছেন? তাঁহার যে পিনাক, সংহারের ভৈরব আরাবে বাজিয়া উঠিয়াছে, যোড়া ঢাকের শব্দে তাহার ধ্বনি কি চাপা পড়িবে ? এ যে সংহারমূর্ত্তি রুদ্রদেবের স্বহস্ত-প্রদত্ত দণ্ড। এ দণ্ড কে রোধ করিবে ?

সাতুঠাকুর পা ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছে ?"

চোখ মুছিয়া প্রসন্ন উত্তর দিল, "পূর্ণ বিকার, প্রলাপ বক্‌ছে। নাড়ী কখনও আছে, কখনও নাই।"

সাতুঠাকুর গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রসন্ন ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "একবার দেখবে না দাদাঠাকুর? একটু পায়ের ধুলো দেবে না ?"

"চল !"—সাতুঠাকুর প্রসন্নের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

আজ যে বড় ভক্তি প্রসন্ন সরকার! আজ যাহার পায়ের ধুলা লইবার জন্য ব্যস্ত, একদিন তুমিই না সেই বামুনকে বিশ্বনাথের দরজা হ'তে—। ছিঃ, লোকের বিপদের সময় পরিহাস করা কি উচিত ?

রোগীর ঘরের দরজায় উঁকি দিয়া সাতুঠাকুর স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এ কি সেই হাবু? তিন চারি দিনেই যে বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে, শুধু লাল চোখ দুইটা যেন আরও স্ফীত, আরও বিস্ফারিত হইয়া বাহিরের দিকে ঠেলিয়া আসিয়াছে; ঠোঁট দুইটায় কে যেন কালী মাড়িয়া দিয়াছে। মৃত্যু আসিয়া মুখখানার উপর যেন আপনার কঙ্কালময় হাত বুলাইয়া দিয়া গিয়াছে। উঃ, এ অবস্থা হইতে ফিরায় কাহার সাধ্য। তাঁহার বিশুর মুখের অবস্থাও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল। সাতুঠাকুর রুদ্ধশ্বাসে নির্নিমেষ নেত্রে হাবুর মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা হাবু চীৎকার করিয়া উঠিল, "বামুন জেথা !"

যেন বিদ্যুতের তীব্র আঘাতে সাতুঠাকুরের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কম্পিতহস্তে দরজার বাজুটা চাপিয়া ধরিলেন।

হাবু পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মেলো না বামুন জেথা, মেলো না: আমি আল থন্দে কাব না।"

সাতুঠাকুর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন, "হাবু!"

হাবু নিশ্চল, নিরুত্তর। কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার সর্ব্বশরীর যেন একবার স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে অধীরভাবে বিছানা হাতড়াইতে হাতড়াইতে কাঁদিয়া উঠিল, "আমাকে মালবে, বামুন জেথা, মালবে, মা মা!"

মা শিয়রেই বসিয়া ছিলেন; ছেলের মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া তাহার উপর নিজের মুখ রাখিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাপ আমার। যাদু আমার!"

সাতুঠাকুরের নিঃশ্বাস বুঝি রুদ্ধ হইয়া আসিল, চোখের জল বুঝি আর থামে না। উঃ, চুলোয় যাক বিশুর স্মৃতি, উচ্ছন্ন যাউক সংসার, এ কি করিলে বিশ্বনাথ!

হাবুর মা পুত্রের শিয়র হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সাতুঠাকুরের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং আপনার হাতের সোনার বালা দুইগাছা খুলিয়া তাঁহার পায়ের উপর রাখিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাবা, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমরা মনে করলে মরা বাঁচাতে পার। আজ বালা দু'গাছা দিলাম, বল তো আমার সর্ব্বস্ব দেব। তুমি বাবাকে জানিয়ে আমার হেবোকে বাঁচিয়ে দাও।" জানাইলে বাবা কি, রক্ষা করিতে পারিবেন না? দেবতার অসাধ্য কি? কিন্তু ও সাতকড়ি ঘোষাল, কাহার ছেলের জন্য তুমি বাবাকে জানাইতে যাইবে? যাহাকে পুত্রহীন করাইবার জন্য বাবার মাথায় পঞ্চপ্রদীপ ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়াছিলে—সাতুঠাকুরের চোখের সামনে সব যেন ঝাপসা হইয়া আসিল। হাবু চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাত্তা দাও বামুন জেথা, বাত্তা দাও!"

সাতুঠাকুর পদাঘাতে বালা দুইগাছাকে ছুঁড়িয়া দিয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার কানের পাশ দিয়া ফাল্গুনের বাতাস হো হো শব্দে বহিয়া যাইতে লাগিল।

সাতুঠাকুর চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিলেন এবং বলিয়া গেলেন, "হোপ্‌লেস্, বেলা আড়াই প্রহর পার হইবে না।" বাড়ীতে কান্নার উচ্চরোল উঠিল। মা পুত্রের শিয়র ত্যাগ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। প্রতাপপুর হইতে সার্জ্জন পরেশবাবুকে আনিতে লোক গিয়াছে। কিন্তু সে লোক বা ডাক্তার কাহারও দেখা নাই, আর ডাক্তার আসিয়াই বা কি করিবে? মরণের ঔষধ তো ডাক্তার দিতে পারে না। প্রসন্ন সরকার হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় ঠিক একটা ঘূর্ণী ঝড়ের মত সাতুঠাকুরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সকলে ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সাতুঠাকুর কিন্তু কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে রোগীর শিয়রে গিয়া বসিলেন, এবং বিশ্বনাথের চরণামৃত রোগীর মুখে ঢালিয়া হাতটা তাহার গায়ে মাথায় বুলাইয়া দিলেন। তার পর সেইখানে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বিশ্বনাথ! যদি একদিনের তরেও প্রাণের আবেগে ভক্তিভরে তোমার পায়ে ফুল-জল দিয়ে থাকি, তবে তারি ফলে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দাও দয়াময়! তোমার সে দয়ার বিনিময়ে এ জন্মে আমার দেবার কিছু নাই, কিন্তু এই উপবীত ছুঁয়ে বলছি, পর পর যত জন্ম হবে, সেই সব জন্মেই আমি পুত্রশোকের অসহ্য বেদনা বুক পেতে নেব ঠাকুর!"

গৃহ নীরব, নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ গৃহমধ্যে দুর্ব্বাসা ঠাকুরের কণ্ঠধ্বনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের কর্ণে মেঘমন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে পরেশ ডাক্তার উপস্থিত হইলেন। তিনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বুক-পিঠ পরীক্ষা করিয়া মুখে বলিলেন, "ভয় কিছুই নাই, বাঁদিকে সর্দ্দিটা বসেছে মাত্র, নিউমোনিয়া নয়। হরিশ বাবু ভুল করেছেন। নাড়ীর কোনও দোষ নাই।"

উচ্ছ্বাসিতকণ্ঠে "জয় বাবা বিশ্বনাথ!" বলিয়া সাতুঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসন্ন সরকার তাঁহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "পায়ের ধুলো দাও দাদাঠাকুর, তুমিই আমার মরা ছেলেকে বাঁচালে।"

তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া সাতুঠাকুর হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা বলো না প্রসন্ন সরকার, তোমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন বিশ্বনাথ। মরা বাঁচায় আমার হাত থাকলে আমি দুহাতে গলা টিপে তাকে মেরে ফেলতাম।"

দাঁতে দাঁতে ঘষিতে ঘষিতে সাতুঠাকুর ক্রোধকম্পিতপদে ঘরের বাহির হইবেন। সকলে ভীতিবিহ্বলদৃষ্টিতে দুর্ব্বাসা ঠাকুরের ক্রোধ-রুদ্র মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

# গুরুমশায়

( ১ )

চৈতন্যগঞ্জের মাধব বৈরাগী দীর্ঘ দশ বৎসরকাল গুরুমহাশয়গিরি করিয়া যখন দেখিল যে, এই দশ বৎসরে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাতখানা খুব দোরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু মনটা একটুও দোরস্ত হয় নাই। তাহার কঠোর বেত্রাঘাতপ্রভাবে অনেক দুরন্ত ছেলে শান্ত হইয়াছে, কিন্তু শাসনের অভাবে নিজের মনটা এমনই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে সংযত করা যে কোনও গুরুমহাশয়েরই অসাধ্য। মনের এই অবস্থা দেখিয়া মাধব ভীত হইয়া পড়িল এবং বেতগাছটা পাঠশালার চালের বাতায় তুলিয়া রাখিয়া হরিনামের মালা লইয়া মনটাকে শাসন করিতে যত্নবান্ হইল।

মাধবের এই পরিবর্ত্তন দর্শনে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, 'বেত ছেড়ে মালা ধর্‌লে যে বৈরাগী মশায়?' তাহা হইলে মাধব হাসিয়া উত্তর করিত, পিছনে আর এক জন যে বেত উঁচিয়ে আগিয়ে আস্‌ছে।'

মাধবের উত্তর শুনিয়া অনেকে হাসিত; কেহ অতীত-যৌবনা বারাঙ্গনার উদাহরণ প্রদর্শন করিত, কেহ বা বৈরাগী মহাশয়ের মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনায় দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকিত; আর ছেলের দল বেত্রহস্ত গুরুমহাশয়ের পরিবর্ত্তে গোপীচন্দনচর্চ্চিত মালাজপনিরত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে ভীতির পরিবর্ত্তে প্রেম ও ভক্তি প্রকাশ করিত।

মাধব কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার মনের শাসনে প্রবৃত্ত হইল। দশ বৎসরের অব্যবহারে নামের ঝুলিটা ময়লা হইয়া গিয়াছিল, সেটাকে পরিষ্কার করিয়া নূতন সুতা দিয়া মালাছড়া গাঁথিয়া লইল। পেঁড়া খুলিয়া গোপীনাথের পট, গোপীমৃত্তিকা, তিলকমাটী, মহাজনপদাবলী বাহির করিল। আরসুলায় গোপীনাথের পটের কোণগুলা খাইয়া ফেলিয়াছিল, স্থানে স্থানে অপরিষ্কার করিয়াছিল। পদাবলীর পুঁথি এমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, হাতে তুলিতেই তাহার কতকগুলা পাতা গলিত পত্রের ন্যায় ঝরিয়া পড়িল। মাধব শুষ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে সেগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

এক দিন এই পুঁথিগুলা কি যত্নের সামগ্রী ছিল! তখন ইহাদের এক একখানা পাতা বুকের এক ছটাক রক্ত অপেক্ষাও মূল্যবান্ বোধ হইত; ইহার এক একটা ছত্র হইতে অমৃতের মধুর ধারা ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িত। গোপীনাথের এই ক্ষুদ্র পটখানার মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল তিন লোকের সুষমা সমষ্টিভূত হইয়া বিরাজ করিত। তখন এই পটখানির দিকে চাহিলে প্রেমে ও আনন্দে সমগ্র হৃদয়টা ভরিয়া উঠিত। এই পটখানি, এই পুঁথিগুলি, এই মালাছড়া, এইগুলিকে সম্বল করিয়া মাধব দুঃখতাপপূর্ণ সংসারে যে একটি শান্তির পথ বাছিয়া লইয়াছিল, সে পথ আজ কোথায়—কত দূরে? তখন বসন্তের মলয়মারুত স্পর্শে সংসার-উদ্যানটা ফলে ফুলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, যৌবনের পিক পঞ্চম তানে ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মাধব সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র হরিনামকেই সার করিয়া লইয়াছিল; এবং গোপীনাথের চরণে আপনার সুখ-দুঃখ অর্পণ করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। সেই তৃপ্তিতে বিভোর থাকিয়াও চঞ্চল মনোভৃঙ্গটা সময়ে সময়ে বিষয়বাসনারূপ কেতকী-কুসুমের দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মাধব বিদ্যাপতির পদ বাহির করিয়া গাহিতে থাকিত—

"আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা;
যৌবনে নিধুবন রসরঙ্গে মাতনু-
আর তোহে ভজব কোন্ বেলা।"

( ২ )

এক দিন হঠাৎ গুরুদেব আসিয়া বলিলেন, 'বৎস, বৈষ্ণবধর্ম্ম যোগীর শুষ্ক সাধনার ধর্ম্ম নয়; এ সাধনায় সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন, নতুবা সাধনা সম্পূর্ণ হয় না।"

মাধব গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং গোপাল দাসের বিধবা কন্যা মঞ্জরী দাসীর সহিত কণ্ঠিবদল করিয়া ফেলিল।

কণ্ঠিবদলের পর মাধব দেখিল, গুরুদেবের কথা যথার্থ, সাধনসঙ্গিনী না থাকিলে সাধন পূর্ণাঙ্গ হয় না। আগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাধবকে নিজেই পূজা

আহ্নিকের যোগাড় করিয়া লইতে হইত; কিন্তু এখন দেখিত, তাহার আসিবার আগেই সমস্ত সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। মাধব হৃষ্টচিত্তে গিয়া পূজায় বসিত। আগে জপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে হইত, কতটা বেলা হইল। বেলা অতিরিক্ত হইলে তাড়াতাড়ি জপ সারিয়া লইয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতে হইত; কিন্তু এখন সে ঝঞ্ঝাট ছিল না; সুতরাং মাধব ইচ্ছামত জপ-আহ্নিক সম্পন্ন করিয়া লইবার অবসর পাইত। তার পর স্বহস্তে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত অর্দ্ধসিদ্ধ বা পোড়া ভাত, আর লবণাক্ত ব্যঞ্জন; তাহার তুলনায় মঞ্জরীর সযত্নে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে কি অমৃতের আস্বাদ! পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতে করিতে মাধব অতৃপ্ত-নয়নে মঞ্জরীর সহাস্য মুখের দিকে চহিয়া থাকিত।

তার পর এক এক দিন রাত্রিতে বাড়ীখানা শ্মশানের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য লইয়া কি বিভীষিকা প্রদর্শন করিত! সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে নাম-গান করিতে গিয়া মাধব কত দিন নিজের কণ্ঠস্বরে নিজে শিহরিয়া উঠিয়াছে। এখন কিন্তু নাম-গান করিতে বসিলেই মঞ্জরী আসিয়া পাশে বসিত এবং একটির পর একটি পদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মাধবের প্রাণটাকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলিত। এক এক দিন জপান্তে জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রাঙ্গণে বসিয়া মাধব গান ধরিত—

যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়।"

মঞ্জরী আসিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিত, "ও আবার কি ছাই গান!"

সহাস্যে মাধব জিজ্ঞাসা করিত, "তবে কি গাইবো?"

মঞ্জরী বলিত, "কেন, ওই সব ছাড়া আর গান নাই কি? সেই যুগল-মিলনের পদটি গাও।"

মাধব হাসিয়া গোবিন্দদাসের পদ ধরিত—

"রাধা মাধব দুহুঁ তনু মিলল
উপজল আনন্দ-কন্দ;
কনক-লতায় তমাল জনু বেড়ল
রাহু গরাসল চন্দ।
যৈছনে কমলে ভ্রমরা রহে মাতি;
জলদে বেড়ল জনু তড়িত লতাবলি
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি।"

মঞ্জরী মুগ্ধচিত্তে বসিয়া সঙ্গীত-সুধা পান করিত; উপর হইতে চাঁদের আলো আসিয়া তাহার প্রফুল্ল মুখখানাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিত। সেই চন্দ্রালোক-প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাধব উৎসাহ সহকারে গাহিতে থাকিত—

"কুঞ্জ-কুটীর কুসুম-নব-পল্লব
ভ্রমর-ভ্রমরী কত রঙ্গে;
সারী নারী শুক পুরুখ জোড়ে জোড়ে
ময়ূর-ময়ূরীক সঙ্গে।"

তবে একটা বিষয়ে কিছু গোল বাধিল। আগে নাম-গান করিয়া কীর্ত্তন গাহিয়া মাধব কোনরূপে নিজের পেটটা চালাইয়া দিত, কিন্তু এখন আর সে উপায়ে দুইটা পেট চলে না। কাজেই মাধবকে পেট চালাইবার উপায় অন্বেষণ করিতে হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে বারোয়ারির আটচালায় পাঠশালা খুলিয়া বসিল। কাছাকাছি আর পাঠশালা না থাকায় আয় মন্দ হইল না; সে আয়ে দুইটা পেট স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে লাগিল।

কেবল ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়, মঞ্জরী পারত্রিক মঙ্গলেরও সহায় হইল। আগে এক জন বৈষ্ণব অতিথি আসিলে তাহার সেবা লইতে মাধবকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। কিন্তু এখন দশ জন অতিথি আসিলেও মাধবের কোনও চিন্তা ছিল না; তাহারা মঞ্জরীর সেবা-যত্নে পরিতৃপ্ত হইয়া মাধবের আতিথ্যধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিত। মাধব আপনার সংসার-আশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করিয়া লইত।

এইরূপে মাধব যখন পরিত্যক্ত সংসারটাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অসারতার মধ্যে সার সত্যের মধুর আস্বাদ অনুভব করিতেছিল, তখন সংসারটা যেন পূর্ব্ব উপেক্ষার প্রতিশোধ লইবার জন্যই স্বীয় কোমল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিল। রঞ্জিতপুরে ধুমধামের সহিত মহোৎসব হইতেছিল। মাধব সেখানে কীর্ত্তন গাহিতে গিয়াছিল। তিন দিন পরে ফিরিয়া দেখিল, সংসার তাহার উপর কঠোর প্রতিশোধ লইয়াছে, তাহারি প্রেমের শিকল কাটিয়া মঞ্জরী-বিহঙ্গী উড়িয়া গিয়াছে; শূন্য খাঁচার মত ঘরখানা পড়িয়া রহিয়াছে। সেই শূন্য গৃহের দিকে চাহিয়া মাধব বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। তার পর অনুসন্ধানে জানা গেল, পরম ভাগবত কৃষ্ণদাস বাবাজী তাহার গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিয়া অতিথিসেবার পুরস্কারস্বরূপে শ্রীমতী মঞ্জরী দাসীকে প্রেমের সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মঞ্জরীর অনুসন্ধানের জন্য অনেকে পরামর্শ দিলে মাধব তাহাতে কর্ণপাত করিল না; সে হরিনামের মালা, গোপীনাথের পট আহ্নিকের উপকরণ, পদাবলীর পুঁথি সব একটা বেতের পেড়ায় তুলিয়া পাঠশালায় গিয়া বসিল এবং কঠোর বেত্রাঘাতে অনেক দুরন্ত বালককে শান্ত করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই আপনার গুরুমহাশয় পদের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র জাহির করিয়া ফেলিল।

সেই দিন হইতে মাধব খোলের বাজনা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিত, বৈষ্ণব ভিখারী দেখিলে তাড়াইয়া মারিতে যাইত, কেহ হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে তাহাকে ভণ্ড বলিয়া বিদ্রূপ করিত। কাজের মধ্যে শুধু ছেলে ঠেঙ্গাইত, আর পাড়ায় পাড়ায় গল্প করিয়া বেড়াইয়া দিন কাটাইয়া দিত। এইরূপে সে দীর্ঘ দশটি বৎসর কাটাইয়া দিল।

এই দশ বৎসরে মাধব হরিনাম ভুলিল, খোলের বাজনা ভুলিল, জপ, আহ্নিক, মহাজনপদ সব ভুলিয়া গেল, ভুলিল না শুধু মঞ্জরীকে। অতীত স্বপ্নের মত মঞ্জরীর স্মৃতিটা মনের পাশে ঠিক জাগিয়া রহিল। চঞ্চল পতঙ্গ যেমন নূতন ফুল না পাইয়া শুকনা ঝরা ফুলটারই আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, মাধবের মনো-ভৃঙ্গও তেমনই এই পুরাতন নির্গন্ধ স্মৃতিকুসুমকে সম্বল করিয়া তাহারই চারি পাশে উড়িয়া বেড়াইত; কিছু-তেই সে দিক্ হইতে ফিরিতে চাহিত না। এই অবাধ্য মনটাকে বশে আনিবার কোনও উপায় যখন খুঁজিয়া পাইল না, তখন মাধব হরিনামের চাবুক দিয়া তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইল।

"মোতাই, ও মোতাই!"

হাঁড়ীতে তেল দিয়া তাতে আলুগুলা ফেলিয়া দিবার জন্য মাধব অপেক্ষা করিতেছিল। বাদলায় কাঠগুলা এমনই স্যাঁতা হইয়া গিয়াছিল যে, কিছুতেই জ্বলিতে চাহিতেছিল না. ধোঁয়ায় চোখ দুইটা করঞ্জার মত লাল হইয়াছিল। আগের দিনে একাদশী গিয়াছে। কোথায় তাড়াতাড়ি এক মুঠা পেটে দিয়া ক্ষুধার তাড়না দূর করিবে, তাহা না হইয়া আজই উনানটা বাদ সাধিয়া বসিল। ক্রোধে বিরক্তিতে মাধবের মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। বহুকষ্টে ভাতটা নামিয়াছে, কিন্তু শুধু ভাত তো খাওয়া যায় না। কাজেই একটা তরকারী রাঁধিবার জন্য মাধব হাঁড়ীতে তেল দিয়া, আলুগুলা হাতে লইয়া একবার হাঁড়ীর দিকে আরবার উনানের মৃদু শিখার দিকে বিরক্তিসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, আর হাঁড়ী সমেত উনানটাকে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইবে কি না, তাহাই এক একবার ভাবিয়া লইতেছিল। কিন্তু পলাইবে কোথায়? যেখানেই যাক্, ক্ষুধা যে সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। হরি-নামে সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত হয়, কিন্তু পোড়া পেটের জ্বালা তো দূর হয় না! এই দুর্দ্দমনীয় জঠরজ্বালাটাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে মাধব আলুর টুকরাগুলা হাঁড়ীতে ফেলিবার উদ্যোগ করিতে-ছিল, এমন সময় ডাকিল, "মোশাই!"

সে ডাকে চমকিত হইয়া মাধব পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, এক বিধবা যুবতী আধ-ঘোম্‌টা টানিয়া উঠানের এক পাশে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহি-য়াছে। বিস্ময়ের সহিত মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

যুবতী সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমি মোশাই।"

একটু বিরক্তভাবে মাধব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

"আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না মোশাই?"

বলিয়া যুবতী মুখের ঘোমটাটা কপালের উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া দিল। মাধব ধূমরক্তিম দৃষ্টিটাকে বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। যুবতী মৃদু-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি—আমি রাজু।"

বিস্ময়-জড়িত-কণ্ঠে মাধব বলিয়া উঠিল, "রাজু! ছিষ্টে দাদার মেয়ে রাজু?"

রাজু দুই পা আগাইয়া আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে তোমার মনে আছে?"

মাধবের হাত হইতে আলুর টুকরাগুলা মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার সেই আশ্চর্য্য ভাব লক্ষ্য করিয়া রাজু বলিল, "তুমি যে অবাক্ হয়ে গেলে মোশাই!"

বাস্তবিক মাধব অবাক্ হইয়া গিয়াছিল; তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, শুধু ক্রোধ ও বিস্ময়ে মুখখানা বিকৃত হইয়া রহিল।

সেই রাজু? যে একদিন সকালের ফুটন্ত ফুলটির মত তাহার চোখের সামনে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইত; কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের রাশ দোলাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ডাকিত, 'মোতাই, ওগো মোতাই!' মঞ্জরীর অন্তর্দ্ধানে তখন সংসারের সব সুরগুলা বেসুর হইয়া গিয়াছিল; তাহার মধ্যে শুধু এই একটা সুরই যাত্রার দলের ওস্তাদী রাগরাগিণী আলাপের মধ্যে কোনও একটি বালক-কণ্ঠে উত্থিত কীর্ত্তনের সুরের মত এত মিষ্ট লাগিত যে, তাহা শুনিবার জন্য মাধব প্রায়ই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। সে সুর শুনিলেই হৃদয়ের অবসাদ-মলিন তন্ত্রীগুলাও যেন একবার সাড়া দিয়া

উঠিত। বাড়ীর পাশেই পাঠশালা; সুতরাং দিনের অধিকাংশ সময় রাজু পাঠশালাতেই কাটাইয়া দিত; কখনও সে বই লইয়া অ আ পড়িত, কখনও পুঁথির পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিত, কখনও বা কোনও ছেলের দোয়াত কলম টানিয়া লইয়া হিজি-বিজি লিখিতে বসিত। ছেলেদের অভিযোগে বিরক্ত হইয়া মাধব তাহাকে ধমক দিলে সে আধফুটন্ত পদ্মকোরকের ন্যায় ভাসা ভাসা চোখ দুইটির উপর কচি পাতার মত হাত দু'খানি চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিত; কখনও বা রাগে মাধবের গলা জড়াইয়া, মাথার শিখা টানিয়া, চুল ছিঁড়িয়া অস্থির করিয়া তুলিত।

তার পর তাহার বিবাহ হইল। বিবাহের সময় যখন সে শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন আবদার ধরিয়া বসিল, মোশাইকে যেতে হবে। সে আবদার মাধব ঠেলিতে পারিল না; পাঠশালা বন্ধ দিয়া পাল্কীর পিছনে পিছনে তাহাকে পাঁচ ক্রোশ পথ ছুটিতে হইয়াছিল এবং যে কয় দিন সে শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, সে কয় দিন মাধব বাড়ী ফিরিতে পারে নাই।

ইহার পর কিছুদিন পরে যে দিন রাজুর বৈধব্য সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, সে দিন এই বজ্রের কঠোর আঘাত সহ্য করিবার জন্য ছিষ্টিধর বা তাহার মাতা কেহই জীবিত ছিল না, একা মাধবকেই সেই দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। সে আঘাতের ক্ষত এখনও বুঝি শুষ্ক হয় নাই। কিন্তু সে ক্ষত শুষ্ক না হইতেই তাহাতে আর একটা খোঁচা লাগিল। সেটা বড় সহজ খোঁচা নয়, যেন বিষাক্ত শল্যের আঘাত। লোকপরম্পরায় মাধব শুনিতে পাইল, রাজুর চরিত্র কলুষিত হইয়াছে, কুসংসর্গে পড়িয়া হতভাগিনী গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। শুনিয়া মাধব যেন আকাশ হইতে পড়িল। সেই ফুলের মত সুন্দর, দেবতার নির্মাল্যের ন্যায় পবিত্র বালিকা, তাহার ভিতর এমন বিষাক্ত কীট! অথবা নারীজাতি এমনই বিশ্বাসঘাতিনী বটে। মঞ্জরীকে দিয়াই তো মাধব তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছে। উঃ, জগতে এই জাতিটা কি ঘৃণ্য!

আজ সেই রাজু সম্মুখে উপস্থিত। মাধব বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, এখনও তাহার মুখে সেই সৌন্দর্য্য, স্বরে সেই মাদকতা; সে স্বরে এখনও হৃদয়ের ছিন্নপ্রায় তারগুলা সাড়া দিয়া উঠিতে চায়। ক্রোধে ঘৃণায় মাধবের ললাট কুঞ্চিত হইল।

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচো মোশাই?"

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাধব বলিল, "তুমি—তুমি যে হঠাৎ—"

রাজু বলিল, "আমার অবস্থা সব শুনেছ কি?"

"কতক কতক শুনেছি বৈ কি।"

"বাকীটা শুনবে?"

"দরকার নাই।"

রাজু নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তোমার কি দরকার, তাই বল।"

রাজু একবার মুখ তুলিয়াই নামাইয়া লইল; একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "আমার—শ্বশুরের ভিটের আমার ঠাঁই নাই।"

"না থাকবারই কথা।"

"এ গাঁয়েও কেউ আমাকে ঠাঁই দিতে চায় না।"

"এইটাই পাপের প্রধান সাজা, রাজু।"

রাজুর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিটা মাধবের মুখের উপর স্থাপন করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "সংসারে পাপী কি একা আমিই, মোশাই?"

এ প্রশ্নের উত্তর মাধব সহজে দিতে পারিল না। রাজু তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, "আমার তো পাপের সীমা নাই। কিন্তু বিষয়ের ভাগ দিতে হবে ব'লে নিজের শালাকে পিছনে লাগিয়ে যে কলে কৌশলে আমার মুখে কলঙ্কের ছাপ মেরে দিলে, সে কি আমার চাইতে বেশী পুণ্যবান মোশাই?"

মাধবের দৃষ্টিটা বিস্ফারিত হইয়া আসিল। সে যে কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। রাজু নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "চুলোয় যাক পাপ-পুণ্য। এখন আমাকে একটু জায়গা দিতে পারবে?"

চিন্তা-মলিন মুখে মাধব বলিল, "পারি। তবে—"

"তবে লোকে নিন্দে করবে এই যা ভয়, না?"

"আমি বোষ্টম ভিখিরী মানুষ, লোকের নিন্দা সুখ্যাতিতে আমার কিছু আসে যায় না।"

বলিয়া মাধব একটু হাসিল। রাজু বলিল, "তা জানি ব'লেই তোমার কাছে এসেছি মোশাই।"

রাজু এতক্ষণ উঠানে রোদে দাঁড়াইয়াছিল, এক্ষণে আগাইয়া গিয়া দাবার উপর বসিল এবং উনানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তোমার কি রকম রান্না হচ্ছে মোশাই? উনান যে নিবে গিয়েছে।"

মাধব পুনরায় উনান জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শীগ্‌গীর রেঁধে নাও মোশাই। অনেক দিন পরে আজ বোষ্টমের পাতের পেসাদ পেয়ে তবু একটু পবিত্র হব।"

( ৪ )

সন্ধ্যার সময় মাধব পাঠশালা হইতে ফিরিতেছিল। পথে ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে চক্রবর্ত্তী

মহাশয় বলিলেন, "আর শুনেছ মশাই, আজ ছিষ্টে ঘোষের মেয়ে এসেছিল যে।"

মাধব চমকিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ঠিক দুপুর বেলা ছুঁড়ী এসে হাজির। বলে, পুরুত দাদা আমাকে একটু ঠাঁই দাও। আমার মনে হ'লো মাগীকে ঝাঁটা-পেটা ক'রে ঠাঁইছাড়া করি। গিন্নী বল্লে, না না; লোকে কি বল্বে। তাঁর ইচ্ছা, এমন সময় এসেছে, একমুঠো ভাত দিই। আরে রামচন্দ্র! পাপিষ্ঠা বেশ্যা, তাকে আবার খেতে দেয়! তাকে দয়া কর্লেও পাপ আছে।"

মাধব নির্ব্বাক্‌ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কিন্তু ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি দেখ। ছিষ্টে ঘোষ বেটার কি অহঙ্কার ছিল। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেখে মাথা নোয়াত না। তেমন হয়েছে, দর্পহারী মধুসূদন দর্প চূর্ণ করেছেন। মেয়ে বেশ্যা হয়ে এক মুঠো ভাতের তরে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু লোকে বলে ভগবান্ নাই।"

ভগবানের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠা মাধবের বিস্ময় উৎপাদন করিলেও সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না; আমতা আমতা করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

রাত্রিতে মাধব রাজুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখন কি করবি রাজু?"

রাজু বলিল, "কি কর্‌বো, তা তুমিই ব'লে দাও না।"

মাধব ভাবিতে লাগিল। রাজু বলিল, "আচ্ছা, ভেক নিয়ে বোষ্টম হ'লে হয় না?"

ভ্রূকুটি করিয়া মাধব বলিল, "ছিঃ!"

মাধব মহা সমস্যায় পড়িল। তাহার এমন ইচ্ছা নয় যে, রাজু তাহার কাছে থাকে। পাপের উপর যতটা ঘৃণা থাক্ বা না থাক্, স্ত্রীজাতির উপর তাহার তীব্র বিদ্বেষ ছিল; বিশেষ ব্যভিচারিণীর প্রতি। সুতরাং রাজুর সংস্রব তাহার একটুও ভাল লাগিল না। অথচ তাহাকে 'চলিয়া যাও' এমন কথাটাও বলিতে পারিল না! ছিঃ, কাহারও মুখের উপর—বিশেষতঃ এক জন নিরাশ্রয়াকে কি এমন কথা বলা যায়? অনেক ভাবিয়া মাধব শেষে "যা করেন হরি" স্থির করিয়া এই কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান করিল।

পাঁচ জনে কিন্তু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না। তাহারা মাধবের ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেহ বলিল, "বৈরিগী মশাই ওকে ভেক দিয়ে বোষ্টম করবে।" কেহ বলিল, "বোষ্টম নয়, বোষ্টমী ক'রে ওর সঙ্গে কণ্ঠিবদল কর্‌বে।" কেহ বলিল, "শেষ বয়সে বোষ্টমী নিয়ে বৃন্দাবনবাসী হবে।"

ছেলেরা কিন্তু কণ্ঠিবদলটাই বিশ্বাস করিয়া লইল এবং সেই সময়ে তাহারা কয় দিন ছুটী পাইবে, তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল।

( ৫ )

সকালে পাঠশালায় গিয়া মাধব দেখিল, দুই তিনটি ছেলে মাত্র উপস্থিত হইয়াছে। মাধব তাহাদের এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর সব কোথায় রে নীলে?"

নীলে অন্যান্য ছাত্রদের অনুপস্থিতির ঠিক কারণ বলিতে পারিল না। মাধব তখন তাহাদের ডাকিতে পাঠাইল। খানিক পরে নীলমণি একা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, আর কোনও ছেলেই পাঠশালায় আসিবে না, তাহারা বলে যে, গুরুমহাশয়ের বিবাহে তাহারা ছুটী পাইয়াছে। মাধব হাসিয়া নিজে ডাকিতে গেল। দুই এক জন ছেলে পিতার নিষেধ খুড়ার নিষেধ ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করিল। পরিশেষে ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন যে, "মাধব যখন একটা বেশ্যার সংসর্গে আসিয়াছে, তখন কোনও ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ছেলেদের তাহার সংস্রবে যাইতে দিতে পারে না; ছেলেরা না হয় মূর্খ হইয়া থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মটাকে ত কেহ খোয়াইতে পারে না।" মাধব শুনিয়া স্তম্ভিত-চিত্তে পাঠশালায় ফিরিল এবং যে কয় জন ছেলে আসিয়াছিল, তাহাদের ছুটী দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, "এরি মধ্যে ফির্‌লে যে গোঁসাই?"

মাধব উত্তর করিল, "শরীরটা ভাল নয়।"

মাধব প্রকৃত কথাটা লুকাইবার চেষ্টা করিলেও সেটা রাজুর নিকট গোপন রহিল না। বিকালে পুকুরঘাটে গা ধুইতে গিয়া সে শিবু মাইতির মার মুখে আসল কথা শুনিয়া আসিল। তাহার জন্যই মাধবকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, অথচ মাধব তাহার কাছেই আসল কথাটা গোপন করিয়াছে, ইহাতে সে মাধবের নিকট কৃতজ্ঞ হইলেও তাহার উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিল না। সে রাগে রাগে আসিয়া বাড়ী ঢুকিল।

মাধব তখন দাবার উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া চৈতন্যচরিতামৃত সম্মুখে রাখিয়া সুরের সহিত পড়িতেছিল—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

নীচ জাতি নহে কভু ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলের বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।"

ভিজা কাপড়ে সম্মুখে আসিয়া রাজু ডাকিল, "মোশাই!"

মাধব পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। রোষগম্ভীর কণ্ঠে রাজু বলিল, "তাই না শরীর ভাল নয় ব'লে তুমি পাঠশালা যাও না?"

মাধবের ওষ্ঠপ্রান্তে স্নিগ্ধ হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিল, "তাতে কি হয়েছে রাজু?"

ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করিয়া রাজু বলিল, "কি হয়েছে? তোমার পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা জান?"

সহাস্যে মাধব বলিল, "মন্দ কি হয়েছে রাজু?" এতক্ষণ পাঠশালে ব'সে ছেলেগুলোকে ক খ আঁক পড়াতাম, আর আজ ঘরে ব'সে কেমন চৈতন্যচরিতামৃত পড়ছি।"

"কি খেয়ে পড়বে?"

"আর কিছু না পারি, বোষ্টমের ছেলে ভিক্ষা ক'রেও তো খেতে পারবো।"

রাজু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে কাপড় ছাড়িতে গেল। মাধব পাতা উল্টাইয়া পড়িতে লাগিল—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

(৬)

রাজু কিন্তু কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না যে, তাহার জন্য মোশাই এত লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। সে ধরিয়া বসিল, "তোমার ক্ষতি ক'রে আমি এখানে কক্ষণো থাকবো না মোশাই।"

মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবি?"

রাজু রাগতভাবে বলিল, "চুলোয়।"

মাধব খানিক ভাবিয়া বলিল, "বেশ, কিন্তু একা মেয়েমানুষ তুই, যেতে পার্‌বি না; মায়ে বেটায় যাই চল।"

বিস্মিত ভাবে রাজু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাবে?"

মাধব হাসিয়া বলিল, "চুলোয়। যে চুলোয় পাঠশালা নাই, সংসারের গোলযোগ নাই, লোকনিন্দার বালাই নাই।"

"সে কোথায়?"

"শ্রীবৃন্দাবন।"

রাজু বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টিতে মাধবের মুখের দিকে চাহিল। মাধব বলিল, তুই যখন পর হয়ে আমার ক্ষতি সইতে পারিস্ না, তখন আমি নিজে নিজের ক্ষতি কি সহ্য করিতে পারি? তার চাইতে এই ক্ষতির জায়গা ছেড়ে যেখানে শুধু লাভ, সেইখানে যাওয়া ভাল।"

ইহার পর এক দিন সকালে মাধব গাঁটরী বাঁধিয়া যখন বাড়ীর বাহির হইতেছিল, তখন জন কতক ছেলে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। সর্দার পোড়ো হরিধন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চল্‌লে গুরুমশাই?"

মাধব বলিল, "কত দিন তোদের গুরুমশায়গিরি করেছি, এবার একবার মনের গুরুমশায়গিরি করতে চল্‌লাম।"

মাধবের চোখ ছাপাইয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে রাজুর হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গরুর গাড়ীতে উঠিল।

গাড়ী চলিয়া গেলে শীতল ঘোষ বলিল, "বৈরাগী মশায় চ'লে গেল। লোকটি কিন্তু ছিল ভাল।"

ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এদানী কিন্তু মতি-গতিটা বড্ডই বিগড়ে গিয়েছিল। আর দিন কত থাকলে গাঁয়ে নেড়া-নেড়ীর দল হ'ত।"

সম্মুখে মুদীর দোকানে বসিয়া ভিখারী বৈষ্ণব গাহিতেছিল—

মন-পাখি ছাড় রে চালাকী।
তুমি পরকে ফাঁকি দিতে গিয়ে
নিজের কাজে দাও ফাঁকি।

# মাণিকের মা

প্রথমা স্ত্রী চমৎকারী বিদ্যমানে গোরাচাঁদ ঘোড়ুই কুটুম্বিতা করিতে গিয়া যখন সপ্তদশবর্ষীয়া থাকমণিকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিল, তখন চমৎকারী স্বামীকে কতকগুলা গালাগালি দিয়া এবং নিজ অদৃষ্ট-দেবতাকে বিস্তর অভিসম্পাত করিয়া স্বামীর সহিত হাঁড়ী পৃথক্ করিয়া লইল। গোরাচাঁদ উপায়ক্ষম হইলেও চমৎকারী কোনও দিনই তাহার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিত না; নিজে মাছ ধরিয়া, মাছ বেচিয়া যাহা আনিত, তাহাতেই নিজের ও স্বামীর পেটের ভাত চালাইয়া দিত। আর গোরাচাঁদ যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার অধিকাংশই তাড়ির আড্ডায়, মদের দোকানে দিয়া আসিত। কচিৎ বা স্ত্রীর জন্য একখানা কস্তাপেড়ে শাড়ী কিনিয়া আনিয়া চমিকে যে আন্তরিক ভালবাসে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত। স্বামীর ভালবাসার উপর চমির কিন্তু কোন সন্দেহই ছিল না এবং সে ভালবাসার কোনখানে কোনও একটু শিথিলতা থাকিলেও তাহাকে প্রগাঢ়ভাবে পাইবার জন্যও তেমন বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত না। সুতরাং গোরাচাঁদের চেষ্টা যে সফল হইত, এমন বলা যায় না।

তবে গত শীতের সময় গোরাচাঁদ যখন এক বছরের ছেলে মাণিকের জন্য একটা ছিটের জামা কিনিয়া আনিয়াছিল, তখন চমৎকারী সেই সাত আনা দামের ছিটের জামাটার মধ্যে কতটা গর্ব্ব নিহিত আছে, প্রতিবেশিনীদিগের নিকট কয়েক দিন ধরিয়া তাহাই জ্ঞাপন করিয়া বেড়াইয়াছিল এবং সে দিন সে যে দুইটা বড় গলদা চিংড়ী পাইয়াছিল, রমণ ঘোষ তাহার দর তিন আনা হাঁকিলেও পয়সার লোভ সংবরণ করিয়া তাহার ঝোল রাঁধিয়া গোরাচাঁদকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল। গোরাচাঁদ ভাতের পরিবর্ত্তে এক ভাঁড় তাড়ির সঙ্গে চিংড়ী দুইটার সদ্ব্যবহার করিলেও চমৎকারী তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই।

কিন্তু কুটুম্বিতায় গিয়া গোরাচাঁদ যখন নূতন সঙ্গিনী লইয়া আসিল, তখন স্বামীর এই ব্যবহারটা তাহার হৃদয়ের মুদ্গরের আঘাত অপেক্ষা কঠোর বলিয়া চমির বোধ হইল। সে পরদিনই রান্নাচালার অপর পার্শ্বে একটা উনান কাটিয়া পৃথক্ হাঁড়িতে রাঁধিয়া খাইল।

গোরা বলিল, "যখন হাঁড়ি আলাদা করেছিস্, তখন আমার কাছে তোর এক পয়সাও পিত্যেশ আর নাই, তা ব'লে রাখছি।"

মুখভঙ্গী করিয়া হাত দুইটা নাড়িয়া চমি বলিল, "আরে আমার পিত্যেশ রে! তোর পিত্যেশ আমি করি?"

গোরা ক্রোধ-গম্ভীর-স্বরে বলিল, "এই কথা তো?"

গর্জ্জন করিয়া চমি বলিল, "হাঁ, এই কথা। আমি এক বাপের বেটী, আমার কাছে দোতা কথা নাই।"

প্রতিবেশীরা তিরস্কার করিয়া বলিল, "হাঁ লা মাণ্‌কের মা, তুই তো বড্ড হাবা মেয়ে। ও আপদটাকে ঝাঁটা মেরে না তাড়িয়ে নিজেই আলাদা হলি?"

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গি করিয়া চমি উত্তর করিল, "চুলোয় যাক্ মা, ও মুখপোড়া মিন্‌ষে ক্ষেপেছে ব'লে আমিও কি ওর সাথে পাগল হ'তে যাব?"

প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতির স্বরে বলিল, "সত্যি বাছা, গোরারই বা আক্কেলখানা কি? বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ!"

"মরণ ছট্‌ফটানি মা, মরণ ছট্‌ফটানি" বলিয়া চমি দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

"থাকি!"

গম্ভীরস্বরে থাক উত্তর দিল, "কেন?"

চমি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোদের হরিবাসর না কি?"

থাক কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে আপনার পরিহিত বস্ত্রের অপর প্রান্তটা সেলাই করিতে লাগিল। চমি একটু অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোদের রান্না চড়বে না?"

থাক বলিল, "এক মুঠো পান্তা ছিল, আমানি দিয়ে তাই খেয়েছি।"

সহাস্যে চমি বলিল, "তুই পান্তা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছিস্, আর মিন্‌ষে এসে বুঝি তোর পেটে হাত বুলুবে?"

ঝঙ্কারের সুরে থাক বলিল, "পেটে হাত বুলুবে কি মাথায় হাত বুলুবে—সেই জানে। চাল না থাকলে কি রাঁধবো? ছাই?"

ঈষৎ হাসিয়া চমি বলিল, "রেঁধে দিতে পারলে

মিন্‌সে নূতন গিন্নীর হাতের একটা নূতন জিনিস খেতে পায় বটে। কিন্তু দিতে পার্‌বি কি ?"

থাক নাসা কুঞ্চিত করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। চমি বলিল, "তা চাল নাই তো মিন্‌সেকে বলিস্ নি কেন ?"

থাক মুখখানা বিকৃতি করিয়া বলিল, "কে রাতদিন বল্‌তে যাবে ? কাল সাঁজের বেলায় বল্লুম, তা রা কর্‌লে না।"

চমি হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তবেই তুই ফলনা ঘোড়ুয়ের ভাত খেয়েছিস্।"

থাক ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। চমি ভাতের হাঁড়ি হইতে কয়েকটা ভাত তুলিয়া লইয়া টিপিতে টিপিতে বলিল, "তা কারো ঘর থেকে আধসের চাল ধার ক'রে আন্‌লেও তো পারিস্।"

ঝঙ্কার দিয়া তীব্র-কণ্ঠে থাক বলিল, "কোথায় ধার কত্তে যাব ? কে ধার দেবে ?"

চমি বলিল, "ধার নিবি. শোধ করবি, তা ধার দেবে না কেন ?"

"আমার এমন বাপ চোদ্দপুরুষে পরের দোরে চাল ধার ক'রে বেড়ায় না।" বলিয়া থাক সপত্নীর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

চমি আর কিছু বলিল না। ভাতের হাঁড়ি উনান হইতে নামাইয়া ফেন ঝাড়িল এবং মাছ রাঁধিয়া ছেলেকে ভাত খাওয়াইতে বসিল। থাক কাপড় শেলাই শেষ করিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

ছেলেকে খাওয়াইয়া, ভাতের হাঁড়িতে চাপা দিয়া চমি জাল লইয়া তাহার ছিন্ন অংশের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল এবং মাঝে মাঝে মুখ ফিরাইয়া উঠানের জাম-গাছের ছায়াটা উত্তরদিক্ হইতে কতটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল।

গামছা পরিয়া ভিজা কাপড়খানা গায়ে জড়াইয়া শুকাইতে শুকাইতে গোরা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল এবং ঘরের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ডাকিল, 'থাক !'

দুই তিন ডাকের পর থাক উত্তর দিল, "কি ?"

গোরা একটু উচ্চস্বরে বলিল, "এমন সময় শুয়ে ? ভাত দিতে হবে না ?"

থাক উঠিয়া বসিয়া উত্তর দিল, "ভাত কোথা ?"

গোরা বলিল, "ভাত নাই ত কি আছে ? চিঁড়ে দই ?"

ক্রোধ-গম্ভীর-স্বরে থাক বলিল, "না, আমার মাথা।"

চমি গভীর মনোযোগের সহিত জাল সংস্কার করিতে লাগিল। গোরা ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার মাথাটা তাড়ির সঙ্গে হ'লে মন্দ হ'তো না। কিন্তু এখন ওটা তুলে রাখ।"

থাক কোনও উত্তর দিল না। গোরা গামছা ছাড়িয়া কাপড় পরিতে পরিতে বলিল, "সত্যি, আজ রান্না হয় নি না কি ?"

থাক উত্তর দিল, "চাল কোথায় যে রাঁধবো ?"

"তবে খাব কি ?"

"আমার মাথা।"

গোরা ঘরের ভিতর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা একবার নিক্ষেপ করিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চমিকে লক্ষ্য করিয়া গোরা বলিল, "সেরটাক চাল ধার দিতে পারিস্ মাণকের মা ?"

জাল হইতে মুখ না তুলিয়াই চমি বলিল, "আমার চাল বাড়ন্ত।"

গোরার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; সে নীরবে বসিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল। চমি বলিল, "আমার হাঁড়িতে ভাত আছে, খাবি ?"

"না।"

"খেলে দোষ হবে না কি ?"

"হাঁ।"

"চাল ধার ক'রে খেলে দোষ হবে না, আর ভাত খেলে দোষ হবে ?"

"চাল ধার নেব, শোধ দেব; ভাত ধার নেওয়া যায় না, শোধও দেওয়া যায় না।"

"তা না হয় একদিন অমনই খেলি ?"

"উপোস দিয়ে শুকিয়ে মলেও নয়।"

"তবে তাই মর !" বলিয়া চমি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভাত বাড়িয়া স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া খাইতে বসিল। গোরা গম্ভীরভাবে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

চমি খাইতে খাইতে এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া স্বামীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গোরা হুঁকা রাখিয়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। চমি আর দুই এক গ্রাস মুখে তুলিয়াই মুখখানা বিকৃত করিল। তখনও অর্দ্ধেক ভাত পাতে পড়িয়া ছিল; সেগুলা দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া পাথরশুদ্ধ তুলিয়া রাখিল, এবং হাত-মুখ ধুইয়া ছেলেটাকে লইয়া দাবার এক পাশে শুইয়া পড়িল।

(৩)

দ্বিতীয় পক্ষকে লইয়া গোরাচাঁদ একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিল। আগে চমিই সংসার চালাইত,

সে নিজের উপার্জ্জনের পয়সা মদে তাড়িতে উড়াইয়া আমোদে দিন কাটাইত। কিন্তু চমি হাঁড়ি পৃথক্ করিলে তাহাকে সংসারের ভার লইতে হইল, সুতরাং আমোদের মাত্রটা কমিয়া আসিল। ইহাতে গোরাচাঁদ ক্ষোভ ব্যতীত একটুও আনন্দ অনুভব করিল না। সঙ্গীরা যখন তাড়ির ভাঁড় বা মদের বোতল লইয়া ফুর্ত্তির ফোয়ারা ছুটাইতে যাইত, তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোরাচাঁদকে ক্ষুণ্নমনে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে হইত। যে দিন প্রলোভনটা নিতান্ত অসংবরণীয় হইয়া উঠিত, যা সঙ্গীদের সাদর অহ্বান ও অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারিত না, সে দিন ঘরে ফিরিয়া শুধু যে চাউলের অভাবে উপবাস দিতে হইত, তাহা নহে, সেই সঙ্গে থাকর তর্জ্জন-গর্জ্জন ও তীব্র বাক্যবাণ তাহাকে নীরবেই সহ্য করিতে হইত। যে দিন একটু অসহিষ্ণু হইয়া পড়িত, সে দিন থাককে দুই এক ঘা দিয়া আপনার অবিমৃশ্যকারিতাজনিত ক্ষোভটাকে দূর করিবার চেষ্টা করিত। তাহাতে কিন্তু ব্যাপারটা এমনই বীভৎস হইয়া দাঁড়াইত যে, তজ্জন্য গোরাচাঁদকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। থাকর কান্নার চীৎকারে পাড়ার মেয়ে পুরুষ আসিয়া জড় হইত। তাহাদের কেহ থাকর দোষ দিয়া, কেহ বা গোরাকে দোষী করিয়া, সেই ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে যে একটা আদালতের বিচারের অভিনয় আরম্ভ করিত, তাহা গোরাচাঁদের পক্ষে নিতান্তই অসহনীয় হইয়া পড়িত।

কিন্তু সব চেয়ে অসহ্য হইত চমির হাসিটা। এই বিচার-বিতর্কের কোলাহলের মধ্যে চমি এক পাশে দাঁড়াইয়া মিটি-মিটি হাসিত, সেইটাই গোরার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অসহনীয় হইয়া পড়িত। সেই শব্দহীন হাসিটুকুর মধ্যে এমনই একটা তীব্র তিরস্কার ধ্বনিত হইতে থাকিত যে, তাহাতে গোরার মাথার শিরগুলা পর্য্যন্ত টন্ টন্ করিয়া উঠিত। তাহার ইচ্ছা হইত, সে নদীতে গিয়া ঝাঁপ দেয়, অথবা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে।

তবে সকল দিনই চমি এই শ্লেষের হাসিটুকু হাসিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। যে দিন গোরাচাঁদের নেশার ঝোঁকটা একটু বেশী থাকিত, এবং প্রহারের মাত্রাটা অধিক দূর অগ্রসর হইবার উপক্রম করিত, সে দিন আগে হইতেই মাঝে পড়িয়া হয় স্বামীকে, নয় থাককে টানিয়া আনিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিত। ইহাতেও যে গোরা আঘাত পাইত না, এমন নয়। নেশার ঝোঁক কাটিয়া গেলে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত, আর কোনও দিনই সে তাড়ির আড্ডায় বা মদের দোকানের ছায়া স্পর্শ করিবে না। কিন্তু প্রলোভনের নিকট প্রতিজ্ঞা চিরদিনই পরাভূত। সুতরাং গোরাকে সময়ে সময়ে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে হইত।

তাহার এই প্রতিজ্ঞা-বিচ্যুতির জন্য চমি কিন্তু স্বামীকে দোষী মনে করিত না। পুরুষমানুষ এইরূপই অসংযত হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য মেয়েমানুষকে ধীর-সংযতভাবে সংসারের ভার মাথায় লইতে হয়। কিন্তু থাক সে ভার লইতে সম্পূর্ণ নারাজ। এমন দুলদুলে গতর লইয়া বসিয়া খাইবে, উপবাস দিবে, মার খাইয়া পাড়ার লোক জড় করিবে, তথাপি জাতি-ব্যবসা করিবে না। সকাল হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত মাছ ধরিলে চার পাঁচ আনার মাছ হয়। তাহাতে দুটা পেটের ভাতের জোগাড়টা হইয়া যায়; কিন্তু স্বামী এক পয়সার মাছ কিনিয়া আনিবে, তবু সে পাঁচটা মাছ ধরিয়া সুসার করিবে না। এমন মেয়েমানুষের কপালে কি সুখ থাকে

চমি সপত্নীকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু থাক কিছুতেই জাল ঘাড়ে করিতে স্বীকৃত হইল না। চমি তাহাকে এবং তার কপালকে গালাগালি দিয়া নিরস্ত হইল। শুধু তাহাই নয়, এমন লক্ষ্মীছাড়া মেয়েকে ঘরে আনার জন্য স্বামীর উপরেও হাড়ে হাড়ে রাগিয়া গেল। আগে সে মধ্যে মধ্যে গোপনে হাড়ির ভাত বাড়িয়া উভয়কে উপবাস হইতে রক্ষা করিত; ভাল মাছ পাইলে কতকটা দিয়া আসিত; কিন্তু এখন হইতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল, এবং সে কুটা ছিঁড়িয়া এই দুইটি লোকের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

কিন্তু সে দিন গোরাচাঁদ অভুক্ত অবস্থায় বাহির হইয়া গেলে ক্ষুধা সত্ত্বেও পাতের ভাতগুলার উপর যখন অরুচি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে এই প্রতিজ্ঞাটা বজায় রাখিতে পারিবে কি না, সেই সম্বন্ধে তাহার যেন একটা সন্দেহ জন্মিল।

কিন্তু ছিঃ, যে উপবাসটাকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার ...... লইল, অথচ তাহার হাঁড়ির ভাত খাইতে অস্বীকার করিল, উপবাস দিয়া শুকাইলেও তাহার ভাত খাইবে না বলিয়া মুখের উপর চোটপাট জবাব দিয়া গেল, তাহার জন্য আবার মমতা কি? হইলই বা সে স্বামী। স্বামী হইয়া সে কোন দিন নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে? স্ত্রীকে প্রতিপালন করা দূরের কথা, স্ত্রীই বরং তাহাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রতিদানে সে এই একটা লক্ষ্মীছাড়া মাগীকে আনিয়া তাহার বুকে যেন বাঁশ পুঁতিয়া দিল। ... বৎসর

বিবাহ হইয়াছে ; এই সাত বৎসর কাল চমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, সুখ অসুখ, সকল তুচ্ছ করিয়া যাহাকে খাওয়াইয়া আসিল, সেই লোকটাই আজ নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় তাহার অন্নকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে রীতিমত অপমান করিয়া গেল। এই লোকটার জন্যই আবার মনের এত চাঞ্চল্য! চমি মনকে চোখ রাঙাইয়া বলিল, খবরদার!

সন্ধ্যা হইলে চমি ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়াইল। তার পর ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া দুপুর বেলার পান্তের ভাতগুলো খাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিল। শুইবার আগে একবার অপর ঘরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "থাকি, ঘুমিয়েছিস্ না কি?"

অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে থাক উত্তর দিল, "না।"

চমি বলিল, "এখনো ফির্‌লো না। রাত তো দুঘড়ি হলো, গেল কোথায়?"

যেন গম্ভীর উপেক্ষার স্বরে থাক উত্তর দিল, "কে জানে।"

নিজের ঘরের বাঁশের আগড় ভেজাইয়া দিয়া চমি শুইয়া পড়িল। শুইল বটে, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। লোকটার সন্ধ্যার সময়েই ফিরিবার কথা, অথচ এত রাত্রি পর্য্যন্ত কেন ফিরিল না, এই চিন্তাটা মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল। চমি জোর করিয়া সে চিন্তাটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল, এবং তজ্জন্য কাল বামুনপুকুরে মাছ ধরিবে, বা জোমড়ার খালে যাইবে, তাহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু স্বল্পকালমধ্যেই যখন সে মীমাংসা হইয়া গেল, অথচ তখনও চোখে ঘুম আসিল না, তখন সে আর একটা নূতন চিন্তা জুটাইয়া লইল।

তাহার মাণিক—এই দেড় বছরের ছেলেটুকু কত দিনে বড় হইবে? বড় হইয়া সে যখন মাছ ধরিতে শিখিবে, তখন চমি আর জাল ঘাড়ে করিয়া ঘুরিতে যাইবে না। বড় জোর সে বাজারে গিয়া মাছগুলা বেচিয়া আসিবে। পয়সা যাহা পাইবে সব খরচ করিবে না। কিছু কিছু জমাইয়া চার গণ্ডা সাড়ে চার গণ্ডা টাকা হইলে একটি বৌ ঘরে আনিবে। তার পর মাণিকের আবার ছেলে হইবে। এত আশাও মানুষে করে? কিন্তু আশা লইয়াই সংসার। তখন আজ যেমন মাণিক পাশে শুইয়া আছে, এমনই করিয়া নাতিটিকে পাশে রাখিয়া ঘুম পাড়াইবে। আর ঐ হতচ্ছাড়া মিন্‌সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে থাকিবে। সে কিন্তু কিছুতেই নাতিটিকে ঐ মিন্‌সের কাছে যাইতে দিবে না। সে থাকিকে লইয়া আসিয়াছে, তাহাকে লইয়াই থাকিবে।

(৪)

"থাক!"

চমি কান খাড়া করিল। থাক কি উত্তর দিল, শুনা গেল না। গোরাচাঁদ বলিল, "পয়সা যোগাড় ক'রে চাল নিয়ে আস্‌তে রাত হয়ে গেল। এখন উঠে ভাত চাপিয়ে দাও।"

থাক উত্তর দিল, "এই রাত দুপুরে আমি রাঁধতে পারবো না।"

গোরাচাঁদ বলিল, 'না রাঁধলে খাব কি?"

থাক বলিল, "তা আমি জানি না।"

গোরাচাঁদ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "কিন্তু মাণ্‌কের মা নিশুতি রাতে উঠিয়া আমাকে রেঁধে দিয়েছে।"

চড়া গলায় থাক বলিল, "তবে মাণ্‌কের মার কাছেই যাও না, দেখি—কেমন রেঁধে দেয়।"

"আচ্ছা" বলিয়া গোরাচাঁদ চমির ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, "মাণ্‌কের মা!"

চমি চোখ দুইটা জোরে টিপিয়া পড়িয়া রহিল। গোরাচাঁদ আগড়ে ধাক্কা দিতে দিতে ডাকিল, "মাণ্‌কের মা—ও মাণ্‌কের মা!"

চমি উত্তর দিল না, পাছে শব্দ হয় বলিয়া নিঃশ্বাসটি পর্য্যন্ত ফেলিল না। গোরাচাঁদ আর দুই একবার ডাকিয়া, 'দূর হোক্' বলিয়া চাউলের পুঁটুলিটা নিজের ঘরের দাবায় ধপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। চমির ইচ্ছা হইল, উঠিয়া রাঁধিয়া দেয়। কিন্তু তখনি মনে হইল, কেন সে রাঁধিতে যাইবে? সুয়ো রাণী দিক্ না। মিন্‌ষের যে বড় তেজ? চোখ টিপিয়া ভাবিতে ভাবিতে চমি ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে চমি থাককে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁলা থাকি, কাল কখন্ ফির্‌লো?"

থাক বলিল, "অনেক রাতে।"

চমি বলিল, "সেই রাতে তোকে আবার রাঁধতে হলো?"

মুখটা ভারি করিয়া থাক উত্তর করিল, "বোয়ে গেছে আমার রাঁধতে।"

চমি। খেলে কি?

থাক। কি আবার খাবে? হরিমটর।

চমি। দু'জনে ভাগ ক'রে খেয়েছিলি বোধ হয়?

থাক একটু শ্লেষের হাসি হাসিল। থাক উত্তর না দিয়া গাম্ভীরভাবে রহিল। চমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কেন, উঠে এক মুঠো রেঁধে দিতে পার্‌লি নে?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া থাক উত্তর দিল, "না।"

তীব্র ভ্রূভঙ্গী করিয়া চমি বলিল, "ধন্যি মেয়ে তুই যা হোক। মানুষটা সারা দিন-রাত না খেয়ে রইলো আর তুই এক মুঠো রেঁধে দিতে পার্‌লি না?"

ঠোঁটটাকে উল্টাইয়া তীব্রকণ্ঠে খাক বলিল, "এত দরদ তো তুমি উঠে রেঁধে দিলে না কেন? তোমার দরজায় গিয়ে তো মাথা কুটলে, একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না; এমন আল্‌গা দরদ সবাই দেখাতে পারে।"

বলিয়া সে চমির মুখের কাছে আপনার হাত দুইটা নাড়িয়া দিল। চমিও উত্তরে চড়া সুরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। গোরা মুখ হাত ধুইয়া উপস্থিত হইল, এবং খাককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ আর খাটতে যাব না। সকাল সকাল রান্না চাপিয়ে দাও, আমি ছিপটা নিয়ে দেখি, দুটো মাছ যদি পাই।"

এই নির্লজ্জ পুরুষটার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চমি সরিয়া আসিল, এবং জালখানা ঘাড়ে লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন চমি বুঝিল, স্বামী একেবারে গোল্লায় গিয়াছে। ঐ হতচ্ছাড়া মাগীটা নিশ্চয়ই উহাকে গুণ করিয়াছে; সেই গুণের প্রভাবে উহার আর মাথা তুলিবার সাধ্য নাই। সুতরাং স্বামীকে এখন আর কোনও কথা বলা বৃথা। চমি সেই দিন হইতে স্বামীর চিন্তা পরিহার করিবার সঙ্কল্প করিল, এবং মনকে অনেক বুঝাইয়া সেইরূপে চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

৫

বাজারে যাইতে যাইতে প্রতিবেশী জগার মা বলিল, "ওলো চমি, আর শুনেছিস্, আমার বোন-জামায়ের ভাই রঘোকে দেখেছিস্ তো?"

চমি কৌতূহলান্বিত হইয়া বলিল, "দেখেছি বৈ কি খুড়ী, সে যে কতবার তোমাদের ঘরে এসেছিল। তার কি হয়েছে?"

জগার মা বলিল, "হতভাগা একটা বৌ থাক্‌তে আর একটা বিয়ে করেছিল। এই তোরি মত আর কি?"

চমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?"

জগার মা বলিল, "তার ঐ আগেকার বৌটা সোয়ামীকে বশ কর্‌বার তরে গুণ করেছিল। কি শেকড়-মাকড় না গুঁড়ো খাইয়ে দিয়েছিল, তাতে ছোঁড়া একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে।"

চমি শিহরিয়া উঠিল, শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি খুড়ী?"

জগার মা বলিল, "আর বাছা, শেকড়-মাকড়ের কি গুণ, কি বলা যায়? কোনও শেকড়ে মানুষ মরে, কোনও শেকড়ে বাঁচে।"

চমির মাথার চুলগুলা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে খাড়া হইয়া উঠিল। খাকিও যদি এইরূপ কোনও শিকড় খাওয়াইয়া থাকে? যদি কেন, নিশ্চয় খাওয়াইয়াছে। নতুবা তেমন রাগী পুরুষটা কি এমন ভেড়া বনিয়া যায়? রূপ-যৌবন? কিসের রূপ-যৌবন? তাহারও ত এক সময়ে রূপ-যৌবন ছিল; আর তাহা খাকির অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন ছিল না, বরং অনেকটা বেশীই ছিল। কিন্তু কৈ, তাহার মোহে স্বামী তো ভেড়া বনে নাই; পান হইতে চুণটি খসিলেই অনর্থ বাধাইয়া দিত। কিন্তু এখন? নিশ্চয়ই কিছু খাওয়াইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে শেষে যদি পাগল হয়? বুঝি তাহার লক্ষণও একটু একটু দেখা দিয়াছে। এখন প্রায়ই একা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে। এমন চুপ করিয়া তো কখনও থাকিত না। তবে কি সত্যই পাগল হইয়া যাইবে?

কথাটা ভাবিতেও চমির নিশ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। এ দিকে জগার মা "গুণ" সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও শ্রুত নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু সে সকল কথা চমির কানে ঢুকিতেছিল না; সে শুধু স্বামীর পরিণামচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া স্তব্ধভাবে পথ অতিবাহন করিতেছিল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা খুড়ী, এর কি কাটান নাই?"

"কিসের কাটান?"

"এই "গুণ" করার?"

"কাটান থাক্‌বে না কেন? তবে সবাই কি জানে?"

"কে জানে?"

"রঙ্গপুরের চৈতন্য মালিক এক জন মস্ত গুণীন্। সে নাকি সব রকম তুক্‌তাক্ জানে।"

চমি ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। জগার মা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ, চমি, কিছু মনে করিস্ না, আমার কিন্তু সন্দ হয়।"

রুদ্ধশ্বাসে চমি জিজ্ঞাসা করিল, কি সন্দ হয় খুড়ী?"

জগার মা বলিল, "খাকি ছুঁড়ী নিজ্জস্ গোরাকে 'গুণ' করেছে। এ যদি না হয়, তবে আমি রূপো জেলের মেয়েই নই।"

একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া চমি বলিল, "আমারও তাই সন্দেহ হয় খুড়ী।"

জগার মা বলিল, "তুই এক কাজ কর্ বাছা,

একবার রঙ্গপুর যা। ভারী গুণীন্। কিছু করছে কি না, সে গুণে বলে দিতে পারবে। আর যদি কিছু করেই থাকে, তারও কাটান দিতে পারবে।"

চমি জিজ্ঞাসা করিল, "কি নেবে।"

জগার মা বলিল, বেশি কিছু নয়, পাঁচটা সুপারী আর সপাঁচ আনা পয়সা। তার পর ফল হ'লে খুসী হ'য়ে যা দিস্।"

"আচ্ছা দেখি" বলিয়া চমি দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

সেই দিন বাজার হইতে ফিরিয়া অবধি চমি স্বামীর উপর তীব্র লক্ষ্য রাখিল, এবং তাহার প্রত্যেক কাজের মধ্যেই যেন একটা পাগলামীর আভাস দেখিতে পাইল। একবার গোরা হুঁকা হাতে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। চমি আস্তে আস্তে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছিস্ মাণ্কের বাপ?"

গোরা মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাবছি, তোর মাথাটা কবে খাব?"

চমি বলিল, "আমার মাথা তো অনেক দিনই খেয়েছিস্।"

ঘাড় নাড়িয়া গোরা বলিল, "উহুঁ, সে আমি নিজের মাথা খেয়েছি! একদিন তোর মাথার ঝোল রেঁধে আমাকে খাওয়াবি চমি?"

বলিয়া গোরা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার অর্থহীন হাসি দেখিয়া চমি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল! সর্ব্বনাশ! এ যে পাগল হইয়া পড়িয়াছে! চমির বুকটা গুর্ গুর্ করিতে লাগিল।

চার দিন চমি মাছ ধরিতে গেল না। সওয়া পাঁচ আনার পয়সা লইয়া ছেলেটাকে কোলে করিয়া রঙ্গপুর যাত্রা করিল। লোকের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিল, "ছেলেটার তরে দিগড়ের পঞ্চানন্দের ফুল আন্তে যাচ্ছি।"

৬

জগার মা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'লো চমি?"

চমি বলিল, "যা বলেছ খুড়ী, মস্ত গুণীন্। গুণে হু-বহু সব ব'লে দিলে। পানের সঙ্গে গুঁড়ো খাইয়েছে। তাই তো বলি, মিন্‌ষে এত করে কেন?"

সগর্ব্বে শিরঃসঞ্চালন করিয়া জগার মা বলিল, "এই দেখ্, আমি তো বলেছি, ঐ ছুঁড়ীই তোর মাথা খেয়েছে। কিছু ওষুধপত্র দিলে?"

চমি বলিল, "তিনটে শেকড় দিয়েছে। ভাতের সঙ্গে হোক্, কি তরকারির সঙ্গেই হোক, খাওয়াতে হবে।"

ব্যস্তভাবে জগার মা বলিল, "তবে আর কি, খাইয়ে দে। ও অকাট্টি ওষুধ। দেখবি, ঐ গোরা যদি তোর পায়ে লুটিয়ে না পড়ে, আমাকে খুড়ী ব'লেই ডাকিস্ নে।"

সলজ্জে হাসিয়া চমি বলিল, "তোমার এক কথা খুড়ী।"

জগার মা হাসিয়া উঠিল। চমি বলিল, "কিন্তু ভাবছি খুড়ী, কি করে খাওয়াব? আমার ঘরে তো খায় না।"

জগার মা বলিল, "তাতে কি? ছেলের জন্ম-তিথি কি এমন একটা অছিলে ক'রে ওদের দু' মানুষকে নেমন্তন্ন কর্ না।"

খুড়ীর এই উপদেশ চমি শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

পর দিন চমি স্বামী ও সপত্নীকে নিমন্ত্রণ করিল। খুব সকালে উঠিয়া কয়েকটা বড় বড় চিংড়ী মাছ ধরিয়া আনিল; বাজার হইতে আলু-পটোল কিনিয়া আনিয়া আড়ম্বরসহকারে রন্ধনের উদ্যোগ করিল।

রন্ধন শেষে চমি স্নান করিয়া আসিয়া এলো-চুলে ভিজা কাপড়ে শিকড় তিনটা বাটিতে বসিল। শিলের উপর শিকড়গুলাকে ফেলিতেই হঠাৎ তাহার বুকটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এও তো একটা অজানা শিকড়, ইহার গুণ কি, কে জানে! যদি ইহাতেই কোনও অমঙ্গল হয়, যদি এগুলা বিষাক্ত হয়? বাটিতে গিয়া চমি ভয়ে ভয়ে হাত গুটাইয়া লইল।

না না, চৈতন্য মালিক খুব ভাল গুণীন্। সে কি না জানিয়াই ইহা দিয়াছে? ইহাতে নিশ্চয়ই থাকির ঔষধের গুণ কাটিয়া যাইবে। শুধু স্বামীর পাগলামীর ভয়ই দূর হইবে না, থাকি তাহার চোখের বিষ হইবে। যেমন তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছিল, তেমনই ফল পাইবে।

চমি দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া জোরে জোরে শিকড়গুলা বাটিয়া ফেলিল, এবং সেই বাটা শিকড় লইয়া স্বামীর ঝোলের বাটিতে মিশাইয়া দিল।

৭

গোরা খাইতে বসিয়াছিল, চমি কম্পিতহস্তে তাহার পাতের কাছে ঝোলের বাটিটা ধরিয়া দিল। গোরা একটু হাসিয়া বলিল, "তোর বেটার বিয়ে না কি মাণ্-কের মা?"

চমি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "না বেটার বাবার বিয়ে।"

সহাস্যে গোরা বলিল, "তোর সাথে বুঝি?"

চমি হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না। সে মুখ ফিরাইয়া পাথরবাটিতে অম্বল ঢালিতে লাগিল। গোরা ঝোলের বাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "জোরড়ার খালের চিংড়ী বুঝি? অনেক দিন তোর হাতের ঝোল খাই নি মাণ্‌কের মা, দেখি আজ কেমন রেঁধেছিস্।"

চমির বুকটা দুড়্ দুড়্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে লাগিল। গোরা তখন এক গণ্ডূষ ঝোল লইয়া মুখের কাছে তুলিয়াছে। চমি পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। গোরা হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার উদ্বেগস্ফীত আরক্ত মুখের দিকে চাহিল।

স্বামীর হাতটা নিজের কম্পিত-হস্তে ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চমি বলিল, "সত্যি ক'রে বল্ দিখি মিন্‌ষে!"

বিস্ময়জড়িতস্বরে গোরা বলিল, "কি বল্‌বো মাণ্‌কের মা?"

"থাকি তোকে গুণ্ করেছে?"

গোরা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুই পাগল হয়েছিস্?"

উত্তেজিত কণ্ঠে চমি বলিল, "আমি পাগল হই নি মিন্‌ষে, তুই পাগল হ'তে বসেছিস্।"

"তোর মাথা!" বলিয়া গোরা হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। চমি তাহার হাতটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া কাম্পত-কণ্ঠে বলিল, "থাম্, সত্যি বল্, তুই পাগল হবি না?"

গোরা বলিল, "তোর জ্বালায় বোধ হয় এবার হবো। হাত ছাড়, ক্ষিদের সময় ন্যাক্‌রা ভাল লাগে না।"

বলিয়া সে চমির হাত হইতে আপনার হাতটা ছিনাইয়া লইল, এবং হাসিতে হাসিতে পুনরায় ঝোলের বাটিতে হাত দিল। চমি দুই হাতে ধরিয়া ঝোলের বাটিটা আহার সম্মুখ হইতে তুলিয়া লইল, এবং বাটি সমেত ঝোলটা উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। গোরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি চমি?"

চমি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওতে ওষুধ মেশান আছে রে মিন্‌ষে, ও ঝোল বিষ!"

বিস্ময়স্তব্ধকণ্ঠে গোরা বলিল, "কে ওষুধ মেশালে চমি?"

চমি বলিল, "আমি মিশিয়েছি। থাকি তোকে গুণ্ করেছে, তারই কাটান ওষুদ ওতে আছে। চুলোয় যাক্ থাকি, তুই ওঠ মিন্‌ষে, আমার ঘরে তোর খেতে হবে না।"

বলিয়া গোরার হাত দুইটা ধরিয়া টানিতে লাগিল। গোরা তাহার উদ্বেগচঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাস্য-প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, "তা হচ্ছে না চমি, আজ থেকে তোর হাতে ছাড়া যদি আর কারও হাতে খাই, তবে আমি রামু ঘোড়ুয়ের ছেলেই নই। থাকি যদি আমাকে গুণ্ ক'রে থাকে, তবে সে গুণের কাটান তোর হাতেই আছে।"

চমি তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া পাতের কাছে বসিয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওরে মিন্‌ষে, তুই হাসছিস্ কি ক'রে! আমি যে তোকে বিষ খাওয়াতে গিয়েছিলাম! আমাকে ঝ্যাঁটা মার্‌লেও যে আমার শাস্তি হয় রে মিন্‌ষে।"

গোরা হাসিয়া বলিল, "মার্‌বো এবার যে দিন হাঁড়ি আলাদা কর্‌বি। এখন উঠে আর ঝোল থাকে তো দে। মুখে আগুন তোর, অমন বড় বড় চিংড়ী দু'টো নষ্ট ক'রে ফেল্‌লি।"

চমি সক্‌ড়ী-হাতেই চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হাসিতে হাসিতে বাকী ঝোলটা গোরার পাতে ঢালিয়া দিল। গোরা হাসিতে হাসিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ও থাকি, আমাকে ওষুদ খাওয়াচ্ছে—দেখে যা।"

হাস্যোচ্ছ্বসিতকণ্ঠে চমি বলিল, "রেখে দে তোর থাকি! আমি কি আর তোর থাকিকেই ভয় করি, না তোকেই ডরাই রে মিন্‌ষে? আমি আবার সেই চমি, সেই মাণ্‌কের মা!"

# চৌকিদার

তারাচাঁদ মালিকের ছেলে গোরাচাঁদ মালিক চার টাকা মাহিনার চৌকীদারী পদ পাইয়া যে দিন মাথায় নীল পাগড়ী, কোমরে বেঙ্গল পুলিশের তকমা বাঁধিয়া লাঠী ঘাড়ে বাহির হইল, সে দিন পাড়ার মেয়ে পুরুষ গোরার মায়ের সুখসৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। আহা, গোরার মা তিন বছরের এই ছেলেটিকে লইয়া বিধবা হইয়াছিল। তার পর সে কত কষ্টে, কত দুঃখে যে ছেলেটিকে মানুষ করিয়াছে, তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। আজ সেই ছেলে চাকরী পাইয়াছে; যেমন তেমন চাকরী নয়, সরকারী চাকরী, পুলিশের কাজ। কত বড় পদ, কত মান! উহার একটা ডাকে দেশের ছোট বড় সকল লোককে তটস্থ হইতে হইবে। আহা, গোরার মার কি কপাল!

কিন্তু গোরার মার এই শুভাদৃষ্ট সকলেরই যে আনন্দদায়ক হইল, তাহা নহে; পাড়ার আর যাহারা এই সম্মানিত পদের প্রার্থী হইয়াছিল, তাহারা হতাশ হইয়া গোরার উপর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিদারী কাজের মত নিকৃষ্ট কাজ যে আর নাই, ইহাই প্রকাশ করিয়া আপনাদের অকৃতকার্য্যতাজনিত মনস্তাপ দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইল।

তাহারা এইরূপে আপনাদের মনঃক্ষোভ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিলেও এক জন কিন্তু কিছুতেই আপনার অকৃতকার্য্যতা-জন্য ক্ষোভ দূর করিতে পারিলেন না। তিনি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কি অর্থে, কি জ্ঞানে, কি মানে চাটুয্যে মহাশয়ের সমকক্ষ গ্রামে আর কেহ ছিল না। বল্লাল সেনের প্রদত্ত কুলগৌরব বহুপুরুষ পূর্ব্বে হারাইয়া গেলেও তিনি আপনাকে কুলীন বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে ছাড়িতেন না। হাতে পয়সাও কিছু ছিল, রাত দুপুরে হাত পাতিলে তিনি দুই এক শত টাকা গুণিয়া দিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া মামলা মোকদ্দমায় পরামর্শ দেওয়া, ঘরোয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করা, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্মে কর্তৃত্ব করা তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহার দীর্ঘ শিখা, ঊর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড্র; কণ্ঠালম্বিত রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে অবিরাম তারা ব্রহ্মময়ী ধ্বনিতে লোকের চিত্ত আপন হইতেই ভক্তিভরে নত হইয়া পড়িত।

এ হেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ভৃত্য নফরে পিতা গোবর্দ্ধন সর্দ্দারকে আশা দিয়া রাখিয়াছিলে যে, পুব-পাড়ার চৌকিদারী পদটা তাহাকেই প্রদা করিবেন। গোবর্দ্ধনও জানিত যে, চাটুয্যে মশা চেষ্টা করিলে চৌকিদারী কেন, দারোগাগিরি পর্য্য করিয়া দিতে পারেন। এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ হইয়া সে আজ এক বৎসর স্বীয় পুত্রকে কেবল পে ভাতায় চাটুয্যে মশায়ের ঘরে রাখিয়া দিয়াছিল, এ চৌকিদারীটা পাইলে এই এক বৎসরের বেতনের দ গুণ যে পোষাইয়া যাইবে, ইহাই হিসাব করি রাখিয়াছিল।

তাহার লোকসান নিশ্চয়ই পোষাইয়া যাইত, যদি থানার বড় দারোগা প্রবীণ যজ্ঞেশ্বর দত্ত হঠাৎ বদ হইয়া না যাইত, এবং তাহার স্থলে এক বি এ পা নবীন ছোকরা আসিয়া না বসিত। চট্টোপাধ্যা মহাশয় এই নবীন ছোকরার সহিত আলাপ করিবা জন্য দুই চারিবার থানায় যাতায়াত করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার যাতায়াতই সার হইল; তাঁহার শিখা ত্রিপুণ্ড্র, রুদ্রাক্ষমালা, কিছুই কার্য্যকর হইল না নূতন দারোগার কৃপায় গোরাচাঁদই চাকরী পাইল।

গোবর্দ্ধন আসিয়া বলিল, "বাবাঠাকুর, মো মিত্তির নফরাকে বছরে দশ গণ্ডা টাকা মাইনে দিে চাইচে, আপনি কি বল?"

চাটুয্যে মশায়ের বলিবার আর কিছু ছিল না সুতরাং নফরের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দ্বিতী চাকরের অনুসন্ধান করিতে হইল, এবং আপনার এ ক্ষতির জন্য গোরাচাঁদকেই দায়ী করিয়া তাহার উপ প্রতিশোধ-গ্রহণের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু সেটা তাঁহার মনের ভিতরেই চাপা রহিল।

গোরা যে দিন প্রথম চৌকিদারীর চাপরা আঁটিয়া লাঠী ঘাড়ে থানায় হাজিরা দিতে চলিল, সে দি চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া চাটুয্যে মহাশয় ডাকিয়া বলিলেন "কি হে গোরাচাঁদ, থানায় চলেছ?"

গোরাচাঁদ হাত যোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল "এজ্ঞে বাবাঠাকুর।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে চাটুয্যে মশায় বলিলেন, "বেশ, বেশ। আমাদের এ দিক্‌টায় একটু নজর রেখ হে।"

গোরাচাঁদ বলিল, "তা রাখবো বৈ কি খুড়োঠাকুর, আমি তো আপনকারদের গোলাম।"

সহাস্যে চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, "দারোগা বাবুর তোমার উপর খুব নেকনজর আছে, না?"

গোরাচাঁদ একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "আপনকার চরণের আশীর্ব্বাদে তা একটু আছে খুড়োঠাকুর।"

চাটুয্যে মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তবে আর তোমাকে পায় কে? কিন্তু বেশ সাবধানে কাজকর্ম্ম করবে। পুলিশের চাকরী, বুঝলে কি না? কত হাঙ্গাম ফাঁসাদ আছে। বদনা বেটা ঐ ভয়েই তো পেছিয়ে গেল।"

বদন যে স্বেচ্ছায় পশ্চাৎপদ হয় নাই, ইহা জানিলেও গোরাচাঁদ সে কথার উল্লেখ না করিয়া একটু গর্ব্বিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা বৈকি খুড়োঠাকুর, এ সব কি যার তার কাজ?"

বলিয়া সে আর একটা প্রণাম ঠুকিয়া থানার অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার দিকে ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাটুয্যে মহাশয় মনে মনে বলিলেন, "রহ বেটা, তুমি কত বড় বীর, তা বুঝে নেব।"

২

গোরা প্রথম মাসের মাহিনা পাইলে গোরার মা ষোল আনা ভাজিয়া ঠাকুর-দেবতার পূজা দিল, এবং পাঁঠা কাটিয়া পাড়ার জ্ঞাতিকুটুম্বদিগকে খাওয়াইয়া দিল। তার পর গোরার মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিবার জন্য চেষ্টিত হইল। বেশী চেষ্টা করিতে হইল না। গ্রামেই বদন সর্দ্দারের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি বড় দেখিতেও মন্দ নয়। এই মেয়েটিকে বৌ করিবার জন্য অনেক আগে হইতেই গোরার মার আশা ছিল। কিন্তু তখন সে আশা পূর্ণ করিবার উপায় ছিল না. কাজেই বুড়ী মনের আশা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া সে এক দিন বদনের স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়িল। স্ত্রীর কাছে শুনিয়া বদন সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। এখন গোরা মালিক যে-সে লোক নয়, সরকারের চাকর, পুলিশের লোক!

কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেলে গোরার মা আট গুরিতে আট গাছা রূপার চুড়ী গড়াইতে দিল; পাঁচ গাঁয়ের কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিল এবং এক দল ঢোল সানাইয়ের বাজনা করিবে কি না, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিল। গোরা বলিল, "বাজনায় কাজ নাই। আমার বাপ-দাদারা কখনও বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করে নি।"

গোরার মা রাগিয়া বলিল, "তোর কোন্ বাপদাদা সরকারের চাকরী করেছে রে?"

গোরা বলিল, "চাকরী করলেই কি বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করতে হয়?"

মা বলিল, "হাঁ, হয়। না হলেও আমার সাধ হয়েছে, আমি করবো। কত দুঃখে তোকে মানুষ করেছি, তা তুই জানিস্?"

মাতার এই ইচ্ছার উপরে গোরা আর কিছু বলিতে পারিল না। সে হৃষ্টচিত্তে বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল।

সে দিন গোরাচাঁদ সকালে উঠিয়াই ঘোষপুরে কুটুম্ব-নিমন্ত্রণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় খবর পাইল, ছোট দারোগা গ্রামে আসিয়াছেন। গোরাচাঁদ নিমন্ত্রণ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পাগড়ী লইয়া দারোগা বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু দারোগা বাবু এমন ভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, যাহাতে গোরা হতবুদ্ধি না হইয়া থাকিতে পারিল না। গ্রামের লোকের সমক্ষে দারোগা বাবু তাহার উপর এমন সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন, যাহার প্রত্যুক্তি করিতে বাগদীর ছেলে গোরাচাঁদও লজ্জা বোধ করিল। গোরা লজ্জায় অপমানে যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

পরিশেষে গোরাচাঁদ দারোগা বাবুর ক্রোধের কারণ অবগত হইল। চাটুয্যে মহাশয়ের প্রজা চিন্তামণি মাইতি থানায় গিয়া এজাহার দিয়াছে, পরশু রাত্রে তাহার খড়ের গাদা হইতে তিন পণ খড় চুরী গিয়াছে। চিন্তামণি চোর ধরাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু চৌকিদার ঘুষ খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই অভিযোগের তদন্তের জন্যই ছোট দারোগা উপস্থিত হইয়াছেন।

তদন্তে খড়-চুরী প্রমাণিত হইল, কিন্তু গোরা যে ঘুষ লইয়া চোরকে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহার প্রমাণ কেহই দিতে পারিল না। অগত্যা দারোগা বাবু গোরাকে আর কতকগুলা গালাগালি দিয়াই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনায় গোরাচাঁদের যাহা খরচ হইল, তাহা তাহার এক মাসের বেতনের অধিক।

গোরা নীরবে এই ক্ষতি সহ্য করিলেও গোরার মা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। যে তাহার নিরীহ ছেলের এমন অনিষ্ট করিয়াছে, গলা ছাড়িয়া তাহাকে অভিসম্পাত দিতে লাগিল। গোরা বহুকষ্টে মাতাকে শান্ত করিয়া কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিতে চলিল।

কিন্তু নিমন্ত্রণই সার হইল। বিবাহের চারি দিন পূর্ব্বে বদন আসিয়া জানাইল যে, সে গোরার হাতে মেয়ে দিতে পারিবে না; দিলে তাহাকে বাসত্যাগ করিতে হইবে। চাটুয্যে মশায়ের জমীর উপর ঘর বাঁধিয়া সে বাস করিতেছে; গোরাকে মেয়ে দিলে চাটুয্যে মশায় তাহাকে ঘর ভাঙ্গিয়া তাড়াইয়া দিবেন। তা ছাড়া তাঁহার কাছে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা দেনা আছে; সেটাও কড়ায় গণ্ডায় আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না।

সর্ব্বনাশ! বিবাহের সব ঠিক, কুটুম্ব-নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এমন সময় বদন যে এরূপে পিছাইয়া দাঁড়াইবে, ইহা কে জানিত? গোরার মা গিয়া চাটুয্যে মহাশয়ের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং অনেক অনুনয়-বিনয়, কাঁদা-কাটা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিল। চাটুয্যে মশায় কিন্তু কিছুতেই টলিলেন না। তিনি বেশ স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, তাহার ছেলে যখন ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে পারিয়াছে এবং বাগ্দীর ছেলে হইয়া দশ জনের কাছে ব্রাহ্মণের মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে, তখন দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আসা বৃথা। ঘোর কলি হইলেও এখনও বামুনে বাগ্দীতে অনেক তফাৎ আছে। ছোট লোকের স্পর্দ্ধা যদি এরূপে বাড়িতে দেওয়া যায়, তবে কালে ভদ্রলোককে দেশে বাস করিতে হইবে না। কিন্তু ভগবানের ন্যায়বিচার আছে। তাঁহার বিচারে মানীর মান চিরকাল অটুট থাকিবে, এবং যে হতভাগা, সে সম্মান নষ্ট করিতে যাইবে, তাহাকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হইবে।

প্রসন্নতার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত লইয়া গোরার মা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। গোরা বারণ করিয়া আসিল। গোরার মা লজ্জায় কয় দিন ঘরের বাহির হইল না।

গোরা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কেন বল্ তো মা, তুই এতটা বাড়াবাড়ি করিস্? বিয়ে হলো না, তাতে হয়েছে কি?"

মা বলিল, "আমার মাথা যে কাটা গেল রে গোরা! তোদের কত্তা ঐ বদন সর্দ্দারকে জাতে তুলেছিল, আজ কি না সে তোকে মেয়ে দিলে না!"

গোরা বলিল, "সে দিলে না ঐ বামুনের ভয়ে!"

মা বলিল, "বামুনকে জব্দ করতে পারিস্ গোরা, তবেই আমার মনের দুখ্যু যাবে, তোকে পেটে ধরা সার্থক হবে।"

গোরা একটু হাসিয়া বলিল, "বামুনকে জব্দ কত্তে কতক্ষণ লাগে মা? তবে বামুন, ঐ যা ভয়।"

মা রাগিয়া বলিল, "রেখে দে তোর বামুন। যিনি দোষে বামুন আমার মুখের উপর তোকে কট কট ক'রে শাপ-মন্যিগুলো দিতে লাগলেন। আমার এমন ইচ্ছা হ'লো গোরা—"

গোরা হাসিয়া বলিল, "তুই বেটী যেন পাগল! আমি দোষে থাকি, আমাকে শাপ-মন্যি লাগবে, নয় তো আমার ভয় কি?"

মা বলিল, "তবু তো ওগুলো শুন্তে মন্দ।"

৩

চাটুয্যে মহাশয়ের একটা গুপ্ত ব্যবসায় ছিল; তিনি সময়ে সময়ে গোপনে চোরাই মাল খরিদ করিতেন। কাজটা গুপ্ত হইলেও খুব গোপনেই যে চলিত, তাহা নহে; গ্রামের অনেকেই তাঁহার এই গুপ্ত ব্যবসায়ের রহস্য অবগত ছিল। কিন্তু জানিলেও কেহ কখনও ইহা লইয়া গোলযোগ বাধায় নাই; ব্রাহ্মণকে বিপন্ন করিতে অনেকের সাহস কুলাইত না। তা ছাড়া পূর্ব্বতন দারোগা যজ্ঞেশ্বর দত্ত চাটুয্যে মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য ছিল। সুতরাং এ সম্বন্ধে কেহ কোনও উচ্চবাচ্য করিত না।

তার পর পুরাতন দারোগা বদলী হইয়া গেলে এবং তাহার স্থলে নূতন দারোগা আসিয়া বসিলে চাটুয্যে মহাশয় যখন কিছুতেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিলেন না, তখন তিনি খুব সাবধানেই ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সাবধানতা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। হঠাৎ এক দিন দলবল সহিত পুলিশ আসিয়া তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করিল। চাটুয্যে মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। আগের দিন দুই চারিখানা সোনার গহনা খরিদ করিয়াছিলেন। সেগুলাকে সরাইবার অবসর পাইলেন না। গহনাগুলা বাড়ী হইতে বাহির হইলে আর রক্ষা নাই। তারা, এ কি করিলে মা! উঃ, কোন্ পাষণ্ড বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই সর্ব্বনাশ করিল? ইহা নিশ্চয়ই গোরা বেটার কাজ। ব্রাহ্মণকে এইরূপ বিপন্ন করার পাপে ভগবান্ কি তাহার মাথায় বজ্রাঘাত করিবেন না?

কিন্তু আপাততঃ আকাশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে গোরাচাঁদের মাথায় বাজ পড়িবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না; সুতরাং সম্প্রতি নিজের মাথায় যে বাজটা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তাহারই প্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। গহনা কয়খানা কোনরূপে বাড়ীর বাহির করিতে পারিলে হয়; তার পর পুকুরের জলে ফেলিয়া দিলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু সদর খিড়কী দুই দরজাতেই লালপাগড়ীর

পাহারা। রান্নাঘরের পাশে পশ্চিমদিকের ছোট প্রাচীরটা খুব নীচু ছিল। "যা করেন মা দুর্গা ?" বলিয়া চাটুয্যে মহাশয় গহনাগুলা নেকড়ায় বাঁধিয়া লইলেন, এবং প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাহিরে পড়িলেন।

'খুড়ো ঠাকুর'; কি সর্ব্বনাশ! এখানেও যে পাহারা! পাহারায় যে-সে লোক নাই, স্বয়ং গোরাচাঁদ লম্বা লাঠি ঘাড়ে দণ্ডায়মান। একটা হিন্দুস্থানী-মিন্দুস্থানী থাকিলেও যাহা হয় দেখা যাইত, দুই একটা টাকা হাতে গুঁজিয়া দিলে ছাড়িতে পারিত, কিন্তু গোরা বেটা দশটা টাকা পাইলেও ছাড়িবে না। সে শুধু চাকরীর খাতিরে আসে নাই, প্রতিহিংসা লইতে আসিয়াছে। চাটুয্যে মহাশয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

গোরা অগ্রসর হইয়া মৃদুগম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "পাঁচীল টপকে কোথায় যাচ্ছো খুড়ো ঠাকুর ?"

চাটুয্যে মহাশয় নিরুত্তরে শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোরা আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বামাল সরাবার চেষ্টায় আছ বুঝি ?"

চাটুয্যে মহাশয় তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আমার মান-ইজ্জত আজ সব তোর হাতে গোরা। তুই আমাকে রাখ্‌তে হয় রাখ্‌, মার্‌তে হয় মার্‌।'

কয়েক বিন্দু অশ্রু টপ্‌ টপ্‌ করিয়া গোরার হাতের উপর পড়িল। গোরা মুখখানাকে বিকৃত করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। চাটুয্যে মহাশয় তাহার মুখের উপর সকাতর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাবা গোরা।"

গোরা একবার তাঁহার অশ্রুকাতর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া হাতের লাঠিটা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "তাই তো খুড়োঠাকুর!"

চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, "তাই তো নয় গোরা। আমার উপর তোর রাগ থাকে, তোর হাতে লাঠি আছে—"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হাতে ওটা কি ? বামাল বুঝি ?"

বলিয়াই সে চাটুয্যে মহাশয়ের হাত হইতে গহনার পুঁটুলীটা ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "শীগ্‌গির পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে বাড়ীর ভিতর যাও।"

চাটুয্যে মহাশয় কম্পিতপদে তাড়াতাড়ি প্রাচীরে উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। গোরা তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া প্রাচীরের উপর উঠাইয়া দিলে তিনি তথা হইতে সহজেই ভিতরে নামিলেন।

গোরা গহনার পুটুলীটা হাতে লইয়া ভাবিতে লাগিল;—কোথায় এগুলা রাখা যায় ? পুলিশ বাড়ীর আশে পাশে, বন-ঝোপ ওলোট-পালোট করিয়া দেখিবে; পুকুরে জাল নামাইয়া নীচের পাঁক পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবে। যে কোনও জায়গা হইতে বাহির হইলেই বামুনের আর রক্ষা নাই। গোরা চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নেকড়া সমেত গহনাগুলা কোমরে জড়াইল; তার পর তাহার উপরে কাপড়টা ফেরতা দিয়া পরিল এবং তাহার উপর চাপরাস আঁটিয়া লাঠি হাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুলিশ ঘর-বাড়ী আতি-পাঁতি করিয়া খুঁজিল; বাক্স, সিন্দুক খুলিয়া ভাঙ্গিয়া অন্বেষণ করিল; বন-বাদাড় উলটিয়া পালটাইয়া দেখিল; পুকুরে জাল নামাইল; কিন্তু বামাল মিলিল না। সুতরাং তাহাদিগকে হতাশচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তাহারা চলিয়া গেলে চাটুয্যে মহাশয় সমবেত প্রতিবেশীদিগকে বেশ মিষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, কলিতে ধার্ম্মিককে এইরূপ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, ইহা যুগধর্ম্মের ফল, কিন্তু যে পাষণ্ড তাঁহাকে এইরূপে অপমানিত করিল, ব্রহ্মণ্যদেব তাহার বিচার করিবেন।

ধার্ম্মিক চাটুয্যে মহাশয়ের এই অকারণ নিগ্রহে প্রতিবেশীরা দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

দারোগা বাবুকে থানায় পৌঁছাইয়া দিয়া গোরা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। সে ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে যাইতেই কোমর হইতে গহনার পুটুলীটা ঝনাৎ করিয়া পড়িয়া গেল।" সে শব্দে চমকিত হইয়া মা জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি রে গোরা ?"

গোরা বলিল, 'ওগুলো খুড়োঠাকুরের মান-ইজ্জৎ।'

বলিয়া সে মায়ের কাছে গহনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। শুনিয়া মা বলিল, "তুই আবার বামুনকে বাঁচালি রে গোরা ?"

গোরা একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি কি সাধ ক'রে বাঁচিয়েছি মা ? বামুনের যে কাতরাণি, তা দেখ্‌লে তোর বাবাকেও বাঁচাতে হতো।"

মা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "ইঃ, আমার বাবা ভৈরব সদার অমন কত বামুনের মাথা কাটিয়েছে।"

'ভারী বীরের কাজ করেছে' বলিয়া গোরা পাগড়ী গুছাইতে ব্যস্ত হইল, মা গহনার পুটুলীটা হাতে লইয়া বলিল, "কিন্তু এ পরের ধন ঘরে আন্‌লি কেন ?"

গোরা বলিল, "আজ রাতটা থাক, কা'ল সকালে দিয়ে আস্‌বো।"

গোরার মা একটা কাণাভাঙ্গা মাটীর কলসীর ভিতর পুটুলীটা তুলিয়া রাখিল।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া গোরা দেখিল, চাটুয্যে মশায় কাঁধে চাদর ফেলিয়া দ্রুতপদে কোথায় চলিয়াছেন। গোরা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "তোমার জিনিসগুলো নিয়ে যাও খুড়োঠাকুর।"

চাটুয্যে মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "এখন থাক গোরাচাঁদ, সন্ধ্যার পর চুপি চুপি নিয়ে যাব। তোকে কি অবিশ্বাস আছে? কা'ল তুই আমার যে উপকার করেছিস্ গোরা, তা জীবনে ভুলবো না।"

গোরা কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

চাটুয্যে মহাশয় দুই পদ অগ্রসর হইয়া সহসা ফিরিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ দেখ গোরাচাঁদ, বদন বেটা যাই বলুক, তোমার সঙ্গেই ওর মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে। আমি কেষ্টনগরে যাচ্ছি, ফিরে এসে আজই কথাটা পাড়ব!"

গোরা একটু লজ্জার হাসি হাসিল। চাটুয্যে মহাশয় দ্রুতপদে স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন। গোরা তামাক সাজিয়া আমগাছের তলায় বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিল। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। রাস্তার ও পাশের জঙ্গল হইতে কাঠমল্লিকার মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। পাশের গাছটায় বসিয়া একটা কোকিল উচ্চকণ্ঠে প্রভাত-গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। গোরা তামাক টানিতে টানিতে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিল—

"ঘোমটা খোল, বদন তোলো,
কথা কও বৌ, মাথা খাও।
কাছে এসে মুচকে হেসে কেনে বল স'রে যাও।"

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে পুলিশ আসিয়া যখন গোরার ভাঙ্গা ঘরখানা ঘিরিয়া ফেলিল, তখন গ্রামশুদ্ধ লোক তামাসা দেখিতে ছুটিয়া আসিল। তার পর গোরার ঘর হইতে ঘোষপুরের হাজরাদের বাড়ীর ডাকাতীর গহনা বাহির হইলে লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রাচীন তারক ঘোষ তাহাদের বিস্ময় অপনোদনার্থ বলিলেন, "এ তো জানা কথা। চৌকিদারের সঙ্গে যোগ-সাজোস না থাকলে কি চুরী-ডাকাতি হ'তে পারে?"

গোরার মা কাঁদিয়া মাথা কুটিয়া অনর্থ করিতে লাগিল। গোরা কিন্তু একটুও কাতরতা প্রকাশ করিল না বা আপনার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। শুধু মাকে বুঝাইয়া বলিল, "কাঁদিস্ কেন মা? মানুষ পরের তরে জান্ দেয়, আমি না হয় দু' বছর জেল খেটে এলাম। দু' চার বছর জেল খাটলে কি তোর ছেলে ম'রে যাবে?

চাটুয্যে মহাশয় বড় দারোগাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লেন শ্যাম বাবু, ও বেটাকে ছেলেবেলা থেকে জানি বলেই গোবর্দ্ধনকে চৌকিদার করতে চেয়েছিলাম।"

ছোট দারোগা যাদব ঘোষ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এই জন্যই বলে—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।"

পুলিশ মাল সমেত গোরাকে চালান দিল। চাটুয্যে মহাশয় বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছোঁড়া পুলিশের কাজ পেয়েছে ব'লে মদগর্ব্বেই মারা গেল। বামুন দেখলে প্রণাম পর্য্যন্ত কর্‌তো না।"

তারক ঘোষ উত্তর করিলেন, "পাপের ফল হাতে হাতেই ফলছে চাটুয্যে মশায়। শাস্ত্রেই আছে—ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের পয়।"

# কণ্ঠিবদল

১

গোবর্দ্ধন দাসের মেয়ে তুলসী উনিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া যখন কণ্ঠিবদল দ্বারা নিজের ভারটা বিপত্নীক ছিদাম দাসের উপর অর্পণ করিয়াছিল, তখন সে জানিত না যে, ছিদাম দাস বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বচরখানেক পরেই নিজের তিন বছরের ছেলের ভার তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে ইহলোক হইতে পলায়ন করিবে। সুতরাং ছিদামের এই আকস্মিক প্রস্থানে তুলসী তাহার শোকে যতটা কাতর না হইল, তদপেক্ষা অধিক কাতর হইল, তাহার প্রদত্ত ভারের গুরুত্ব অনুভব করিয়া। ছিদাম নাম গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইত; মৃত্যুকালে সে যে সাড়ে সাত টাকা রাখিয়া গেল, তাহা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই খরচ হইয়া গেল। সুতরাং তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া, দুই চারিখানা পিতল-কাঁসার বাসন, একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্স, একটা একতারা আর গুপীকে লইয়া তুলসী বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

বাপের বাড়ীতেও কেহ ছিল না; শুধু বাপের

ভিটার উপর একখানা জীর্ণ ঘর ছিল। তাহাও সংস্কারাভাবে পতনোন্মুখ। তুলসী তাহারই ভিতর মাথা গুঁজিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু দিন যে কিরূপে চলিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

বাপের জ্ঞাতি খুড়া লোচন দাস বলিলেন, "আবার কণ্ঠিবদলের চেষ্টা দেখ্ তুলসী।"

তুলসী বলিল, "ছেলেটার কি হবে?"

লোচন বলিলেন, "ছেলেটাকে বিলিয়ে দে!"

ম্লানমুখে তুলসী উত্তর করিল, "নেবে কে?"

লোচন বলিলেন, "কে আর নেবে? সোনাপুরের আখড়ায় দিয়ে আয়।"

তুলসী নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। লোচন তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভেবে আর কি কর্‌বি তুলসী, সকলই শ্রীহরির ইচ্ছা। আর পরের ছেলে বৈ তো নয়।"

তুলসী ছল ছল চোখে মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, দেখি।"

লোচন বলিলেন, "বেশ, ভেবেই দেখ্। পুব পাড়ায় পরাণে ছোড়া আমাকে ধরেছে। কিন্তু ছেলেটার ভার তো সে নিতে পারে না। আর পরের ছেলের ভার নেবেই বা কেন?"

তুলসী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। লোচন মস্তক সঞ্চালন করিয়া সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, "প্রভুর ইচ্ছা কেউ খণ্ডন করতে পারে না তুলসী। আর অমত করিস্ না। ছেলেটাকে নিজে রেখে আস্‌তে না পারিস্, আমাকে বলিস্, আমি গিয়ে রেখে আস্‌বো। গোবর্দ্ধনের মেয়ে তুই, তোর একটা উপায় আমাকেই তো কর্‌তে হবে। পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তুই যে কষ্ট পাবি, সেটা কি আমি দেখতে পারি? হরি হে দীনবন্ধু!"

তুলসীকে ভাবিয়া দেখিবার অবসর দিয়া লোচন শ্রীহরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

খানিক ভাবিয়া তুলসী ডাকিল, "গুপে!"

উঠানের এক পাশে কাদা, ভাঁড়, খোলা লইয়া গুপী খেলা করিতেছিল। তুলসীর আহ্বানে সে ফিরিয়া চাহিল। তুলসী ডাকিল, "এ দিকে আয়।"

গুপী খেলা ফেলিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তুলসীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তুলসী তাহার মুখের উপর রুক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গায়ে এত কাদা মেখেছিস্ কেন?"

আপনার কর্দ্দমরঞ্জিত দেহের উপর একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া গুপী যেন শঙ্কিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "কাদা।"

রুক্ষস্বরে তুলসী বলিল, "হাঁ কাদা, কাদা মেখে যে ভূত সেজেছিস।"

গুপী দৃষ্টি নত করিয়া যেন ভয়ে স্বীয় কর্দ্দমাক্ত হস্ত দ্বারা অঙ্গের কাদা ধীরে ধীরে পরিষ্কার করিতে লাগিল। তুলসী বলিল, "সোনাপুরের আখড়ায় গিয়ে থাক্‌বি?"

গুপী আখড়া জিনিসটা কি, তাহা না বুঝিলেও সম্মতিসূচক মস্তকসঞ্চালন করিল। তুলসী বলিল, "তোকে একা থাক্‌তে হবে। আমি সেখানে যাব না।"

গুপী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমি দাব না, টুসী মা।"

ছিদাম স্ত্রীকে তুলসী বলিয়া ডাকিত। তাহা শুনিয়া গুপী তাহাকে টুসী মা বলিত। তুলসী তাহার উত্তর শুনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "যাবি না তো এখানে কি খাবি?"

গুপী উত্তর করিল, "হাব (খাব)।"

তুলসীর হাসি আসিল। তাহা চাপিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হাবি? আমার মাথা?"

গুপী মাথা নাড়িয়া ইহাতে আপনার সম্মতি জানাইল। তুলসী মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা খাবি বৈ কি, তোর বাবা আমার মাথাটা একবার খেয়ে গিয়েছে, এবার তুই খাবি। আমার আর ভাবনা কি?"

ভাবনা-চিন্তার কথা গুপী বুঝিল না. সে শুধু টুসী মার মুখভারে এবং স্বরে ক্রোধের লক্ষণ অনুভব করিয়া তুলসীর মুখের উপর সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে দৃষ্টিতে তুলসীর মুখের গাম্ভীর্য্যটা অপসৃত হইল, এবং তাহার স্থলে কাতরতার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নৈরাশ্যজড়িতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু কোনও উপায় নাই যে গুপী, তোকেই কি খাওয়াব, আমিই বা কি খাব? কে আমাদের খেতে দেবে?"

টুসী মার স্বরে কোমলতার আভাস পাইয়া গুপীর যেন সাহস হইল; সে ঈষৎ প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, "কেতে দেবে।"

তুলসী বলিল, "কে খেতে দেবে গুপী! ভগবান্ ছাড়া আমাদের দেবার যে আর কেউ নাই।"

ক্ষুদ্র মস্তক হেলাইয়া গুপী বলিল, "দেবে টুসী মা।"

বালকের এই অর্থহীন উক্তির মধ্যে তুলসী যেন বিশ্বাসের নির্ভরতা দেখিতে পাইল। সে উৎফুল্লস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছিস্ গুপী, অসহায়ের সহায় ভগবান্। 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।' না গুপী, তোকে কোথাও যেতে দেব না। কেমন?"

তুলসীর মুখে চোখে স্নেহের কোমলতা ফুটিয়া উঠিল। গুপী একবার আনন্দোৎফুল্লকণ্ঠে "টুসী মা!" বলিয়া তুলসীকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। কিন্তু তাহার হাতের কাদা কাপড়ে লাগিবামাত্র তুলসী হঠাৎ যেন কঠিন হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বিরক্তির সহিত বলিল, "আঃ, ফরসা কাপড়খানায় কাদা লাগিয়ে দিলে। হতচ্ছাড়া ছেলে।" বলিয়া তুলসী তাহার মুখের উপর সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেই গুপী ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল, তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখখানা মুহূর্ত্তে কালী হইয়া গেল। তুলসী কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "দেখ্ দেখি, কাপড়খানা ময়লা ক'রে দিলি ?"

ভীতিরুদ্ধস্বরে গুপী বলিল,"আ দেব না টুসী মা।"

তাহার চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। তুলসী কঠোরস্বরে বলিল, "দিবি না ?"

"না টুসী মা, না।" বলিয়াই গুপী কাঁদিয়া উঠিল। তুলসী তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া আনিল এবং তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিল।

২

মাসখানেকের মধ্যে এক এক করিয়া যখন অনেকগুলি তৈজস বাঁধা পড়িল, তখন তুলসী ভবিষ্যতের চিন্তায় একটু অধীর হইয়া পড়িল। একটা উপায় না করিলে এমন করিয়া থালা, ঘটী বেচিয়া যে বেশী দিন চলিবে না, ইহা বুঝিতে পারিল বটে, কিন্তু সেই উপায়টা যে কি, তাহাই স্থির করিতে পারিল না। পুনরায় কণ্ঠি-বদলে তেমন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পেটের দায়ে তাহাতে মত দিতে হইল। তবে মত দিলেও দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইল না। তাহার ভার অনেকেই লইতে প্রস্তুত, কিন্তু ছেলেটার ভার লইতে কেহই রাজি নহে। অথচ ছেলেটাকেও ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। আখড়ায় মা-বাপ মরা ছেলেকে মানুষ করা হয় বটে, কিন্তু সেখানে যে অযত্নে অনাদরে ছেলেকে মানুষ হইতে হয়, তাহা জানিতে তুলসীর বাকী ছিল না, সুতরাং লোচন দাদার অনুরোধ ও উপদেশ সত্ত্বেও গুপীকে সেখানে রাখিতে তাহার প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল।

এ দিকে পরাণ বৈরাগী আশা পাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাড়া দিতে লাগিল। তাহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ না করিলেও তুলসী কিন্তু পাকা কথা দিতে পারিল না। ছেলেটার একটা উপায় না করিয়া কিরূপে নিজের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করে ?

পরাণ কিন্তু সবুরে থাকিতে চায় না। সে এক দিন আসিয়া তুলসীকে পাকা কথা দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। তুলসী পাকা কথা দিতে পারিল না; বলিল, "আর দিনকতক যাক্ না বৈরাগী।"

এই আশ্বাসে তৃপ্ত না হইয়া পরাণ বলিল, "দিন আমার পক্ষে যুগ হয়ে পড়ছে যে।"

তাহার মুখের উপর সহসা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত তুলসী বলিল, "ভয় নাই বৈরাগী, আমি তোমাকে মিছে আশা দিচ্ছি না।"

পরাণ বলিল, "যখন মিছে আশা দিচ্ছ না, তখন মিছে আজকাল ক'রে লাভ কি ?"

তুল। লাভ কিছুই নাই।

পরা। লাভ যখন কিছুই নাই, তখন আর আমি দেরী কত্তে পারি না।

তুল। দেরী কর্‌তে আমিও বলি না। তবে—

পরা। তবে আর কি কর্‌তে হবে বল।

তুল। বলেছি তো, ছেলেটার ভার নাও।

পরাণ মাথা নীচু করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমিও তো বলেছি তুলসি, পরের ছেলের ভার নেবার ক্ষমতা আমার নাই।"

তুলসী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু মনে কর, যদি আমার নিজেরই একটা ছেলে থাক্‌তো ?"

মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে পরাণ বলিল, "সে আলাদা কথা। কিন্তু মাথায় মোট ক'রে আমি ছিদেম দাসের ছেলেকে খাওয়াতে পার্‌বো না।"

ঈষৎ রাগতভাবে তুলসী বলিল, "না পার, না পার্‌বে। আমি সেজন্য তোমার পায়ে ধর্‌তে যাচ্ছি না।"

ম্লান-মুখে পরাণ বলিল, "রাগ ক'রো না তুলসী, আমার অবস্থা তো জান।"

তুলসী বলিল, "একটা তিন বছরের ছেলেকে খেতে দেবার সঙ্গতি যার নাই, তার আবার কণ্ঠি-বদলের সাধ কেন ?"

তাহার ক্রোধরঞ্জিত মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া পরাণ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল, "বামনেরও চাঁদ ধর্‌তে সাধ হয় তুলসি।"

তুলসী মুখ ফিরাইয়া নীরব রহিল। পরাণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষাদগম্ভীরস্বরে বলিল, "তা হ'লে এই কথাই ঠিক ?"

"কোন্ কথা ?"

"ছেলেটার ভার না নিলে—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই পরাণ উৎসুকদৃষ্টিতে তুলসীর মুখের দিকে চাহিল। তুলসী কোনও উত্তর দিল না। পরাণ আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

গুপী আসিয়া বলিল, "কি হবে টুসী মা ?"

"আমার মাথা !' বলিয়া তুলসী দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

সে দিন ঘরের চাল ছিল না, পয়সাও নাই। তুলসী ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল। তার পর একটা বড় ঘটী লইয়া বেণে বোয়ের নিকট উপস্থিত হইল। বেণে-বৌ এক জন ক্ষুদ্র মহাজন। ঘটী বাটী বা সোনা-রূপা ছোটখাট জিনিস রাখিয়া অল্পস্বল্প টাকা দিতে পারিত। তুলসী ঘটীটা রাখিয়া আট আনা চাহিলে বেণে-বৌ ঘটীটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার ওজন অনুমান করিয়া লইয়া বলিল, "আট আনা দিতে পারি না বাছা, পেতল কাঁসার আজকাল কি দর আছে ? বড় জোর চার আনা দিতে পারি।"

তুলসী বলিল, "কিন্তু চার আনা দিলে চল্‌বে না তো মাসী, চার আনার চালই কিন্‌তে হবে। তার পর তেল-নুন আছে।"

মাসী যেন বিরক্তির সহিত বলিল, "তোমার চলবে কি না, তা দেখবার দরকার তো আমার নাই। আর তোমার যদি ছাড়াবার আশা থাক্‌তো, তা হলেও না হয় আর দুগণ্ডা পয়সা দিতে পাত্তাম। কিন্তু তুমি তো আর নিতে পার্‌বে না, কাঁসারী ডেকে আমাকে এ সব আধামূলে ধ'রে দিতে হবে।"

তুলসী মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বেণে-বৌ বলিল, "তুমি যখন ধরেছ, তখন আর চারটে পয়সা ধ'রে দিচ্ছি। কিন্তু বাছা, আর এ সব পেতল কাঁসা আমার কাছে এনো না, তা বলে রাখছি। সোনারূপা থাকে তো এস।"

তুলসীর ইচ্ছা হইল, মাসীর হাত হইতে ঘটীটা ছিনাইয়া লইয়া যায়। শুধু নিজের জন্য হইলে বোধ হয় তাহাই করিত। কিন্তু ছেলেটা আছে যে। গ্রামে আর এমন মহাজন নাই যে, ঘটীবাটি রাখিয়া পয়সা দেয়। অগত্যা বেণে-বোয়ের কথাগুলা নিঃশব্দে মাথা পাতিয়া লইতে হইল এবং আড়াই টাকা দামের ঘটীটা রাখিয়া পাঁচ আনা পয়সা লইয়া তুলসী চলিল।

রাস্তায় যাইতে যাইতে অপমানসূচক কথাগুলাকে মনে মনে আন্দোলন করিয়া তুলসী হঠাৎ একটা দৃঢ়-সংকল্পে মন বাঁধিল, এবং ঘরে না গিয়া লোচন দাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "গুপীকে কাল আখড়ায় রেখে আস্‌বে দাদামহাশয় ?"

লোচন আপনার ক্ষীণ দৃষ্টিটাকে যতটা পারিলেন, সতেজ করিয়া লইয়া তুলসীর মুখের উপর স্থাপন করিলেন, কিন্তু সেখানে সংকল্পের দৃঢ়তা ছাড়া ইতস্ততঃ ভাবের কোনও লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধ তখন দন্তহীন মুখে মৃদু হাসির লহর তুলিয়া হর্ষপ্রফুল্ল-কণ্ঠে বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে রেখে আস্‌বো। তুই কি আমার পর তুলসি ? তোকে তো আমি আগেই বলেছিলাম। যাক্, শ্রীহরির ইচ্ছায় যখন তোর মতিগতি ফিরেছে, তখন—কাল একটু কাজ ছিল, তা—"

বাধা দিয়া তুলসী বলিল, "থাক্ কাজ, কালই রেখে আস্‌তে হবে।"

লোচন বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। সকালে স্নান-আহ্নিক সেরে—বেশী দূর তো নয়, রেখে এসে খাওয়া-দাওয়া কর্‌বো।"

তুলসী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

৩

সে দিন তুলসী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। প্রায় দেড় বৎসরকাল ছেলেটা তাহার কাছে আছে, কিন্তু কাল আর সে থাকিবে না। কাল তুলসী স্বাধীন। এই ছেলেটা বয়সে ছোট হইলেও তাহাকে যে একটা অধীনতার পাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কাল হইতে সে বন্ধন আর থাকিবে না, সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে। গুপী যে কেবল তাহার কণ্ঠিবদলের পথেই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে ; ইহার জন্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে অনেক কাজ করিতে হইত। ঘরে চাল নাই ; তুলসী ভাবিল, দূর হউক, আর কাহারও দরজায় ধার করিতে যাইব না, কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু গুপী তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে শিথিল করিয়া দিত। সে আসিয়া ম্লানমুখে ক্ষুধার তাড়না জানাইলে তুলসী আর স্থির থাকিতে পারিত না, আধসের চাউলের জন্য তাহাকে পরের দ্বারে গিয়া হীনতা স্বীকার করিতে হইত। হতভাগা ছেলে মাকে খাইয়াছে, বাপকে খাইয়াছে, তথাপি তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই, সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই বলিত, "কি হাব ( খাব ) টুসী মা ?" অগত্যা তুলসীকে তাহার সকালের খাবার যোগাড় করিয়া রাখিতে হইত। না রাখিলে তাহার ক্রন্দনের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িতে হইত। এই ছেলেটাই তো যত আপদ্ ! দূর হউক, কাল ইহাকে বিদায় করিতে পারিলে আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকিবে না। তখন তুলসী কণ্ঠিবদল করুক বা না করুক, কোনরূপে আপনার পেটটা চালাইতে পারিবে না পারে, উপবাস দিয়া মরিলেও তো কোনও ক্ষতি নাই।

পাশে শুইয়া গুপী অকাতরে ঘুমাইতেছিল ; হঠাৎ সে বোধ হয়, স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তুলসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল, এবং তাহার গায়ে আস্তে

আস্তে হাত চাপড়াইয়া পুনরায় ঘুম পাড়াইল। ইহাও কি কম যন্ত্রণা! রাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাবার যো নাই। সেবার সর্দিজ্বরে তিনদিন কি ভোগটাই না ভুগিতে হইয়াছিল। তিন রাত চোখেপাতায় হয় নাই। কাল হইতে তুলসী নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু কাল যদি ছেলেটা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে, কে তাহাকে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইবে? ঘুম ভাঙ্গিলে যখন বিছানা হাতড়াইবে, টুসী মা টুসী মা বলিয়া কাঁদিতে থাকিবে, তখন?—তুলসী তাড়াতাড়ি আলোকটা নিবাইয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া তুলসী তাড়াতাড়ি রান্না চাপাইয়া দিল। এক মুঠা না খাওয়াইয়া কি পাঠান যায়? গুপী ডাল মাখিয়া ভাত খাইতে ভালবাসিত, কিন্তু সব দিন ডাল জুটিত না। আজ তুলসী এক পয়সার মসুর ডাল আনিয়া চড়াইয়া দিল। গুপী উনানের পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দা (ডাল) কি অবে (হবে) টুসী মা?"

তুলসী বলিল, "তুই খাবি।"

"আমি হাব?"

"হাঁ।"

"আমি দা হাব, আমি দা হাব!" বলিয়া গুপী আনন্দে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। তুলসী তাহার দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "হতভাগা ছেলে! যেন কক্ষনো খেতে পায় না।"

গুপীর আনন্দোৎফুল্ল মুখখানি ম্লান হইয়া গেল।

তুলসী উঠানের এক পাশে কয়েকটা বেগুন-গাছ পুতিয়াছিল; তাহাদের একটা গাছে একটিমাত্র বেগুন হইয়াছিল। তুলসী সেইটিকে তুলিয়া ভাজিয়া দিল। এক পয়সার মাছ কিনিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু মাছ কোথাও পাইল না। নেত্য গোয়ালিনী দুধ লইয়া যাইতেছিল, তাহার নিকট হইতে দুই পয়সার দুধ কিনিয়া লইল।

রন্ধন শেষ হইল। তুলসী গুপীকে তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল; তাহার মাথা আঁচড়াইয়া কপালে খয়েরের টিপ, নাকে একটি তিলক পরাইয়া দিল। তার পর তাহাকে খাওয়াইতে বসিল। ইদানীং গুপী নিজের হাতেই খাইত, আজ তুলসী তাহাকে কোলে বসাইয়া খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। তাহার মুখে ভাত তুলিয়া দিতে দিতে তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "ডাল কেমন হয়েছে রে গুপী?"

মাথা নাড়িয়া গুপী উত্তর করিল, "বদ্দ (বড্ড) মিত্তি (মিষ্টি) টুসী মা।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তুলসী বলিল, "হাঁ দেখ গুপী, ও বাড়ীর দাদামশাই আজ ঠাকুর দেখতে যাবে, তুই যাবি?"

গুপী বলিল, "দাব (যাব) টুমি যাবে?"

তুলসী বলিল, "আমি কোথায় যাব রে?" আমাকে কি সেখানে যেতে আছে? তুই দাদামশায়ের সঙ্গে যাবি।

গুপী বলিল, "দাদামতাইর থনে (সঙ্গে) দাব?"

তুলসী বলিল, "হাঁ, কাপড় প'রে দাদামশায়ের সঙ্গে যাবি।"

আহ্লাদে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গুপী বলিল, "ওহো, পাপড় (কাপড়) পলে (পরে) তাকু (ঠাকুর) দাব।"

হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তুলসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কাঁব্বে (কাদবে) না টুসী মা?"

তুলসীর চোখ দুটো সজল হইয়া আসিল; সে ধরা-গলায় উত্তর করিল, "না। তুই এখন খেয়ে নে।"

লোচন আসিয়া ডাকিলেন, "কৈ তুলসি, হয়েছে? বেলাও অনেকটা হয়ে গেল।"

ব্যস্তভাবে তুলসী বলিল, "এই যে—হয়েছে। তা আজ যদি বেলা—"

লোচন বলিলেন, "তা হোক্, কাল আবার কাজ আছে।"

গুপীকে খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া তুলসী তাহাকে একখানি কাপড় পরাইয়া দিল। তাহা খেলার ভাঁড়, মাটীর পুতুল সব একখানা নেকড়ায় বাঁধিল। লোচন তাড়া দিয়া বলিলেন, "আর দেরী করিস্ নে তুলসি।"

তুলসী তাড়াতাড়ি দুধটুকু গরম করিয়া গুপীকে খাওয়াইয়া দিল। তার পর তাহার কপালে একটি গোবরের টিপ দিয়া তাহাকে কোলে লইয়া মাথার চুলগুলা পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিস্ নে গুপী, লক্ষ্মী ছেলে!

ঘাড় দোলাইয়া গুপী বলিল, "না টুসী মা, কাঁব্ব না। তাকু দেকে আব্ব (আস্‌ব)।"

তুলসী তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। লোচন তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। গুপী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তুমি কাঁব্বে না টুসী মা?"

তুলসী কোনও উত্তর দিল না। সে কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গুপী দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার পিছনে ফিরিয়া ডাকিল, "টুসী মা!"

লোচন তাহাকে ধমক দিয়া হাত চাপিয়া বলিলেন, "আয় আয়।"

আবার কয়েকপদ গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; ডাকিল, "টুসী মা!"

তুলসী মুখটা পিছন দিকে ফিরাইয়া লইল। লোচন গুপীর হাত টানিয়া অগ্রসর হইল। গুপী আর একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "টুসী মা!"

লোচন তাহাকে জোরে একটা ধমক দিলেন।

হঠাৎ তুলসী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে গুপীকে জড়াইয়া ধরিয়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না গো না, আমি যেতে দেব না।

গুপী অবাক্ হইয়া তুলসীর মুখের দিকে চাহিল। লোচন গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "তুলসি!"

তুলসী কাঁদিয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা-মশায়, ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।"

ঠাকুর দেখার সঙ্গে এই কান্নার কি সম্পর্ক, তাহা না বুঝিলেও, তুলসীকে কাঁদিতে দেখিয়া গুপীর চোখ দুইটা ছল্‌-ছল্ করিতে লাগিল। সে দুই হাতে তুলসীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পজড়িতকণ্ঠে বলিল, "আমি যাব না টুসী মা, আমি যাব না।"

তুলসী তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া পলাইল এবং ঘরে ঢুকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে থাকিলে পাছে কেহ জোর করিয়া গুপীকে লইয়া যায়।

তুলসীর কাণ্ড দেখিয়া লোচন কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; তার পর তুলসী হইতে তাহার পিতা গোবর্দ্ধন দাস পর্য্যন্ত সকলের দুষ্প্রবৃত্তি কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৪

লোচন দাসের প্রমুখাৎ তুলসীর সকল্প অবগত হইয়া পরাণ সকালেই তুলসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যবশতঃ গ্রামান্তরে যাইবার প্রয়োজন থাকায় দিনমানে সাক্ষাৎ করিতে পারিল না; সন্ধ্যার পরই তুলসীর সহিত দেখা করিতে আসিল। উঠানে আসিয়া ডাকিল, "তুলসী!"

তুলসী অন্ধকারে দাবার উপর বসিয়া, অতঃপর কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। ডাক শুনিয়া সচকিতে উত্তর দিল, "কে গা?"

পরাণ বলিল, "চিনতে পারো না? আমি পরাণ।"

ঈষৎ কর্কশ-কণ্ঠে তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

পরাণ দাবার উপর উঠিয়া হাস্যতরলকণ্ঠে বলিল, "মালসা ভোগটা কবে হবে, তাই জানতে এলাম।"

তুলসী বলিল, "এটা তো ছাদ্দবাড়ী নয় বৈরাগী-ঠাকুর, এখানে কিসের মালসা ভোগ খাবে?"

পরাণ বলিল, "শত্রুর ছাদ্দবাড়ী হোক, এখানে যে মোচ্ছবের মালসা-ভোগ হবে।"

বলিয়া পরাণ একটু হাসিল। তুলসী উঠিয়া নীরবে একখানা আসন তাহার দিকে ছুড়িয়া দিল। পরাণ আসনখানা পাতিয়া তাহাতে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিল "আজ তোমার মনটা ভাল নাই, না তুলসী?"

তুলসী কোনও উত্তর দিল না। পরাণ গম্ভীরভাবে বলিল, "তা হতেই পারে, মানুষ কয়া তো। তবে কি জান, সংসারে কেউ কারো নয়, এই যে দেহ, এটাও আপন নয়।" বলিয়া পরাণ গুণ-গুণ করিয়া গান ধরিল—

"এই যে কলেবর, জেনো পরের ঘর,
ভাড়া দিয়ে আছ ভাড়াটিয়া ঘরে।"

এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে গুপী ডাকিল, "টুসী মা!"

অন্ধকারে ভূতের আনুনাসিক স্বর শুনিয়া মানুষ যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, পরাণ তেমনই চমকিয়া উঠিল। তুলসী দরজার কাছে গিয়া ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিল, "ভয় কি? এই যে আমি। ঘুমোও।" পরাণ কিয়ৎক্ষণ হতভম্বের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ না ছেলে-টাকে আখড়ায় রেখে আসবার কথা ছিল?"

তুলসী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "হুঁ।"

পরাণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা আজ বুঝি নিয়ে যাবার সুবিধা হ'লো না।"

তুলসী উত্তর করিল, "হুঁ।"

একটু ভাবিয়া পরাণ বলিল, "আজ না হ'লো, আর একদিন রেখে এলেই চলবে। লোচন খুড়োর সুবিধা না হয়, আমি এক দৌড়ে যাব, তার আর কি। তোমার যদি উপকার হয়, বুঝলে কি না, আমি না হয় একটু বেগারই দিলাম। আর তোমার বেগারের তরেই তো—বুঝলে কি না।"

পরাণ হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার এই পরিহাসে তুলসীর মুখটা যে ভ্রূকুটী-ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, অন্ধকার প্রযুক্ত পরাণ তাহা দেখিতে পাইল না। সে হাসি থামাইয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিল—

"তোমারি তরে আমি নন্দের বাথা বই,
আর কিছু জানিনে রাই, আমি তোমা বই।"

তুলসী বলিল, "আমার একটু উপকার করতে পার বৈরাগি?"

পরাণ ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "খুব পারি, কি করতে হবে বল।"

তুলসী বলিল, "আমাকে গোটাকতক গান শিখিয়ে দিতে পার?"

বিস্ময়ের সহিত পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "গান? গান শিখে কি হবে?"

তুলসী বলিল, "গান গেয়ে ভিক্ষা করলে বেশী ভিক্ষা পাওয়া যায়।"

অন্ধকারে আপনার বিস্ফারিত দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণভাবে তুলসীর মুখের দিকে নিক্ষেপ করিয়া পরাণ বলিল, "তুমি গান গেয়ে ভিক্ষা করবে তুলসী?"

"বোষ্টমের মেয়ে, দোষ কি?"

"দরকারই বা কি?"

"পেট চলে না।"

"সে ভার তো আমার।"

"যখন তুমি ভার নেবে। তার আগে তো পেট চুপ ক'রে থাকবে না?"

"সে আর ক'দিন? বল তো আমিই—"

"এমন অন্যায় কথা আমি বলতে চাই না। তার চেয়ে তুমি আমাকে দু'টো গান শিখিয়ে দাও। বেশ ভাল দেহতত্ত্বের গান।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরাণ বলিল, "কিন্তু তুমি ভিক্ষা কত্তে পারবে?"

তুলসী বলিল, "পারবো না কেন? এই যে কত বোষ্টমের মেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়।"

সহাস্যে পরাণ বলিল, "তাদের কথা ছেড়ে দাও। তার চেয়ে যে ক'দিন না কণ্ঠিবদল হয়, সে কদিন আমিই—"

বাধা দিয়া তুলসী বলিল, "তুমি ক দিন দেবে? ধর, যদি ছ মাস না হয়?"

"আমি ছ'মাস যোগাব।"

"ছ'মাস?"

"দেব।"

"এক বছর?"

"একটা বছর আর কি বেশী দিন!"

"কিন্তু লোকে কি বলবে?"

"একটা ঠিক হ'য়ে থাকলে কেউ কিছু বলবে না।"

একটু ভাবিয়া তুলসী বলিল, "আমিই বা শুধু শুধু তোমার দান নিতে যাব কেন?"

পরাণ বলিল, "শুধু কেন, দু'দিন পরে তো তুমি সুদে আসলে সব ফিরিয়ে দেবে।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে তুলসী বলিল, "সে পরের কথা ছেড়ে দাও। ছ'মাস পরে যদি আমি ম'রে যাই, তোমার কাছে তো ঋণী হয়ে থাকব?"

এ কথার উত্তর পরাণ দিতে পারিল না। তুলসী বলিল, "এখন তুমি আমাকে গান শেখাবে কি না বল।"

"আচ্ছা কাল এসে শেখাব" বলিয়া পরাণ একটু বিমর্ষভাবে উঠিয়া গেল। তুলসী সেই অন্ধকার দাবার উপর একা বসিয়া রহিল। ঘরের সামনে তেঁতুলগাছটা একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মাথার উপর জোনাকীগুলা তাহার জলন্ত চক্ষুর মতই দেখাইতেছিল। বাতাসে ডালগুলা সন্ সন্ শব্দ করিতেছিল। তুলসীতলার প্রদীপটা তখন নিবিয়া গিয়াছিল। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। হঠাৎ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। তুলসী সাত কুলের, সাত পুকুরের নাম মনে মনে বলিতে লাগিল। ঘরের পিছনে বাঁশঝাড়ের ভিতর শৃগাল চীৎকার উঠিল; তুলসী ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল।

তুলসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরাণ যখন লোচনের নিকট উপস্থিত হইল, লোচন তখন সবেমাত্র নাম-জপ শেষ করিয়া হুঁকা কলিকা লইয়া বসিয়াছেন। পরাণের মুখে সকল কথা শুনিয়া তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি জান পরাণ, 'রমণীর পাপ মন কাচের বাসন।' ওরা জগতে অতি জঘন্য জীব। এই জন্যই শাস্ত্রে ওদের এত নিন্দা ক'রে গেছে। আমি তো ওদের আন্তরিক ঘৃণা করি।"

কিন্তু তিনি ঘৃণা করিলেও পরাণ কিছুতেই তুলসীকে ঘৃণা করিতে পারিল না; বরং এই পাপমনা জঘন্য জীবটাকে পাইবার জন্য সে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন লোচন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি উতলা হয়ো না; শ্রীহরির ইচ্ছায় কি না হয়? তাঁর ইচ্ছায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আর একটা মেয়েমানুষ বশে আসবে না?"

তিনি পুনরায় চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে পরাণ আশ্বস্ত হইয়া বিদায় লইল।

লোচনের এই চেষ্টার মধ্যে শুধু যে পরাণেরই স্বার্থ ছিল, তাহা নহে; তাঁহার নিজেরও একটু স্বার্থ ছিল। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের কণ্ঠিবদলের বৈষ্ণবী ব্যতীত চতুর্থ পক্ষের একটি সেবাদাসী ছিল। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের ভয়ে সেটিকে ঘরে আনিতে সাহস করেন নাই, সোনাপুরের আখড়াতেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবৃত্তির বশীভূত অসংখ্য বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষতঃ আখড়ার অধিকারী চরণদাস বাবাজীর সন্নিধানে এই যৌবনসম্পন্না সেবাদাসীটিকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না, তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র নিভৃত স্থানের অন্বেষণ করিতেছিলেন। শ্রীহরির কৃপায় স্থান মিলিল। গোবর্দ্ধনের প'ড়ো ঘরটা

তাঁহার বাসের জন্ত মনোনীত হইল। ঘরটা একটু আধটু মেরামত করাইয়া লইলেই চলিবে, আর চারিপাশে প্রাচীরের পরিবর্ত্তে কাঁটাগাছের বেড়া দিলেই কায়দামত হইবে।

সব স্থির, এমন সময় অভাগী তুলসী ছিদাম দাসের ছেলেটাকে লইয়া উপস্থিত হইল। লোচন বড়ই বিরক্ত এবং চিন্তিত হইলেন। এই চিন্তার ফলে পরাণ তুলসীর সহিত কণ্ঠিবদল করিতে আগ্রহান্বিত হইল, এবং সে ঘটক বিদায়স্বরূপ ঘরখানার মেরামতের খরচ দিবার ভার গ্রহণ করিল।

লোচন ভাবিলেন, ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্ত। কণ্ঠিবদল হইলেই তুলসী পরাণের ঘরে চলিয়া যাইবে; তিনি তখন অবাধে সেবাদাসীকে আনিয়া এই ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। ইহার উপর গৃহসংস্কারের খরচটাও লাগিবে না। প্রভুর কৃপাস্মরণে লোচনের চক্ষু ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু একটা পরের ছেলে লইয়া তুলসী যে এত গোল বাধাইবে, ইহা তিনি ভাবেন নাই। হায়, মানুষের কি পাপ মন! একটা পরের ছেলের জন্ত এত অনর্থপাত! লোচন ব্যথিত-হৃদয়ে তুলসীর বিরুদ্ধে শ্রীহরির নিকট অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

একবার ভাবিলেন, নিজেই না হয় ছেলেটার ভার লইবেন। দুই বৎসর পরে সে ত গরু-বাছুরটাও দেখিতে পারিবে। কিন্তু বৈষ্ণবী নিজের দুই তিনটি ছেলে-মেয়ে লইয়া এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার উপর একটা পরের ছেলের ভার লইয়া স্বামীর ভবিষ্যৎ সুবিধার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল না। তখন লোচন পরাণকে অনেক বুঝাইলেন, এইটুকু ছেলে, একটা প্রবল জ্বর, একটা তড়্‌কা আসিয়া অনায়াসেই ইহার ভার হাল্কা করিয়া দিতে পারে। পরাণ কিন্তু কিছুতেই বুঝিল না; কবে ছিদাম দাস পাঁচ জনের সাক্ষাতে তাহার মাতার কুৎসা কীর্ত্তন করিয়াছিল, সেই রাগে সে ছিদামের ছেলেকে প্রতিপালন করিতে চাহিল না। তুলসী তাহাকে আখড়ায় পাঠাইতেও নারাজ। বিষম চিন্তাস্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে লোচন প্রাণপণে দয়াময় শ্রীমধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

পরদিন লোচন তুলসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই নাকি ভিক্ষা কর্‌বি তুলসী?"

যদিও এ সম্বন্ধে তুলসীর দ্বিধা ছিল, তথাপি সে আপনার সংকল্পের দৃঢ়তা জানাইয়া উত্তর করিল, "কাজেই।"

বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে লোচন বলিলেন, "কিন্তু আমাদের বংশে কেউ কখনও যে এমন কাজ করে নাই তুলসি!"

তুলসী একটু চড়া গলায় উত্তর দিল, "আমার মত অবস্থায় কেউ কখন পড়েনি।"

মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক লোচন বলিলেন, "অবস্থা তোর এমন কি মন্দ বল, শুধু পরের ছেলেটাকে জড়িয়েই তো যত গোলযোগ।"

তুলসী বলিল, "গোলযোগ যখন আমি বাধিয়েছি, তখন আমাকেই ওর নিষ্পত্তি কর্‌তে হবে।"

একটু ভাবিয়া লোচন বলিলেন, "কিন্তু তুই কি মনে করিস্, ছিদাম দাসের ছেলে বড় হয়ে এর পর তোকে ভাত দেবে?"

তুলসী বলিল, "আজকাল নিজের ছেলেই মাকে ভাত দিতে চায় না, ও তো পরের ছেলে।"

লোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ওকে মানুষ ক'রে তোর লাভ?"

ঈষৎ হাসিয়া তুলসী বলিল, "লাভের মধ্যে কর্ম্মভোগ।"

"এমন বাজে কর্ম্মভোগের দরকার কি?"

"দরকার এই যে, আমি মেয়েমানুষ।"

এবার লোচনকে নিরুত্তর হইতে হইল। তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোর কি ভিক্ষায় যাবার বয়স তুলসি?"

তুলসী বলিল, "ভিখারীর বয়সের বিচার নাই। থাকলেও এই বয়সে বেশী ভিক্ষা মিলে।"

বলিয়া তুলসী মৃদু হাস্যের সহিত অপাঙ্গভঙ্গী করিল। লোচন শ্রীহরি স্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভিক্ষা করিয়া খাইব, এই প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, ভিক্ষা করা তত সহজ নয়, ইহা তুলসী সেই দিন বুঝিতে পারিল—যে দিন প্রথম ভিক্ষায় বাহির হইল। সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে দক্ষিণপাড়ার বেচারাম ঘোষের বাড়ীর দরজায় গিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইল। বেচারামের মা তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "তুলসী যে? এ দিকে কি মনে ক'রে?"

প্রাণপণ চেষ্টাতেও তুলসী মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না যে, সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এইদিকে এসেছি—"

বেচারামের মা তাহাকে আদর করিয়া বসাইল। ক্রমে বেচারামের স্ত্রী, মেয়ে প্রভৃতি আসিয়া জুটিল এবং তুলসী পুনরায় নিকা করিবে কি না, এক্ষণে সে কিরূপে দিনপাত করিতেছে, তাহাদের জাতিতে কতবার নিকা করিতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তুলসী কোনরূপে সংক্ষেপে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল

এবং একেবারে নিজের ঘরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সন্ধ্যার সময় পরাণ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত গান শিখাইতে আসিল। সে দুই তিনটা গাহিবার পর তুলসী বলিল, "আমি গান শিখিতে পারি, কিন্তু এমন সুর ব'রে তো গাইতে পার্‌বো না।"

পরাণ হাসিয়া কহিল, "সুর না হ'লে গানই হয় না।"

তুলসী বলিল, "তবে গানে কাজ নাই, শুধু 'জয় রাধে' ব'লে ভিক্ষা কর্‌বো।"

গ্রামে ভিক্ষা করা সুবিধাজনক নহে দেখিয়া তুলসী সে দিন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গেল। কিন্তু গ্রামে ঢুকিতেই যুবকগণের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি তীব্র শরের স্থায় আসিয়া যখন তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, তখন সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল। কিন্তু আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং বহুকষ্টে লজ্জাটাকে কথঞ্চিৎ দমন করিয়া সে একটা বাড়ীর দরজায় গিয়া সঙ্কোচবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "জয় রাধে!"

অনেক যুবক তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "কে বাবা, হরিদাসী বৈষ্ণবী নাকি?"—বলিয়া সে নিজেই গান ধরিল—

"শ্রীমুখপঙ্কজ হের্‌বো ব'লে হে!"

তুলসী সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল, এবং ভিক্ষা-বৃত্তির মুখে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

"আমি হাব (খাব) টুসী মা!"

তীব্রকণ্ঠে তুলসী বলিল, "কি হাবি? ছাই?"

গুপী মস্তকসঞ্চালনে সম্মতি জানাইয়া বলিল, "তাই (ছাই) হাব, আমি তাই (ছাই) হাব।"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে তুলসী বলিল, "তার চেয়ে আমার মাথাটা খেয়ে ফেল না কেন, সব আপদ্ চুকে যাক্।"

তুলসী যে দুঃখে নিজের মাথাটা খাইতে বলিল, গুপী সে দুঃখ বুঝিতে পারিল না; শুধু টুসী মার ক্রোধ-বিস্ফারিত দৃষ্টিটা দেখিয়া ভীত হইল; ম্লানমুখে ঘাড়-মুখ নাড়িয়া কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, "না টুসী মা আমি তাই হাব, আমি তাই হাব।"

তুলসীর আর সহ্য হইল না; "সর্ব্বনেশে ছেলে!" বলিয়া গুপীর পিঠে এক চড় বসাইয়া দিল। গুপী চীৎকার করিল না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসীর মুখের উপর সকাতরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, "হাব না টুসী মা।"

তুলসী দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ-খানার দিকে চাহিয়া রহিল: চাহিতে চাহিতে তাহার ক্রোধরুক্ষ দৃষ্টিটা সজল হইয়া আসিল; ক্রমে চোখের কোল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। তুলসী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে যতটা সম্ভব রুক্ষতা আনিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "চুপ কর্ হতভাগা ছেলে!"

বলিয়া সে পুনরায় চড় তুলিল। গুপী ভয়ে দুই পা পিছনে হটিয়া গিয়া ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে বলিল, "আমি হাব না, ও টুসী মা, আমি হাব না।"

তুলসী দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। হঠাৎ সে গুপীর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটীর উপর জোরে মাথা কুটিতে কুটিতে বলিল, "তোকে খেতেই হবে গুপে, আমার মাথা তোকে খেতেই হবে।"

"তুলসি!"

তুলসী চমকিতভাবে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে পরাণ। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল। ব্যাপারটা কি বুঝিলেও, পরাণ সে দিকে যেন লক্ষ্য না করিয়াই দাবার উপর উঠিয়া বসিল, এবং ধীরে গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে ভিক্ষাই কি ঠিক হ'লো তুলসি?"

তুলসী সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না, শুধু পরাণের দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পরাণের হাতে একটা পুঁটুলী ছিল; সেইটা এক পাশে রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে আজকার ভিক্ষাটা আমিই দিলাম। কাল তখন অপরের দরজায় যাবে।" বলিয়া পরাণ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তুলসীর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আস্তে আস্তে উঠানে নামিল।

তুলসী এতক্ষণ স্থির নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। এক্ষণে সে হঠাৎ ফিরিয়া পরাণকে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

পরাণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তুলসী বলিল, "এক কাজ কর্‌তে পার্‌বে?"

পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ বল।"

তুলসী বলিল, "ছেলেটাকে আখড়ায় রেখে আস্‌তে পার্‌বে?"

পরাণের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। কঠোর-স্বরে তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "পার্‌বে?"

পরাণ ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তা পারব না কেন? কিন্তু—"

দৃঢ়স্বরে তুলসী বলিল, "তবে নিয়ে যাও, রেখে এস।"

সঙ্কুচিতভাবে পরাণ বলিল, "আজই ?"

সে গুপীর হাত ধরিয়া টানিয়া পরাণের সম্মুখে আনিল। পরাণ তাহার একটা হাত ধরিয়া তুলসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু তুলসী—"

গর্জ্জন করিয়া তুলসী বলিল, "আমি মেয়েমানুষ যা পারি, তুমি পুরুষ হ'য়ে তা পার না ? ছি !"

বলিয়া সে তীব্র ভ্রূকুটী করিল। পরাণ আর কিছু বলিল না, নতমস্তকে গুপীকে কোলে তুলিয়া লইয়া নীরবে অগ্রসর হইল। কয়েক পদ যাইতেই গুপী কাঁদিয়া উঠিল ; তুলসীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি দাব না টুসী মা।"

তুলসী মুখ ফিরাইয়া দাবায় গিয়া উঠিল, এবং খুঁটিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গুপী ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতম কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমি দাব না, ও টুসী মা, আমি দাব না।"

তুলসী প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরাণ কিছু দূর গিয়া একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু তুলসীর মুখে কঠোর ভ্রূকুটী ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পাইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা অদৃশ্য হইল, শুধু দূর হইতে বাতাসে গুপীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল, "আমি দাব না টুসী মা।"

ক্রমে সে কণ্ঠস্বরও যখন বাতাসে মিলাইয়া আসিল, তখন তুলসী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খুঁটিটা ছাড়িয়া দিল। সম্মুখেই পরাণের প্রদত্ত চালের পুঁটুলীটা পড়িয়াছিল। লাথি মারিয়া সেটাকে উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তুলসী আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল ; ঢুকিয়াই মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

অপরাহ্ণে আসিয়া সংবাদ দিল, গুপীকে যথাস্থানে রাখিয়া আসা হইয়াছে। উত্তরে তুলসী শুধু বলিল, "আচ্ছা।" সে পথে যাইতে যাইতে কত কাঁদিয়াছে, তুলসীর নিকট ফিরিয়া আসিবার জন্য পরাণকে কত অনুনয় করিয়াছে, পরাণ সেগুলা বর্ণনা করিবার উপক্রম করিতেই তুলসী কলসীটা লইয়া তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়া পরাণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, তুলসী বেশ নিশ্চিন্তভাবে রন্ধনের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইয়াছে। দেখিয়া পরাণ দুঃখ অনুভব করিল না, বরং অনেকটা আনন্দিত হইল। ক্রমে সে কথায় কথায় গুপীর কথা তুলিল, এবং প্রথমটা কাঁদিলেও ক্রমে যে সে ভুলিয়া যাইবে, এবং সেখানে তাহার খুব অযত্নও হইবে না, এমন সব কথাও বলিল। কিন্তু তুলসী সে প্রসঙ্গে তেমন মন দিল না ; বরং কতকটা বিরক্তভাবেই বলিল, "সে আপদ্ বিদেয় হয়েছে, বেঁচেছি। এখন সে বাঁচুক মরুক, আমার তাতে কি ?"

স্ত্রীলোকের মনের এই অদ্ভুত কঠোরতার রহস্য ভাবিতে ভাবিতে পরাণ প্রস্থান করিল। কিন্তু সে যদি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, তুলসীর উৎসাহসহকারে রন্ধিত অন্নব্যঞ্জনগুলা তাহার উদরস্থ হওয়ার পরিবর্ত্তে অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া জলতলে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, তুলসীর এই অস্বাভাবিক ধৈর্য্যটা পরাণের মন্দ লাগিল না ; সে হৃষ্টচিত্তে গিয়া লোচনকে এই সংবাদ প্রদান করিল। শুনিয়া লোচন শ্রীহরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক পরাণকে কণ্ঠিবদলের জন্য ত্বরান্বিত হইতে বলিলেন, এবং সেই সঙ্গে ঘরখানাকে উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া দিবার কথা মনে করিয়া দিতেও ভুলিলেন না।

৭

তুলসী ভিতরে ভিতরে স্নেহের শাসন যতই তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিল; বাহিরে ততই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে দিন গুপী চলিয়া গেলে সে অনেকক্ষণ ঘরের মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। তার পর যখন মনে হইল, পরের ছেলের জন্য এতটা অধৈর্য্য নিতান্ত বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন সে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘরকন্নার যে সকল কাজ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, সেই কাজগুলাকে খুব প্রয়োজনীয় কাজের মত করিয়া তুলিল। ঘরের এখানে সেখানে ইঁদুরের গর্ত্ত হইয়াছিল, খানিকটা মাটী আনিয়া সেগুলাকে বুজাইয়া দিল ; উঠানের ঘাসগুলাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া ফেলিল। তার পর অন্য কাজ না পাইয়া কলসী লইয়া পুকুরঘাটে চলিল।

সন্ধ্যা হইলে তুলসীতলায় প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়া তুলসী একা দাবার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে রজনীর গভীরতার সহিত পল্লী যতই নিস্তব্ধ হইয়া আসিল, ততই সেই নিস্তব্ধতার ভিতর শিশুকণ্ঠের একটা অস্ফুট ক্রন্দধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল ; অন্ধকারটা ক্রমেই দারুণ বিভীষিকার ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। তুলসী ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া এবং প্রদীপ জ্বালিয়া বিছানা পাড়িয়া লইল। অভ্যাস বশতঃ নিজের বিছানার পাশে ছোট কাঁথাখানি পাতিয়া ছোট বালিশ দুইটি দিয়া গুপীর বিছানাও প্রস্তুত করিল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সে তাড়াতাড়ি গুপীর বিছানাটা তুলিয়া ফেলিল; সেই সঙ্গে নিজের বিছানা গুটাইয়া ঘরের এক পাশে ফেলিয়া দিয়া মেঝেয় ধূলার উপর শুইয়া পড়িল।

নিদ্রিত অবস্থায় অভ্যাসমত গুপীর গায়ে হাত দিতে গেল। হাতটা যখন ঠক করিয়া মাটীর উপর পড়িল, তখন তুলসী ধড়পড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং দেশলাই খুঁজিয়া লইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ফেলিল। তার পর কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া মেঝের উপর বসিয়া রহিল। শেষে বিরক্ত ভাবে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ছটফট করিবার পর একটু নিদ্রা আসিলে তুলসী শুনিতে পাইল, যেন রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বহুদূর হইতে একটা আকুলকণ্ঠ প্রাণপণশক্তিতে তাহাকে ডাকিতেছে—"টুসী মা, টুসী মা।"

একটা ইঁদুর কিচমিচ শব্দ করিয়া মাথার কাছ দিয়া ছুটিয়া গেল। তুলসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপটা জ্বালিয়া ফেলিল। প্রকৃতি গভীর সুপ্তিনিমগ্ন। তাহার ভিতর হইতে শুধু একটা করুণ সুর উথিত হইতেছে—"টুসী মা!" তুলসী এবার উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই তুলসী উঠিয়া ঘরের চারিদিকে একবার ব্যগ্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তার পর গায়ের কাপড়ের ধূলা ঝাড়িয়া ঘরের বাহির হইল। প্রভাতের রৌদ্রে পৃথিবী তখন হাস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া তুলসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

খাইতে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তুলসী জোর করিয়া রাঁধিল। কেন রাঁধিবে না? কেন খাইবে না? একটা পরের ছেলে, যাহার নিকট একটুও উপকারের প্রত্যাশা ছিল না, শুধু যে তাহাকে অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলিয়া সকলের সমক্ষে তাহাকে হীন করিয়া তুলিতেছিল, তাহার জন্য সে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিবে! ঘরে চাউল ছিল না, উঠানে পরাণের প্রদত্ত চাউলের পুঁটুলীটা পড়িয়াছিল। তুলসী সেটাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া প্রতিবেশীর ঘর হইতে ধার করিয়া চাউল আনিল। রন্ধন শেষ হইলে তুলসী ভাত লইয়া খাইতে বসিল। কিন্তু হাতের ভাত মুখে উঠিল না, প্রথম গ্রাস মুখের নিকট আনিতেই মনে পড়িল, কাল এই এক মুঠা ভাতের জন্য ছেলেটা কি মার না খাইয়াছে। শেষে তাহাকে—

তুলসীর চোখ দিয়া বন্যার প্রবাহ ছুটিল। তথাপি সে ভাতের গ্রাসটা মুখে গুঁজিয়া দিল। কিন্তু তাহা কিছুতেই গলা দিয়া নামিতে চাহে না, উদগত বাষ্পরাশি তাহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। বহুকষ্টে তুলসী মুখের ভাতগুলা গলাধঃকরণ করিল। বাকী ভাতগুলা লইয়া পুকুরে জলে ঢালিয়া আসিল।

পরদিন পরাণ আসিয়া বলিল, "আজ আড়ভার দিকে গিয়েছিলাম তুলসী।"

তুলসী উদাসস্বরে উত্তর করিল, "বেশ!"

গুপীর সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না দেখিয়া পরাণ আপনা হইতেই বলিল, "গুপী বেশ ভাল আছে।"

তুলসী গম্ভীরভাবে বলিল, "আচ্ছা।"

তাহার এই ধৈর্য্য দেখিয়া পরাণ অবাক্ হইল। একটা পোষাপাখী উড়িয়া গেলেও লোকে তাহার জন্য কত হায় হায় করে; আর একটা ছেলেকে এতদিন মানুষ করিল, অথচ তাহার জন্য একটু ব্যাকুলতা নাই! তুলসীর প্রাণটা কি পাষাণে গড়া? পরাণ একটু ভাবিয়া বলিল, "ছেলেটা এখনও কাঁদে।"

বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া তুলসী বলিল, "তবে আর কি।"

পরাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "যদি বল তো এখনো ছেলেটাকে এনে দিতে পারি।"

তুলসীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা আবির্ভাব হইল। একটু শ্লেষতীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "কেন, কণ্ঠিবদলের কড়ির যোগাড় হ'লো না বুঝি?"

কণ্ঠিবদলের কথায় পরাণের মুখখানা হাস্যপ্রফুল্ল হইল; সে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সে যোগাড় অনেক আগেই করে রেখেছি তুলসী, আর তারি যোগাড়ে আজ আখড়ায় গিয়েছিলাম।"

তুলসী বলিল, "বটে!"

পরাণ বলিল, "শিক বাবাজীর সঙ্গে দেখা হ'লো না, তিনি ন'পড়ার আখড়ায় গিয়েছেন। কাল নাগাদ সন্ধ্যা ফিরবেন। পরশু সকালেই একবার যাব।"

পরিহাসের স্বরে তুলসী বলিল, "তোমার যে আর ঘুম ধরে না?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে পরাণ বলিল, "সে কথা সত্যি তুলসী, যে দিন হ'তে কথাটা উঠেছে, সেই দিন হ'তে রাতে ঘুম বড় একটা হয় না। ধর, আমি চিরকালই একা, কিন্তু এখন যেন বড্ড একা ব'লে মনে হয়। গা ছমছম্ করে, চোখে ঘুম আসে না। না তুলসী, যত শীগগীর হয়, কাজটা সেরে ফেলতে হবে।"

তুলসী বলিল, "কিন্তু আমি যদি অমত করি?"

চমকিত হইয়া পরাণ তুলসীর মুখের উপর কম্পিতদৃষ্টি

নিক্ষেপ করিল ; কাতর কণ্ঠে বলিল, "না তুলসি, তা হ'লে—তা হ'লে আমি পাগল হব, গলায় দড়ি দেব।"

গম্ভীরস্বরে তুলসী বলিল, "তুমি পাগল হ'লে বা গলায় দড়ি দিলে, আমার কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু ভয় নাই, আমি অমত করবো না।"

পরাণের ভীতিকাতর মুখখানায় আহ্লাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল ; আনন্দে মস্তকসঞ্চালন করিয়া বলিল, "তা আমি জানি তুলসী!"

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে জানলে?"

পরাণ হাসিয়া বলিল, "তা নইলে কি তুমি ছেলেটাকে দূর ক'রে দাও?"

তুলসীর মুখখানা লজ্জায় ক্ষোভে মলিন হইয়া আসিল। কিন্তু স্বরে সে অস্বাভাবিক কঠোরতা আনিয়া বলিল, "বেশ করেছি! পরের ছেলেকে কেন আমি খাওয়াতে যাব বল তো?"

পরাণ একটু অপ্রতিভভাবে "ঠিক, ঠিক!" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

৮

পরদিন তুলসী পরাণের পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠায় সারাদিনটা কাটাইল ; সে উৎকণ্ঠা পরাণের জন্য নয়, সে আখড়ায় গিয়াছিল কি না, ইহাই জানিবার জন্য। পরাণ কিন্তু আসিল না। যতই সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ততই পরাণের উপর বিরক্তিতে তাহার মনটা ভরিয়া উঠিতে লাগিল। হতভাগা মানুষ, একবার এই দেড় ক্রোশ পথ গিয়া খবরটা আনিতে পারিল না! অবশ্য, তুলসী খবর আনিতে বলিলে সে হাজার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া যাইত, কিন্তু তাহাকে বলিতে যাইবে কি জন্য? পরের ছেলে হইলেও, এবং তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেও, তাহার খবরটা পাইবার জন্য তুলসী কত উৎসুক হইয়া থাকে! বাহিরে সে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু তাহার মনের ভিতর কি যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে তাহা বুঝিবে? পরাণের বুঝা উচিত ছিল যে, তুলসী মেয়েমানুষ, তাহার প্রাণ মেয়েমানুষের প্রাণ, কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষমানুষ কি ইহা বুঝে?

সন্ধ্যার পর তুলসী বসিয়া যখন প্রতি মুহূর্তে পরাণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিল, তখন লোচন মালা-হাতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়া তুলসী ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "কে বৈরাগী?"

লোচন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এর মধ্যেই এত টান তুলসী, তবু এখনো কণ্ঠিবদল হয় নি!"

বলিয়া লোচন হাসিতে হাসিতে দাবার উপর উঠিলেন। তুলসী বিরক্তভাবে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া কিছু দূরে গিয়া বসিল। লোচন আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আজ দ্বাদশী, পূর্ণিমার দিন স্থির ক'রে দিয়েছি। পরাণে ছোঁড়া বড় কঞ্জুষ, কিন্তু তুলসি, দশ জন বৈষ্ণবের সেবা লওয়া বড় ভাগ্যের কাজ, কিন্তু বলে, তা পারবো না। আরে না পারলে কি চলে? ছোঁড়ার ইচ্ছাটা কি জানিস, নিখরচায় এমন একটা বৈষ্ণবীকে হাত করে।"

লোচন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! তুলসী হাসিল না, কোনও কথাও বলিল না ; নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। লোচন তখন পরাণের অন্যান্য গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়া শেষে প্রস্তাব করিলেন যে, কণ্ঠিবদলের পর তুলসী পরাণের ঘরে চলিয়া গেলে এই ঘরখানার অধিকার তাঁহাকে দিতে হইবে। তিনি ইহার সংস্কার করিয়া ইহাকে সযত্নে রক্ষা করিবেন, এবং এখানে একটি তুলসীকুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহাতে গোবর্দ্ধনের স্মৃতিস্বরূপ ঘরখানাও বজায় থাকিবে, এবং তুলসীকুঞ্জ তাহার ভিটাকে পবিত্র করিয়া তাহার বৈকুণ্ঠের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবে।

তুলসী ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল না। তখন লোচন তাহার সুবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া অচিরাৎ যে তাহার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইবে, এরূপ সম্ভাবনা প্রকাশপূর্ব্বক সানন্দে প্রস্থান করিলেন। তুলসী ক্রোধে পরাণকে মনে মনে গালি দিতে দিতে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন তুলসী স্নানান্তে রন্ধনের উদ্যোগ করিতে করিতে যখন বার বার পথের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন পরাণ আসিয়া ডাকিল, "তুলসি!"

তুলসী তাহার দিকে একবার উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখখানা ভারী করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। পরাণ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই দাবার উপর বসিয়া পড়িল, এবং হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "সব ঠিক হয়ে গেল তুলসী, পরশু পূর্ণিমা, বেশ ভাল দিন। বাবাজী নিজে আসবেন।"

গম্ভীরমুখে তুলসী বলিল, "আজ আবার সেখানে গিয়েছিলে বুঝি?"

পরাণ মাথা নাড়িয়া সহাস্যে বলিল, "যাব না? ছ'মাস কি আমি ঘুমিয়েছি? আজ ভোরে উঠে ছুটেছিলাম।"

তুলসী যে কথাটা সকলের আগে শুনিতে চাহিতেছিল, তাহা শুনিতে না পাইয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইল। অথচ সে কথাটা ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা

হইতেছিল না। সুতরাং সে নীরবে নতমুখে উনানে একখানা কাঠ গুঁজিয়া দিল। পরাণ বলিল, "বাবাজী নিজে আসবেন, খরচটা কিছু বেশী হবে! তা কি করি বল, না হয় পাঁচ টাকা ধার হবে। খেটে খুটে ধার শোধ ক'রে ফেল্‌বো, কি বল?"

সে সাগ্রহে তুলসীর মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তুলসীর মুখে আগ্রহ বা আনন্দের কোনও চিহ্নই দেখিতে পাইল না। না পাইলেও সে ইহাতে নিরুৎসাহ হইল না। সমান আবেগের সহিত বলিল, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে কি জান, এই দিন দু'টোকে হাতে ক'রে ঠেলে দিই।" পরাণ একটু হাসিল। তুলসী গম্ভীরমুখেই বলিল, "হুঁ।" পরাণ উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "যাক্‌, এখনো চান-আহ্নিক সব বাকী, তার পর রান্না। তুমি বুঝি হাঁড়িতে চাল দিয়ে ফেলেছ?"

তুলসী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।" পরাণ প্রস্থানোদ্যত হইল। তুলসী আর থাকিতে পারিল না; সে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

পরাণ দাঁড়াইল। তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "হতভাগা ছেলেটা এখন আর কাঁদে না বোধ হয়?"

সচকিতভাবে পরাণ বলিল, "ছেলেটা? কাঁদে — হাঁ কাঁদে বৈকি। ভাল কথা, কা'ল রাত থেকে তার আবার জ্বর হয়েছে।"

তুলসী বসিয়াছিল, তার বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "জ্বর? খুব বেশী জ্বর নাকি?"

পরাণ বলিল, "খুব বেশী নয়, তবে নেহাৎ কমও নয়।"

শঙ্কাজড়িতকণ্ঠে তুলসী বলিল, "দেড় বছরের ভিতর একদিনও তো জ্বর হয় নি?"

পরাণ সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "দাঁত-নাড়া হয়েছে কি না, ভাবনায় জ্বরটা হয়েছে। ভয় নাই। সেরে যাবে।"

তুলসী চিন্তামলিনমুখে শুধু বলিল, "তাই তো।"

পরাণ বলিল, "ভাবনার কিছু নাই। আমি তো পরশু বাবাজীকে আন্‌তে যাচ্ছি।"

তুলসী নতমুখে বলিল, "পরশু?"

পরাণ মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল, "কা'ল একবার গিয়ে দেখে আস্‌ব?"

তুলসী মুখ তুলিয়া বলিল, "কেন?"

"কেমন থাকে, তুমি খবরটা পেতে।"

তুলসী চুপ করিয়া রহিল। পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া রুক্ষস্বরে তুলসী বলিল, "তোমার খুসী হয়, যেতে পার, আমি বল্‌তে যাব কেন? আমার তো তার ভাবনায় ঘুম হয় না।"

বলিয়া সে সবেগে মুখটা ফিরাইয়া লইল। পরাণ দেখিল, তুলসীর গলাটা এত ভারী হইয়া আসিয়াছে যে, আর একটি কথা কহিতে গেলেই হয় তো সে কাঁদিয়া ফেলিবে। পরাণ মনে মনে একটু হাসিয়া আর কোনও কথা না বলিয়াই চলিয়া গেল।

ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদেই জ্বর হয়েছে নিশ্চয়। জ্বরের তাড়নায় যখন সে ছট্‌ফট্‌ করবে, তখন কে তাকে দেখবে? যখন টুসী মা টুসী মা ব'লে কাঁদবে, তখন কে তাকে শান্ত করবে? তুলসী রাঁধিল, কিন্তু খাইতে পারিল না; হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই পড়িয়া রহিল।

সে দিন রাত্রিটা তুলসীর যে কি করিয়া কাটিল, তাহা সেই জানে। হায়, বিকালে তাহাকে একবার দেখিয়া আসিবার জন্য কেন সে পরাণকে যাইতে বলিল না? সে তাহার উপর রাগ করিয়া ছেলেটার প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা করিল? ধিক্‌ তাহাকে! রাত্রিতে তুলসী একবার ঘুমাইতে পারিল না। একটু তন্দ্রা আসিলেই সে যেন চোখের উপর দেখিতে পাইত, টুসী একটা ফাঁকা ঘরে একা পড়িয়া জ্বরের তাড়নায় ছট্‌ফট্‌ ক'রছে, আর চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে, "টুসী মা, টুসী মা।"

৯

সকালে উঠিয়াই তুলসী পরাণের ঘরে উপস্থিত হইল। কিন্তু ঘরে তালা বন্ধ, পরাণ কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। তুলসী খানিকক্ষণ দরজায় বসিয়া রহিল, কিন্তু পরাণ ফিরিল না। মনে মনে তাহার উপর রাগিয়া তুলসী ফিরিয়া আসিল।

দুপুরবেলা আবার একবার গেল। পরাণ তখনও ফিরে নাই, ঘরে তালা বন্ধ রহিয়াছে। তুলসীর ক্রোধের সীমা রহিল না। উঃ, সংসারের লোকগুলা কি নিষ্ঠুর, কি স্বার্থপর। একটা দুঃসংবাদ দিয়া স্বচ্ছন্দে নিরুদ্দেশ হইয়া রহিল! তুলসীর ইচ্ছা হইল দেখা পাইলে সে এই নিষ্ঠুরতার জন্য পরাণকে বেশ পাঁচ কথা শুনাইয়া দেয়। ছি ছি, অসুস্থ ছেলেটার খবর পাইবার জন্য সে হা-প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছে আর পরাণ হয় তো কণ্ঠিবদলের আমোদে মাতিয়া তাহার যোগাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন স্বার্থপর লোকের সঙ্গে কণ্ঠিবদল! ছি!

তুলসীর ইচ্ছা হইল, সে নিজেই ছুটিয়া যায় কিন্তু আখড়ায় যাইতে তাহার সাহস হইল না। সে

ছুটিয়া লোচনের কাছে গেল। কিন্তু লোচন শরীর অশুদ্ধ বলিয়া যাইতে পারিলেন না; অধিকন্তু তিনি তুলসীকে শ্রীহরির ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে বলিয়া উপদেশ দিলেন, প্রভু যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই। হয় তো ছেলেটার একটা ভাল-মন্দ ঘটাইয়া তিনি তুলসীর দোটানা মনকে একনিষ্ঠ করিয়া দিবেন! তাঁহার অপার মহিমা।

তুলসী কিন্তু প্রভুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তথাপি পরাণ ফিরিল না। তুলসী সন্ধ্যা জ্বালিল না, তুলসীতলায় প্রদীপ দিল না, অন্ধকারে দাবার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, এমন সময় পরাণ ডাকিল, "তুলসি।"

তুলসী রাগে গর্জ্জন করিয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না, তাহার সকল ক্রোধ, সকল উৎকণ্ঠাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া মৃদু ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বান উত্থিত হইল, "টুসী মা।"

তুলসী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া পরাণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং গুপীকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া আবেগবিহ্বলকণ্ঠে ডাকিল, "গুপী!"

গুপী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমাল দল (জ্বর) অয়েছে (হইয়াছে) টুসী মা, আমি আল দাব না।"

সে তুলসীমার বুকে আপনার মুখটা গুঁজিয়া দিল। তুলসী তাহার পায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "না গুপী, আর তোকে কোথাও যেতে দেব না।"

পরাণ বলিল, "তা হ'লে কণ্ঠিবদলের কি হবে?"

তুলসী বলিল, "আমি কি জানি? তুমি কেন একে নিয়ে এলে?"

পরাণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সাধে কি নিয়ে এসেছি? সকালে উঠে শেখপুরে গিয়েছিলাম বিষ্ণু দাসের কাছে দশটা টাকা ধার কত্তে। সেখানে টাকা নিয়ে ভাবলাম, ছেলেটাকে একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখি, আটচালার একপাশে একখানা ছেঁড়া চাটায়ের উপর ওকে ফেলে রেখেছে, ছেলেটা ছটফট কচ্ছে, আর কেঁদে কেঁদে ডাকছে—টুসী মা, টুসী মা! এক এক বেটা বৈরাগী এসে ওকে ধমক দিচ্ছে।"

তুলসী আঁচলে চোখ মুছিল। পরাণ বলিল, "তোমার কি, দেখে আমার চোখেও জল এল তুলসি। শালাই কি ব্যাটারা ছাড়তে চায়? ব্যাটাদের যেন সাতপুরুষের কেনা ছেলে। শেষে বিকেলে বাবাজী এলে কত স্তব-স্তুতি ক'রে নগদ পাঁচ টাকা পেন্নামি দিয়ে তবে এনেছি।"

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে তুলসীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। পরাণ বলিল, "ছেলেটাকে নিয়ে সোনাপুরের হরি ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি দেখে ওষুধ দিলেন। দশ আনা দিয়ে এই ওষুধ এক শিশি এনেছি। ডাক্তার বলেছেন, ভয় নাই, এই ওষুদ খেলেই সেরে যাবে। বাজার থেকে আবার মিছরী, সাবু, একটা ডালিম নিয়ে এসেছি। ভাগ্যে গিয়ে পড়লাম, তা নইলে ছেলেটার কি হ'তো?"

গুপীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সজলকণ্ঠে তুলসী বলিল, "কিন্তু এখন তোমার কণ্ঠিবদলের কি হবে?"

তুলসী বাষ্পপূর্ণ-নেত্রে নিষ্ঠুর স্বার্থপর লোকটার দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় লোচন মালা জপ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন এবং তুলসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পরাণে ছোড়া নাকি ছেলেটাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে তুলসি?"

পরাণ তাঁহার দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, "এনেছি খুড়ো, হতভাগা ছেলেটা সেখানে গিয়ে যে মরতে বসেছিল।"

লোচন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বটে, তা হ'লে কণ্ঠিবদলটা হলো না বল?"

পরাণ বলিল, "আপাততঃ তো নয়!"

লোচন খানিকটা গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তার পর পরাণের নির্ব্বুদ্ধিতার উল্লেখপূর্ব্বক দ্রুত মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিলেন। পরাণ বলিল, "তা হ'লে আমি এখন যাই তুলসি?"

তুলসী ছেলেটাকে তাহার পায়ের কাছে ধপ করিয়া বসাইয়া দিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাবে কোথায়? ছেলেটাকে নিয়ে এলে, এখন তার ভার নেয় কে?"

পরাণ হাসিয়া গুপীকে তুলিয়া লইল; হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, "আমি যখন এনেছি, তখন ভার আমাকেই নিতে হবে। কিন্তু ছেলের মায়ের ভার নিতে পারবো না, তা ব'লে রাখছি।"

তুলসী তাহার দিকে হাস্যোজ্জ্বল বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ওঃ, ছেলের মা তো তোমার উপর ভার দেবার জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছে।"

পরাণের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ হাসিয়া উঠিল।

গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ

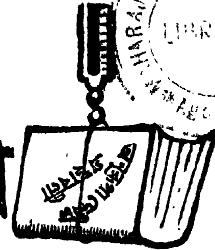
# আকাশের চাঁদ হাতে লউন !

সাহিত্য অমরার ইন্দ্রাণী—ঋষিকল্প মনীষী ভূদেব বাবুর প্রিয়তমা পৌত্রী ও ছাত্রী—প্রাচীন ভারতের গার্গী, মৈত্রেয়ী, উভয়ভারতীসমা প্রতিভারূপিণী—যথার্থ হিন্দু আদর্শে গঠিতা—কল্পনাকুহকবলে সর্ব্বজন-সম্মোহিনী—

**বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবময়ী সুলেখিকা**

সাহিত্য-তপোবনের মানসী প্রতিমা

# অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী




.কোন্ কোন্ রত্ন-সমাবেশে এই সাহিত্যের গৌরব-মুকুট !

---

**প্রথম ভাগে—**

১। মা ৩৲, ২। পোষ্যপুত্র ৩৲, ৩। উল্কা ১৲, ৪। সোনার খনি [১ম] ১৲, ৫। রাঙ্গাশাঁখা ১৷৹, ৬। মুক্তি ৷৹, ৭। অকৃতজ্ঞ ৷৹, ৮। মিলন ৷৹, ৯। দেবদাসী ৷৹, ১০। আংটি ৷৹, ১১। ধূমকেতু ৷৹, ১২। বিস্মৃত-স্মৃতি ৷৹, ১৩। প্রতিশোধ ৷৹।

এই ১৩৲ কম মূল্যে যাহা কাস্মনকালেও বিক্রীত হইবার আশা ছিল না

তাহাই মাত্র ২৲ টাকায় পাইবেন।

**দ্বিতীয় ভাগে—**

১। মন্ত্রশক্তি ২৲, ২। সোনার খনি [২] ১৲, ৩। মৃন্ময়ী ১৲, ৪। রামগড় ২৲, ৫। কনে দেখা ৷৹, ৬। মথুরায় ৷৹, ৭। হার ১৲, ৮। ফুলডালা ৷৹, ৯। কুমারীসঙ্ঘ ১৲, ১০। প্রবন্ধমালা ১৲।

এই ১০৷৹ মূল্যের রত্ন-উপন্যাস ১৷৹

**তৃতীয় ভাগে—**

১। বাগদত্তা ২৷৹, ২। পথহারা ২৲, ৩। বিদ্যারণ্য ১৲, ৪। সাধবী ১৲, ৫। চিত্রদীপ (গুরু দক্ষিণা) ২৲, ৬। পরাজয় ৷৹, ৭। বন্ধু ৷৹, ৮। দান ৷৹, ৯। ত্যাগের দিন ৷৹, ১০। স্বর্গচ্যুত ১৲।

১১৷৹ টাকা মূল্যের উপন্যাসরাজি ১৷৹

**নবপ্রকাশিত ৪র্থ ভাগে—**

১। জ্যোতিহারা ২৷৹, ২। মহানিশা ৩৷৹, ৩। মধুমল্লী ৷৹, ৪। অযাচিত ৷৹, ৫। লঘুক্রিয়া ৷৹, ৬। গৃহ ৷৹, ৭। প্রহরী ৷৹, ৮। জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য ৷৹, ৯। আরুণ-বর্ষীর ব্রহ্মজ্ঞান ৷৹, ১০। দেবদূত ও অরিষ্টনেমী ৷৹, ১১। প্রবন্ধমালা ১৲।

এই একাধারে গ্রথিত গ্রন্থমালা

মূল্য ১১৲ হইলেও ১৷৹ টাকায় দিব

**একত্রে ৪ খণ্ড ৬৲ চামড়ার বাঁধাই ৭।০ টাকা।**

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৬৬, বহুবাজার, কলিকাতা